গল্পসমগ্র

শহীদুল্লা কায়সার

বাংলাবুক.অর্গ

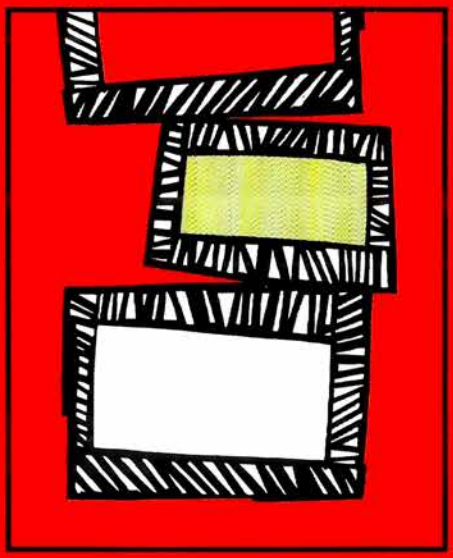

১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার নিজের দুটি উপন্যাস এবং দুটি দিনলিপি প্রকাশ করেছিলেন। *সংশপ্তক* (১৯৬৫) পাকিস্তান লেখক সংঘের আদমজী পুরস্কার লাভ করেছিল, *সারেং বৌ* (১৯৬২) জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপরও নিজের ছোটগল্পের কোনো সংগ্রহ প্রকাশ করার আগ্রহ কেন তিনি দেখান নি, এ-প্রশ্নের সদুত্তর আমরা পাই না। অথচ গুণে ও পরিমাণে ছোটগল্পের একটি সংকলনের যোগ্য লেখা তাঁর হাতে ছিল।

শহীদুল্লা কায়সারের গল্পসমগ্র পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি গভীর তৃপ্তি লাভ করছি।

আনিসুজ্জামান

www.BanglaBook.org

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :: সব্যসাচী হাজরা

জন্ম : ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৭ সালে ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে

পিতা : মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লা

মাতা : সৈয়দা সুফিয়া খাতুন

স্ত্রী : পান্না কায়সার

কন্যা : শমী কায়সার

পুত্র : অমিতাভ কায়সার

১৯৪৬ সালে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে অর্থনীতিতে স্নাতক। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হলেও রাজনৈতিক কারণে অসমাপ্ত।

পেশায় সাংবাদিক। সক্রিয় ছিলেন বামপন্থী রাজনীতিতে। একাধিকবার কারাবরণের সৌভাগ্য অর্জন করেছেন।

উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি 'সারেং বৌ' 'সংশপ্তক' 'রাজবন্দীর রোজনামচা' 'কৃষ্ণচূড়া মেঘ' 'দিগন্তে ফুলের আগুন'।

সাহিত্যের জন্য পেয়েছেন আদমজী সাহিত্য পুরস্কার (১৯৬৩) ও বাংলা একাডেমী পুরস্কার (১৯৬৯)।

১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসরদের দ্বারা ধৃত হন এবং তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যায় নি।

www.BanglaBook.org

গল্পসমগ্র

শহীদুল্লা কায়সার

ভূমিকা ও সম্পাদনা

আনিসুজ্জামান

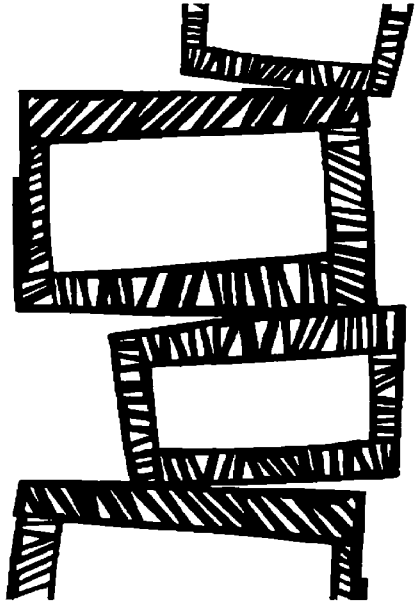

চারুলিপি

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

©
লেখকের উত্তরাধিকারীগণ

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪১৮/ফেব্রুয়ারি ২০১২

চারুলিপি প্রকাশন ৩৮/৪, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০ থেকে হুমায়ূন কবীর কর্তৃক প্রকাশিত এবং পাণিনি প্রিন্টার্স ১৪/১ তনুগঞ্জ লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।
কম্পোজ : বাংলাবাজার কম্পিউটার, ৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
সব্যসাচী হাজরা

দাম : ৩২৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 978 984 598 059 3

GOLPOSOMOGRA (A book of short Stories) by Sahidulla Kaisar
Selected and Edited by Anisuzzaman
Published by Humayun Kabir
Charulipi Prokashon 38/4, Banglabazar, Dhaka 1100
E-mail : charulipi_prokashon@yahoo.com Cell 01715983899
First Edition : February 2012. Price : 325.00 Only. $ 15

U.K. Distributor : **Sangeeta Limited**, 22 Brick Lane, London
U.S.A. Distributor : **Muktadhara, 37-69**, 2nd floor, 74 St. Jackson Heights N.Y. 11372
Canada Distributor: **ATN Mega Store**, 2970 Danforth Ave Toronto
Anyamela, 300 Danforth Ave (1st floor, Suite 202), Toronto

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

সূচি

প্রকাশকের কৈফিয়ৎ ৭
ভূমিকা : আনিসুজ্জামান ৯

অনমিতা ১৩
অনুগল্প ৪৪
আষাঢ়ে গল্প ৫২
একই ছবির দুই পিঠ ৬৯
নেতা ৮৩
অপমৃত্যু ৯১
যক্ষপুরী ১০০
রূপান্তর ১০৬
মৃত্যু-এক ১১৮
মৃত্যু-দুই ১২৮
নিলুফার বেগম ও একখানি চিঠি ১৩০
মুন্না ১৩৫
তিমির বলয় ১৪৫
এমনি করেই গড়ে উঠবে ১৬৪
অনিরুদ্ধা ১৬৬
বহুরূপী ১৮২
মহম্মদ দিনের গল্প ১৯৩
জোবেদ আলির গল্প ২০০
গেরাম আলির গল্প ২০৫
পল্টু ২০৯
পরিতৃপ্ত ২১২

পরিশিষ্ট ১

হাদিসের গল্প ২১৭
আমার জেলজীবনের কথা ২২১

পরিশিষ্ট ২

জীবনপঞ্জি ২২৭
গ্রন্থপঞ্জি ২২৯

প্রকাশকের কৈফিয়ৎ

আমি ভেবে অবাক হই যে, শহীদুল্লা কায়সার-এর মতো এত বড়ো মাপের সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক অতি সুখ্যাতি অর্জন করেছিলেন *সংশপ্তক* ও *সারেং বৌ* রচনার মধ্য দিয়ে; সাংবাদিক যে অতি বড়ো মাপের ছিলেন তাঁর সহকর্মীদের কথায় ও তৎকালীন সংবাদপত্রে তার প্রমাণ মেলে। শহীদুল্লা কায়সার জীবিত থাকাকালীন উপন্যাস, দিনলিপি, ছোটগল্প, তার পাশাপাশি কবিতা, প্রবন্ধ, কলাম, নাটিকা, ভ্রমণকাহিনী রচনা করেছিলেন। সে-সময়ে তাঁর রচিত উপন্যাস *সংশপ্তক* (১৯৬৫), *সারেং বৌ* (১৯৬২) দিনলিপি *রাজবন্দির রোজনামচা* (১৯৬২), *পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ* (১৯৬৬) মুদ্রিত হয়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর অনুজ জহির রায়হান অংশগ্রহণ করেন; শহীদুল্লা কায়সার অবরুদ্ধ ঢাকায় থেকে গিয়ে পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন।

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসরদের দ্বারা শহীদুল্লা কায়সার ধৃত হন। বড়দাকে খুঁজতে গিয়ে তাঁর অনুজ সাহিত্যিক ও চলচ্চিত্র-নির্মাতা জহির রায়হানও নিখোঁজ হন এবং আজ পর্যন্ত তাঁদের কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। শহীদুল্লা কায়সার-এর জীবদ্দশায় মাত্র চারটি বই প্রকাশিত হয় দুটি উপন্যাস, একটি দিনলিপি, একটি ভ্রমণ। তাঁর অন্যসব রচনা একপ্রকার অমুদ্রিত থেকে যায়। *রচনাবলী ১ম খণ্ড* (১৯৮১), *১ম খণ্ডের ২য় অংশ* (১৯৮৪), *রচনাবলী ২য় খণ্ড* (১৯৮৭), *রচনাবলী ৩য় খণ্ড* (১৯৮৮), *রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড* (১৯৮৯) গোলাম সাকলায়েনের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী প্রকাশ করে। দীর্ঘদিন হল এখন বাজারে আর পাওয়া যাচ্ছে না।

চারুলিপি প্রকাশন থেকে ২০০৯ সালে শহীদুল্লা কায়সারের সহধর্মিণী অধ্যাপিকা পান্না কায়সার সম্পাদিত ও অধ্যাপক আনিসুজ্জামান-এর ভূমিকা-

সংবলিত *উপন্যাসসমগ্র ১ম খণ্ড* ও *উপন্যাসসমগ্র ২য় খণ্ড* প্রকাশ করে শহীদুল্লা কায়সারের রচনার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে।

শহীদুল্লা কায়সার ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ সালে রচিত গল্পসমূহ নিয়ে *অনিরুদ্ধা* নামে একটি গল্পসংগ্রহ গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার মনস্থ করেছিলেন, যা পরবর্তী কালে অপ্রকাশিত থেকে যায়। শহীদুল্লা কায়সার-এর অন্তর্ধানের প্রায় ৪০ বছর পরে আমার মতো নতুন প্রজন্মের একজন তরুণ প্রকাশক যে তাঁর গল্পসংগ্রহ প্রকাশ করছে তা একাধারে দুঃখবহ ও আনন্দজনক। তাঁর রচিত গল্পসংগ্রহ অনেক আগে প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। তাঁর পরিবার কেন সে-উদ্যোগটি নেয়নি তা আমার জানা নেই।

আমি দীর্ঘদিন খুঁজে খুঁজে শহীদুল্লা কায়সার রচিত গল্পগুলি একত্রিত করে 'গল্পসমগ্র' নামে প্রকাশের চেষ্টা করেছি মাত্র। আমার জানামতে কোনো গল্প বাদ যায়নি—তার পরও যদি কোনো গল্প আমার অজান্তে গ্রন্থভুক্ত না হয়ে থেকে থাকে তা জানতে পারলে পরবর্তী মুদ্রণে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

শহীদুল্লা কায়সার-এর 'গল্পসমগ্র' প্রকাশ করতে গিয়ে যাঁদের ভালোবাসা-স্নেহ আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে তাঁরা হলেন—প্রফেসর এমেরিটাস্ অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, লেখক-শিক্ষাবিদ অধ্যাপক হায়াৎ মামুদ, অধ্যাপিকা পান্না কায়সার ও তাঁর পরিবার এবং সাহিত্যিক আখতার হুসেন, লেখক ও মানবাধিকার-কর্মী, শাহরিয়ার কবির, আমিনুর রহমান সুলতান (লেখক ও উপপরিচালক বাংলা একাডেমী), তরুণকুমার মহলানবীশ (বানান সংশোধক), সুবলকুমার বণিক (ভাষা-গবেষক); সব্যসাচী হাজরা (প্রচ্ছদশিল্পী)। আমি তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এ-কাজ সম্পূর্ণ করতে পারতাম না। তাঁদের সকলের ভালোবাসা আমার পথের পাথেয় হয়ে থাকবে। গোলাম সাকলায়েন-সম্পাদিত *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী* চার খণ্ড থেকে আমরা সাহায্য পেয়েছি, সে-কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

হুমায়ূন কবীর

২৭ জানুয়ারি ২০১২

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

ভূমিকা

১৯৬২ থেকে ১৯৬৬ সালের মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার নিজের দুটি উপন্যাস এবং দুটি দিনলিপি প্রকাশ করেছিলেন। *সংশপ্তক* (১৯৬৫) পাকিস্তান লেখক সংঘের আদমজী পুরস্কার লাভ করেছিল, *সারেং বৌ*ও (১৯৬২) জনপ্রিয় হয়েছিল। তারপরও নিজের ছোটগল্পের কোনো সংগ্রহ প্রকাশ করার আগ্রহ কেন দেখান নি, এ-প্রশ্নের সদুত্তর আমরা পাই না। অথচ গুণে ও পরিমাণে ছোটগল্পের একটি সংকলনের যোগ্য লেখা তাঁর হাতে ছিল।

তবে তাঁর ছোটগল্প পড়েও মনে হয় তাঁর প্রতিভা ও প্রবৃত্তি ছিল মূলত ঔপন্যাসিকের। তাঁর রাজনীতি যেমন তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিল জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে, তাঁর সাহিত্যিক প্রবণতাও ছিল তেমনি ঘটনার বা চরিত্রের কার্যকারণ ও পটভূমি সমগ্রভাবে দেখার ও বিচার করার। বর্তমান সংকলনের প্রথম গল্পটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এর মধ্যে উপন্যাসসুলভ বিস্তৃতি আছে, গল্পের মধ্যে গল্প আছে; অনেকগুলি সুসম্পূর্ণ চরিত্র আছে। পরিব্যাপ্ত স্থানকাল আছে। ছোটগল্পের সংহতি যেন ছাড়িয়ে যেতে চায়। একে কি নভেলা বলব? আদি নভেলায় রচনার আকার সংক্ষিপ্ত থেকে বিস্তৃত হতে পারতো (কয়েক পৃষ্ঠা থেকে দু-তিন শ পৃষ্ঠা পর্যন্ত), কিন্তু ঘটনা ও পরিবেশের ঐক্য থাকতো, পরিণামে ছোটগল্পের চমক থাকত। পরবর্তীকালে নভেলার সেই সংহতি আর রক্ষিত হয়নি—ছোটগল্পের সংক্ষিপ্ততা নেই, আবার উপন্যাসের বিস্তার নেই, এসব রচনাই তো এখন নভেলা বলে আখ্যাত হয়। আমরা তাকে কখনো বড় গল্প বলি, কখনো বলি উপন্যাসিকা বা ছোট উপন্যাস। দৈর্ঘ্যের মাপে ৩০-৩২ পৃষ্ঠার 'অনমিতা' দীর্ঘ নয় হয়তো। তবে ছোটগল্পের চেয়ে বিস্তার যেন তার সবদিক দিয়েই বেশি। এর একেবারে বিপরীত প্রান্তে আছে 'অনুগল্প'—ছোট ছোট গল্প ধরনের কিংবা এক মিনিটের গল্পজাতীয়—আট পৃষ্ঠায় আটটি। এর সবগুলো হয়তো উদ্ভাবিত গল্পও নয়—কিংবদন্তি, ইতিহাস, উপকথাও আছে এতে—কিন্তু রচনাশৈলীর দিক দিয়ে যে অন্য একটি ধরনের পরীক্ষাও করেছিলেন শহীদুল্লা কায়সার, 'অনুকথা' তারই পরিচয়বাহী।

গল্পের বিষয়বস্তু মূলত পঞ্চাশের দশকের পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবন। তবে তা কেবল নির্দিষ্ট স্থানকালের বিষয় নয়, এতে সর্বস্থানিকতা ও চিরন্তনতার পরিচয় আছে। গল্প রচিত হয়েছে নিম্নবিত্ত মানুষকে নিয়ে, রাজনৈতিক কর্মী নিয়ে, বাধ্য-হওয়া দেহপসারিনী নিয়ে, শহুরে মধ্যবিত্ত প্রেমিকার স্বার্থপরতা নিয়ে। বাস্তবতার রূঢ়তা প্রায়ই আঘাত করে পাঠককে। তার মধ্যে রূপকের আভাসও আছে।

গল্প নয়, এমন কিছু রচনা পরিশিষ্টে সংকলিত হলো—এগুলো যেন হারিয়ে না যায়, সেই উদ্দেশ্যে।

শহীদুল্লা কায়সারের *গল্পসমগ্র* পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমি গভীর তৃপ্তি লাভ করছি।

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আনিসুজ্জামান
২৮ জানুয়ারি ২০১২

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গল্পসমগ্র

অনমিতা

নুরজান, তুই আমারে বাঁছা। তর লাইগা কী না করছি। তুই আমারে মাইরা ফ্যাল্‌বি? নুরজান তর দিলে কি রহম নাই?

মেয়েটির পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে একটি হাত দরজার লোহার শিকে রেখে আর-একটি হাত প্রার্থনার ঢঙে বুকের উপর চেপে ধরে লোকটি বলছে। পরনে ডোরাকাটা ভাগলপুরী লুঙ্গি। গায়ে জাপানি সিলকের গোলাপি হাফশার্ট, পায়ে অক্সফোর্ড জুতো, হাতে রোলগোল্ডের হাতঘড়ি। অনামিকায় একটি সোনার আংটি।

আমারে বাঁছবার দিবি না? আমারে মাইরা কী পাইবি তুই? নুরজান, তর দিলে কি রহম নাই?

প্রার্থনার ঢঙে হাঁটু গেড়ে বসা লোকটির কান্নাভাঙা কণ্ঠস্বর। অনেক আকুতি, অনেক মিনতি। বুকের কাছে ভাঁজ-করা হাত অক্সফোর্ড জুতোর আগায় ভর দিয়ে নুয়ে-পড়া দেহ আর ক্রন্দনভাঙা কণ্ঠস্বরের করুণ আবেদন। এখানে এ-দৃশ্য হয়তো নতুন নয়।

কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে বলা তার মুখ ভাবলেশহীন। কথাগুলো যেন আদৌ তার কানে যাচ্ছে না। হাঁটুগাড়া লোকটির উপর চোখ রেখেও মনে হয় সে চেয়ে রয়েছে অন্য দিকে।

কথা কস না ক্যান নুরজান? তুই কি বোবা হইছস? নমরুদের থাইক্যা শক্ত হইছে তর গুর্দা?

ক্ষুব্ধ অভিমানে লোকটি বলে আর উত্তরের প্রতীক্ষায় ব্যাকুল দুই চক্ষু তুলে ধরে দরজার চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়ানো মেয়েটির দিকে।

মেয়েটিকে প্রথম যখন দেখি সেদিন এক দূর বিস্মৃত স্মৃতির আচমকা তীক্ষ্ণ খোঁচা খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিলাম। লোহার রেলিঙে ঠেস দিয়ে একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে ছিল মেয়েটি। একটি প্রাণহীন, ক্ষীণকায়া বিবর্ণ রবারের মূর্তির

BanglaBook.org

মতো। মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে ভুল হয় না অনেকদিন ভাত জোটেনি। নোংরা, ছেঁড়া শাড়ি আর ময়লা হাত-পায়ের উপর নজরটা আপনিই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। অনেকদিন যে তার কোনো আশ্রয় জোটেনি তাও অতি পরিষ্কার। ক্ষুদ্র জ্যোতিহীন চোখজোড়া এক সুগভীর গহ্বরে লুকানো—হয়তো এককালে তা-ই ছিল হরিণচক্ষু। সেই কোটরে কালি জমে জমে ঝুল পড়েছে। শীর্ণ বাহু, সাদা ঠোঁট, কালো কালো শিরা-ওঠা রক্তহীন বিবর্ণ হাত ক্ষুধা আর প্রেতজগতের এক বীভৎস মূর্তি। হাড়-বের-করা আমশির মতো শুকনো মুখে কদর্য বিকৃতির ছাপ। বয়সটা মনে হয়েছিল পনেরো অথবা তিরিশ। চমকে উঠেছিলাম। না-চমকে উপায় ছিল না। এমনি প্রেতমূর্তি উনপঞ্চাশের পরে আর দেখিনি। উনপাঞ্চাশের কলকাতায় নিরাবরণ মানবীদের এমনি কুৎসিত আর ভয়াল মূর্তি দেখেছি ডাস্টবিনে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে। দুর্বল হাত আর ক্ষুব্ধ চোখ বাড়িয়ে রয়েছে পথিকের দিকে। যদি কখনও সামনের বাড়ির বাবুর্চি এক বালতি ময়লা ঢেলে দিয়ে গেছে তখখুনি সে-হাত সে-চোখ ফিরেছে ডাস্টবিনের দিকে। যা পেয়েছে তা দিয়েই ক্ষুধা নিবারণ করেছে। কোনোদিন তাও জোটেনি। তখন সেই হাত আর চোখ আকাশের দিকে বাড়িয়ে শুয়ে পড়েছে ডাস্টবিনের পাশেই। পরদিন এমনি সব মানবীদের পচাগলা দেহ ডিঙিয়ে ট্রাম ধরেছি কলেজের পথে।

একটি পয়সার আশায়, একটু খানি ফেনের লোভে লাইন ধরে ওরা দিনের পর দিন দাঁড়িয়ে থাকত। শতচ্ছিন্ন কাঁথার টুকরো আথবা ছেঁড়া চটে কোনোরকমে লজ্জাস্থানটি আবরিত করে, কখনও মৃতপ্রায় সন্তানকোলে হাড্ডিসার ঘিনঘিনে নোংরা দেহে শীর্ণ হাত মেলে ওরা দাঁড়িয়ে থাকত কিউ দিয়ে। তারপর ক্লান্ত হয়ে হয়ে সেখানেই বসে পড়েছে, অনেকে শুয়ে পড়েছে চিরদিনের মতো। এমনি সব মানবীর প্রাণহীন দেহ মাড়িয়ে পথ হাঁটতে হত।

ঠিক সেই চেহারা, সেই ক্ষুধিত ক্ষুব্ধ দৃষ্টি, কুৎসিত আর নোংরা দেহকঙ্কাল এতদিন পরে আবার দেখতে হবে তার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। তাই চমকে উঠেছিলাম মেয়েটিকে দেখে।

নুরজানরে, কথা কইবি না তুই? তর দিলে কি রহম অইব না?

লোকটির মেয়েলি কান্নায় আর ন্যাকামিতে আমারই বিরক্তি ধরে গিয়েছিল। গরজ যতই প্রবল হোক-না কেন, আর অপরাধ যতই 'মহা' হোক-না কেন একটি পুরুষমানুষকে কোনো মেয়ের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়তে দেখলে আমাদের চোখে ঠেকে। এরকম দৃশ্য দেখতে বা শুনতে আমরা অভ্যস্ত নই। আমাদের দেশে মেয়েরাই পতিপূজা করে। হাজারো নির্যাতন সত্ত্বেও স্বামীর পদসেবা করে ধন্য হয়। অপরাধ অথবা বিনা অপরাধে দণ্ডবিধান যদি কেউ কখনও করে তবে তা পুরুষেরাই করে মেয়েদের উপর। অথচ এই লোকটি আমাদের সেই সনাতনী মর্যাদাবোধকে ধুলায় গুঁড়িয়ে দিয়ে মিইয়ে মিইয়ে কেঁদে চলেছে একটি মেয়ের সামনে। নির্লজ্জ বেহায়ার মতো অনুকম্পা ভিক্ষে করছে। তাও এতগুলো লোকের

BanglaBook.org

সামনে, প্রায় বাজারের মতোই একটি প্রকাশ্য স্থানে। আর মেয়েটি সমস্ত পুরুষজাতির উপর চরমতম অপমান আর বিদ্রূপ নিক্ষেপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে নির্বিকার চিত্তে।

রাগ হল লোকটির উপর। তার বেহায়াপনায় গ্লানিকর অশ্বস্তিতে নিজেরই চোখ কান লাল হয়ে উঠল।

মেয়েটিকে ঘিরে কৌতূহল শুধু আমার নয়, কোর্টের আশেপাশে যারা ঘুরে বেড়ায়, সেসব উকিল, মক্কেল আর টাউটবৃন্দ সবাই এক পলক থমকে দাঁড়িয়ে মেয়েটিকে দেখে যায়। পাহারাদার সিপাহিরা দারোগাসাহেবকে দুটো কথা জিজ্ঞেস করে কৌতূহল মিটিয়ে যায়। আর যারা একটু রসিক তারা বাঁ চোখটাকে পলকে নাচিয়ে ঠোঁটের সামান্য একটু তির্যক হাসির ইঙ্গিতে কী যেন বলে যায়।

আমার ঔৎসুক্যটা ছিল আর পাঁজজনের মতোই নেহাত জানার কৌতূহল। কিন্তু এই অর্থহীন কৌতূহলটা চরিতার্থ করতে গিয়ে আমাকে যে নির্মম অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে হবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। পালিশ-করা চাকচিক্য আর ঔজ্জ্বল্যের অন্তরালে যে-কুৎসিত অন্ধকার লুকিয়ে রয়েছে তারই মাঝে আমি ডুব দিলাম। যা আপাতদৃষ্ট ও সহজ তার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে নিষ্করুণ কাঠিন্য। সেখানে আঘাত করতে গিয়ে যে-প্রত্যাঘাত পেলাম তা-ই তো আমাকে বাধ্য করেছে এ-কাহিনি লিপিবদ্ধ করতে। কিন্তু জানতে গিয়ে এমনভাবে জানতে হবে, তার কণামাত্রও তো সেদিন আঁচ করতে পারিনি। আঁচ করতে পারিনি কণ্ঠার হাড়-বের-করা শ্রীহীন রুগ্‌ণা একটি মেয়ে এমন করে আমার সযত্নলালিত কতগুলো ধ্যানধারণা পালটে দেবে। অপমানের গ্লানিতে দগ্ধ করবে স্বল্প কৌলীন্যবোধকে। আমার সমস্ত মানবীয় অনুভূতিকে ধুলায় মিশিয়ে দিয়ে পৈশাচিক অট্টহাস্যে নিজেরই বিজয় ঘোষণা করবে।

এটা শুধু একটা দিক, গৌণ দিক। আমার বিবেকের উপর বিশেষ কোনো অবস্থায় বিশেষ কোনো অনুভূতির ছাপ তুলে ধরবার নেহাত ছেলেমানুষি প্রয়োজনে এ-কাহিনির উদ্ভব হয়নি। মুখ্য কারণটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। পরিচিত পৃথিবীর অতিপরিচিত মানুষদের সাথেও যে-অবিশ্বাস্য দূরত্ব টেনে আমরা বেঁচে থাকি সেটা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের চেতনাবহির্ভূত। এ-দূরত্ব নির্মম। এ-ব্যবধানটুকুর ফাঁকেই গড়ে ওঠে অন্য সত্য, অন্য দুনিয়া, প্রেম-প্রীতি, হিংসা-দ্বেষ নিয়ে যে মানুষ সেই যে ঘৃণ্য লিপ্সার দাস, সেই সত্যটাই ঢাকা পড়ে থাকে এই সামান্য দূরত্বের জন্য। রুচি, ভদ্রতার আড়ালে যে সংগোপনে বিচরণ করে পশুপ্রবৃত্তি, সেটা আমাদের চোখে অদৃশ্য থেকে যায় ঐ ক্ষুদ্র দূরত্বটুকুর জন্য।

সেই দূরত্বটা যখন ধরা পড়ে তখনই মানুষকে তা দৃশ্যমান, হয়তো-বা অর্থহীন ঘটনা—সেগুলোকে একটার সাথে আর-একটার জোড়া লাগিয়ে সংগতি খুঁজতে হয়। এটা কাহিনি নয়। কতগুলো ঘটনার বিবৃতি। লোহা আর ইটের বর্ম ভেদ করে সূর্যালোকের একটি কণা প্রবেশ করতে না পারলেও মানুষ ঢোকার জন্য

BanglaBook.org

পাঁচ ফুট উঁচু আর তিন ফুট চওড়া একটি দরজা আছে। সেই দরজার সামনে অবিরাম ভিড় লেগে আছে। ভিড়ের বর্ম ভেদ করে ভেতরে প্রবেশ করলে দেখা যাবে একটি টানা বারান্দা হাত কুড়ি আন্দাজ গিয়ে শেষ হয়েছে আর-একটি দরজায়। বারান্দার এক পাশে ছাদবরাবর দেয়াল, অপর পাশে খাঁচার মতো তিনটি ঘর। প্রত্যেকটি ঘরে লোহার দরজা দেয়ালের সাথে পুরু ইস্পাতের ডান্ডায় খিলান দেওয়া। কী ঘর, কী বারান্দা কোথাও জানালা নেই। রয়েছে শুধু কয়েকটি ছিদ্র ছাদের কাছাকাছি। সেখান থেকে যে দুএক ফোঁটা আলো আসে তাতে অন্ধকারকে আরও বিদঘুটে মনে হয়।

জনাকীর্ণ থাকে জায়গাটি। কেউ আসছে মক্কেলকে এক-আধটি সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে আশ্বস্ত রাখতে, কেউ আসছে আসামিকে একবার চেহারাটা দেখিয়ে দিয়ে ফিসের অঙ্কটা ঠিক রাখতে, কেউ আসছে প্রিয়জনের সামান্য একটু দর্শনলাভের প্রত্যাশায়, কেউ আসছে পরীক্ষা করতে বাঁ হাতের কাজে দুটো পয়সা আমদানি করা যায় কি না। উকিল আসছে মুহুরির খোঁজে। টাউট ছুটছে মোক্তারের পিছে। কেউ চায় মুক্তি কেউ চায় শাস্তি। বিচার চায় না কেউ, সবাই চায় নিজের ভাইটি বাঁচুক, অমুকের ছেলে জেল খাটুক, ফাঁসি হোক। হাকিমের এজলাসে সবাই চায় বিচার যাক তার পক্ষে আর এজলাসের বাইরে উকিল কাটে মক্কেলের পকেট। যে যত বেশি বানিয়ে মিথ্যে কথা বলতে পারবে এবং সে-মিথ্যেকে সত্য বলে প্রমাণিত করতে পারবে তার তত বেশি দাম। তার ফিস সবার উপরে। ডান হাতে উকিলের ফিস দিয়ে বাঁ হাতে বলে দেন দরবার, তদবিরের কাজ। বিচার ব্যর্থ হলে চলে দরবার। দরবারে ফল না পেলে চলে তদবির। সমাপ্তি নেই। উকিলের পর মোক্তার, মোক্তারের পর মুহুরি, তারপর তাদের শিষ্য, তস্য শিষ্য চেলা, তাদের সাথে রয়েছে আবার চামুণ্ডা। প্রত্যেকের বাঁধা ফিস। সে-ফিস না দিয়ে মামলা চালানো যায় না, বিচার পাওয়া যায় না। মক্কেলের পেছনে উকিল, উকিলের পেছনে মক্কেল সারিসারি সারাদিন মিছিল চলেছে তাদের। এর মধ্যে যদি কোনো বহিরাগত এসে পড়ে যিনি উকিলও নন মক্কেলও নন, তবে ভিড় বাড়ে। আমিও সেই ভিড় বাড়ানোদের একজন। বড়জোর কোনো বুদ্ধিফিকির সম্ভাব্য মক্কেল।

এই জনাকীর্ণ জায়গাটিতে ভিড়ের চাপটা সেদিন একটু অস্বাভাবিক রকম বেশি বলে মনে হয়েছিল। লোহার শিকের দরজাওয়ালা একটি ঘরের সামনে নানা পোশাকের নানা প্রকৃতির লোক জটলা করে দাঁড়িয়েছিল। মক্কেল অথবা তদবিরকারকদের ভিড়ে চাপা ফিসফিসানি আর চোখের ইশারা-ইঙ্গিতের কদর্য বীভৎসতা দর্শকের পিঠে চাবুক মারে। তেমন কিছু দেখলাম না। শুধু একটি ভিড় একটি কৌতূহল। ভিড় ঠেলে আমার নির্দিষ্ট চেয়ারখানার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। দারোগাসাহেব পথ করে দিচ্ছেন। নজরে পড়ল ঘরের মধ্যে দর্শকদের কৌতূহলের বস্তুটি নারীবেশমণ্ডিত একটি নিশ্চল পদার্থ। বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে

BanglaBook.org

ছাগশিশু কেমন করে কাঁপে তা স্বচক্ষে দেখি নি। কোরবানির সময় বিরাটকায় পশুগুলোকে হাত-পা চেপে ধরে জবাই করতে দেখেছি। যদিও পশুর অনুভূতির খবর নিইনি। কিন্তু কলকাতার চিড়িয়াখানায় পোরা বাঘ, সিংহ অথবা শিম্পাঞ্জি বা বানর দেখতে গিয়ে কৌতূহলী জনতার আচরণ লক্ষ করেছি। পরম বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে ভিড়ের মানুষগুলো এই আজব জানোয়ারগুলোকে দেখত। কেউ ভেংচি কাটত অথবা কাঠি দিয়ে খোঁচা দিত। সভ্য মানুষের এবংবিধ অসভ্য আচরণে পশুগুলো নিদারুণ ঘৃণায় গর্জন করে প্রতিবাদ করত, বানর কাটত উলটো ভেংচি।

সেদিনের ভিড়টি চিড়িয়াখানার সেই কৌতূহলী ভিড়ের মতোই নির্দয়। মেয়েটি বসে বসে ঘামছে। শরমে জড়সড় হয়ে নিজের মধ্যেই যতটুকু সম্ভব নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে। কখনও প্রাণভয়ে সন্ত্রস্ত হরিণীর মতো চকিতে চোখদুটো তুলে নিয়েই আবার মাটির উপর নিবদ্ধ রাখছে। কখনও বধ্যভূমির ছাগশিশুর মতোই কাঁপছে। এতগুলো অপরিচিত দৃষ্টির সম্মুখে লজ্জা-সংকোচে মেয়েটি যেন মাটি ফুঁড়ে তলিয়ে যেতে পারলেই বেঁচে যায়। মাথাটিকে প্রায় বুকের কাছে নুইয়ে এনে সস্তা শাড়ির নাতিদীর্ঘ অঞ্চলে ও ঢেকে রেখেছে মুখ আর শরীরের উপরিভাগটা। পা-টাকে 'দ'-য়ের আকারে গুটিয়ে এনে দেয়ালের কোণেও সেপটে রয়েছে পটে আঁকা অস্পষ্ট একটি অবয়বহীন মূর্তির মতো।

ঘরটির একটিমাত্র দরজা। দর্শকদের ভিড়ে তাতে এতটুকু ছিদ্রপথ অবশিষ্ট নেই। দারোগাসাহেব আশঙ্কা প্রকাশ করলেন মেয়েটি শ্বাস বন্ধ হয়ে মারা না যায়। বিকারগ্রস্ত মানুষের এ কী নিষ্ঠুর কৌতুক। লোলুপ কাতর চোখে এ কী কলুষ চাহনি! স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি একবার মেয়েটির দিকে, একবার নির্লজ্জ মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম।

হঠাৎ একটি চাপা গুঞ্জন। অর্থপূর্ণ হাসির হালকা একটি ঢেউ। ইঙ্গিতমুখর চোখের কুৎসিত কানাকানি। বাড়িওয়ালি—ফিসফিসে শব্দটি কোথা থেকে ভেসে আসে। আগুনে তাতানো তাওয়ার উপর রাখা মাখনের ঢেলার মতো নিমেষের মধ্যে ভিড়টি গলে গেল।

হই বাড়েউলি তু আহিসুন—পাহারারত উত্তরদেশীয় সিপাহি দুপাটি চকচকে সাদা দাঁত পুরোপুরি অনাবৃত করে উঁচু গলায় সাদর সম্ভাষণ জানায় নবাগতাকে। বুঝলাম এঁর আবির্ভাব এখানে নৈমিত্তিক না হলেও ইনি সুপরিচিতা। উৎকট লালচে রঙের নাইলনভূষিতা কয়লাকালো মেদবহুল বাড়িওয়ালি কোনোদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা দরজার সামনে এসে থামে। যে দু-একটি ক্ষীণকায় রসিক তখনও সরে পড়বার ফুরসত পাচ্ছিল না অথবা রসের সেই নেশাটা সামলে উঠতে পারছিল না, তারা এই মহিষমর্দিনীর আবির্ভাবে ছুটে পালাল।

হারামজাদি মাগি! তরে রাত্রে বাইরে যাইতে মানা করছিলাম না?

কর্কশ পুরুষালি গলায় বাড়িওয়ালি ঝাঁজিয়ে ওঠে।

BanglaBook.org

ঘরের ভেতর থেকে মেয়েটি চেয়ে থাকে নিরুত্তরে। খানকি মাগি। অত চুলকাইলে আমারে কইলেই পারতিস। অখনে যাও জেইলে।

কথার সাথে সাথে মিশিমাখা দাঁতগুলো ঠেলে বের করে ঠোঁট দুটো উলটিয়ে দেয় বাড়িওয়ালি।

ঘরের ভেতর মেয়েটির শীর্ণ গণ্ড বেয়ে এক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়ে।

ইস, ছিনালির আবার কান্দন লাগে! বইস্যা থাক। আমি কোর্টবাবুর লগে দেখা কইর‍্যা আসি। দেহি, কিছু করন যায় নাকি!

এমন ঘটনা এখানে অহরহ ঘটে থাকে। তাই এই চৌহদ্দি পার হলেই সেগুলো মন থেকে মুছে যায়। মিশিমাখা দাঁতের বিসদৃশ বিকাশ অথবা হাড়-বের-করা রক্তহীন চোয়ালের উপর দিয়ে গড়িয়ে পড়া এক ফোঁটা অশ্রুর কথা কখনও মনে থাকে না। মনে থাকবার কথা নয় বলে এই মেয়েটির কথাও ভুলে যেতাম। ভুলে গিয়েছিলামও।

মাস দুয়েক পর আবার আমাকে যেদিন ও-তল্লাটে যেতে হয়েছিল সেটি ছিল শুক্রবার। সকাল বেলার হাফ কাছারি। তাড়াতাড়ি বিদেয় দেবার জন্য দারোগাসাহেবকে অনুরোধ করে তার পাশেই একটি টুলে বসে সিগারেট ধরালাম।

শুনছেন স্যার! একটু শুনুন। উলটোদিকের দরজা-আঁটা ঘর থেকে একটি তরুণী মেয়ে আমাকে উদ্দেশ করে কথাগুলো বলল।

অপরিচিতার আহ্বানে অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে বলছেন?

জি হ্যাঁ।

কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনি বলে মনে হচ্ছে না।

কেন চিনবেন না? আমার নাম নুরজাহান।

অদ্ভুত কথা! নুরজাহান নামে আমার কোনো পরিচিত মেয়ে আছে বলে কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না।

আরে ঐ যে, ঐ সেদিন আমি যে ফিফটি ফোরে ধরা পড়ে এলাম। আপনি তো চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন।

দেখছিলাম?

চটুলা তরুণীর ধৃষ্টতায় কটুবাক্য মুখে এসেও থেমে গেল। হঠাৎ মনে পড়ল সেই চিড়িয়াখানার ভিড়ের কথা। বলির পাঁঠার মতো কম্পমান একটি নেহাত মাংসহীন দেহাবশিষ্টের কথা।

কিন্তু তুমি হঠাৎ এত মোটা হয়ে গেলে কী করে?

মোটাটা হয়তো একটু বাড়িয়ে বললাম। কিন্তু অদ্ভুত সুন্দর আর সুডৌল হয়েছে নুরজাহান।

পেট পুরে দুটো ভাত খেতে পারলেই আমরা মোটা হই, স্যার।

আমার শীর্ণ দেহ আর অবাক-খাওয়া দৃষ্টিকে বিদ্রূপ হেনেই যেন সে বললে।

BanglaBook.org

নুরজাহানকে দেখে অবাক না হয়ে উপায় নেই। মাত্র দুমাসের ব্যবধানে কারো শরীরে-স্বাস্থ্যে এমন পরিবর্তন সম্ভব হতে পারে এটা আমার ধারণাতীত ছিল। মুখের আর গলার হাড়গুলো ডুবে গিয়ে টইটম্বুর পুকুরজলের মতো মাংসভরাট দেহের খাঁজে-খাঁজে যৌবনশ্রী উপচে পড়ছে। করমচারাঙা ঠোঁটে স্বাস্থ্যের নির্যাস। টোলপড়া গালের রক্তিম লাজ বিলোল চাহনির সাথে ক্ষণে-ক্ষণে ঝরে পড়ছে ফুলকেশরের মতো। চোখের কোলে কালির ঝুল অদৃশ্য। ওর হরিণ আঁখির চঞ্চল সঞ্চারণ আর দূর্বামসৃণ চামড়ার চিকন আভার সাথে চারপাশে নোংরা, ধুলামলিন পরিবেশের নিদারুণ অসংগতি, একটি বেসুরো গানের মতোই মনকে পীড়িত করে।

মাত্র দুমাসের নিরাপদ আশ্রয় আর ভরপেট খাদ্য যেমন নুরজাহানকে ফিরিয়ে দিয়েছে তার অপূর্ব দেহশ্রী তেমনি ফিরে এসেছে একটি যুবতী রূপসীর সহজ স্বচ্ছন্দ আচরণ।

এ যেন জন্ম থেকে জন্মে রূপান্তর। প্রথম দিনের অস্পষ্ট দেখা সেই নিরাবয়ব মাংসপিণ্ড। তারপর দুর্ভিক্ষজগতের প্রেতিনী। আর আজকের তন্বী রূপসী! নিমেষের মধ্যে বিপরীত চিত্রগুলো ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে। যেমন অবাক হলাম তেমনি খুশি হলাম ওর সুন্দর স্বাস্থ্য দেখে।

আমার একটা উপকার করবেন?

জিজ্ঞাসু চোখ তুলে ওর দিকে চাইলাম। বিচিত্র পোশাকে সজ্জিত দূরে দাঁড়ানো কতগুলো লোকের দিকে আঙুল তুলে সে বলল, আমি ওদের হাত থেকে বাঁচতে চাই।

ওরা কারা?

দেখছেন না?

ভালো করে একবার লোকগুলোর দিকে তাকালাম। সাত-পনেরো দূরে ফাঁকা জায়গাটিতে গোল হয়ে তারা বসে রয়েছে, মাঝে মাঝে মুখ নামিয়ে নিচু গলায় কী যেন সলাপরামর্শ করছে আর আড়চোখে নুরজাহানকে দেখছে। পোশাকের মতোই বিচিত্র তাদের আকৃতি, গায়ের রং, এমনকি বয়সের ঢংটিও। ওরই মধ্যে থেকে লুঙ্গি আর নগ্ন নারীমূর্তি-অঙ্কিত হাওয়াই শার্ট পরা একটি লোক উঠে গেল বিড়ি টানতে টানতে। প্যান্টের উপরে ছেড়ে দেওয়া গোলাপি শার্ট-পরা আর-একটি লোক এক চক্কর প্রদক্ষিণ করে গেল আমাদের বারান্দাটায় সস্তা আতরের উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে।

আমাকে একখানি দরখাস্ত লিখে দিন। সাদা কাগজের একটি পৃষ্ঠা নুরজাহান আমার দিকে বাড়িয়ে দিল।

কার কাছে? কীসের দরখাস্ত? হাকিম আমাকে বেইল দেবে। বেইল আমি চাই না।

সে কী কথা! এমন অস্বাভাবিক কথায় বিস্মিত না হয়ে উপায় নেই।

আপনি হাকিমসাহেবকে লিখে দিন আমি জেলেই থাকতে চাই।

BanglaBook.org

কেন?

আমার কেউ নেই সেজন্য।

বাপ-মা, স্বামী, ভাই-বোন কেউ নেই?

না। দূর মেঘলোক থেকে উত্থিত হালকা গভীর মেঘধ্বনির মতো শব্দটি কানে এল আমার।

কেন? সেই লোকটি? সেই অক্সফোর্ড জুতো...

নুরজাহানের ক্ষুদ্র চোখ দুটো ক্রুদ্ধ আক্রোশে দপ করে জ্বলে উঠে আমাকে মাঝপথেই থামিয়ে দিল।

প্রসঙ্গটা বাড়াতে সাহস পেলাম না। কথামতো দরখাস্ত লিখে পাঠিয়ে দিলাম হাকিমের এজলাসে।

বিস্ময়বিমূঢ় হাকিম সেদিন নুরজাহানের মুক্তির জন্য এগারোটি বেইল প্রার্থনা না-মঞ্জুর করেছিলেন।

আর একদিন। বোধ হয় মাস দেড়েক পর।

নোংরা দেয়ালে আলতোভাবে ঋজু দেহটি ঠেকিয়ে নুরজাহান গল্প করছিল।

মুখোমুখি যে-লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল তার দামি টাই, কোট-প্যান্ট আর চর্বিবহুল দেহে আভিজাত্য না হলেও অর্থের ছাপ সুপরিস্ফুট। বাঁ হাতের দুআঙুলে অভিজাত সিগারেটের টিনটি ধরে, ডান হাতটি লৌহ দরজার শিকে ন্যস্ত রেখে ভদ্রলোক গুরুতর নিবিষ্টতার সাথে কথা বলে চলেছিল।

চেয়ারটি উলটো দিকে ঘুরিয়ে না-শোনার ভান করলেও কথোপকথনের কিছু-কিছু অংশ আমার কানে আসছিল।

অসোয়াস্তি গ্লানিবোধ অথবা লুকিয়ে পরের গোপন কথা শোনার যে পরমতম লজ্জাবোধ সবকিছুকে ছাপিয়ে আমার কৌতূহলটাই সে-মুহূর্তে বড় হয়ে উঠেছিল।

তোমাকে আমার সাথে যেতেই হবে।

তোমার মতো নিষ্ঠুর নরপিশাচের কাছে আমি কখনও ফিরে যাব না। না খেয়ে মরে গেলেও না।

তুমি ভুলে যাচ্ছ তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।

ইস্, কী আমার আহ্লাদের স্বামীর! বিবাহিতা স্ত্রী এ-পর্যন্ত তোমার কয় গন্ডা হল?

ঠাট্টা নয় নুরজাহান। সত্যি আমি তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাই। স্ত্রী হিসেবেই তোমায় রাখতে চাই।

লজ্জা করে না একথা বলতে? কতবার কতজনকে এই মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছ?

কিন্তু...

থামো, এখন দয়া করে চলে যাও। আমাকে আর বিরক্ত কোরো না।

কিন্তু জান তো, কোর্টে মামলা করে তোমাকে ফিরে আসতে বাধ্য করতে পারি আমি?

BanglaBook.org

করে দ্যাখো না।

নিশ্চয় করব। তোমার মতো বজ্জাত মেয়েরা যে নরমে গলে না তা আমি জানি। আরও জানি কেমন করে তোমাদের শায়েস্তা করতে হয়।

কণ্ঠস্বরে নির্দয় কাঠিন্য ফুটিয়ে তোলে লোকটি। চট করে কোনো জবাব দিল না নুরজাহান। তার ক্ষুদ্র হরিণ চোখের তারাজোড়া একবার নেচে উঠল। একটু যেন ফুলে উঠল। গম্ভীর চিবুক রেখায় কুঞ্চিত হয়ে ঝড়প্রত্যাশী মেঘাক্রান্ত আকাশের মতোই স্থির হয়ে রইল। দুপাটি দাঁতের তলায় নিচের ঠোঁটটি পিষতে পিষতে মাথাটি হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে সামনের দিকে একটু নুইয়ে দিলে নুরজাহান।

আমার পিঠের দাগ কি মুছে গিয়েছে ভাবছ? শয়তান! বৌদের দিয়ে বেশ্যাগিরি করিয়ে টাকা বানিয়ে ভদ্রলোক সেজেছ। সে কাহিনি কি কোর্টে গোপন থাকবে ভাবছ?

এই আস্তে আস্তে, এত লোকের সামনে চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

অকস্মাৎ লোকটি বরফগলা পানির মতো ঠান্ডা হয়ে যায়।

বটে! চেঁচিয়ে সমস্ত দুনিয়ার সামনে তোমার মুখোশ আমি তুলে ধরব। যাও না কোর্টে।

নরম আর নিচু গলায় লোকটি কথা বলে চলে। মুখে আপোসের দুর্বল হাসি মেখে নিবেদন করে :

অন্যায় নাহয় আমি করেছি। কিন্তু তার কি ক্ষমা নেই? আর এত কষ্টই-বা তুমি মিছিমিছি করছ কেন? এত লোকের কুৎসিত ইঙ্গিত, দেশজোড়া বদনাম আর হাজতের পচা ভাত—আমার বেডরুম কি এর চেয়ে খারাপ?

চোপ রাও। তুমি যাবে, না আমি ইনপেক্টর সাহেবকে খবর দেব?

আহা, রাগটা থামাও না! আমার আর-একটা কথা শোনো।

তাড়াতাড়ি শেষ করো।

হ্যাঁ শোনো। আমার আর উমেদারি করতে হয় না। নোংরা কাজগুলোও আমি এখন ছেড়ে দিয়েছি। দুটো ইটখোলা চলছে, একটা হোসিয়ারি আর-একটা বেকারি রয়েছে, গত বছর থেকে পাটে নেমেছি। পাটের রোঁয়ায় রোঁয়ায় সোনা। হাত বাড়িয়ে দিলেই হল। বুঝলে? তোমাকে ভালোবাসি বলেই তো আজ এই ঐশ্বর্যের রানি বানিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে নিতে চাই।

বেশ এবার যাও।

শেষ-নির্দেশের শক্ত সুর নুরজাহানের কথায়। মোচড়ানো ডালের মতো লোকটির হাত দুটো হঠাৎ নিচের দিকে ঝুলে পড়ল। হতাশ ভঙ্গিতে মুখটি অদ্ভুতভাবে বিকৃত করে নিচের দিকে ঝুঁকে গেল।

উলটোদিকের চেয়ারে বসে দারোগাসাহেবও আমার মতো অনিরুদ্ধ কৌতূহলে এই প্রাক্তন দম্পতির কথোপকথন শুনে চলেছিলেন। আমার চোখে

BanglaBook.org

চোখ পড়ে একটু যেন লজ্জা পেলেন। চেয়ারটা ঠেলে এনে জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, দেখছেন, এই ভ্রষ্টা মেয়েটির কারবার! স্বামীর ঘর করতে নারাজ। আমি মেয়েটির পক্ষ সমর্থন করে কী-একটা বলতে যাচ্ছিলাম। হাতের কনুইটা আমার মুখের সামনে দিয়ে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে বললেন, আসল কথা কী জানেন? ছিনালির সোয়াদ পাইছে কিনা? তাই একজনে আর মন উঠছে না। হারামজাদি মাগি।

কথাগুলো বলতে বলতে দারোগাসুলভ রক্তচক্ষু দুটি এমনভাবে নুরজাহানের দিকে পাকিয়ে আনলেন যেন এখুনি ওর মৃত্যুদণ্ড জারি হয়ে গেল।

আমি যাই, ওটা আমার হপ্তাস্তয়ারি ব্যাপার। অনেকটা ডিউটি দেওয়ার মতো। নুরজাহানেরও মামলা চলছে। দেখা হয়ে যায় তার সাথে। আর দেখা হয় তার বিচিত্র ভিজিটরদের সাথে। সেই বাড়িওয়ালি, লুঙ্গি আর অক্সফোর্ড শু, সুট-টাই, পাজামা-শার্ট! অনেক তার ভক্ত। অনেক তার স্নেহের উমেদার। রাজধানীর ইতর-অধ্যুষিত ভদ্রবিবর্জিত এই নোংরা একটি ঘরে কত যে জীবননাট্যের নতুন নতুন দৃশ্য আমার সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে চলে তার সব খবর রাখতে পারি কি? এ-নাটকের নায়কনায়িকাদের জৌলুস নেই, এদের কথায় সাহিত্য নেই, কবিতা নেই। এ-নাটকের নির্দিষ্ট কোনো রূপ নেই, চরিত্র নেই। এর নায়কনায়িকার সংখ্যাও অনেক। এরা পৃথিবীর এক অন্ধকার কোণে জন্ম নিয়ে সেখানেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে আলোর মাহাত্ম্য না জেনেই। কিন্তু সহায়-সামর্থ্যের দিক দিয়ে দুর্বল হলেও আশ্চর্য জীবন্ত মানুষ এরা। ছলচাতুরী সত্যমিথ্যা সব মিলিয়ে এরা সাহসী মানুষ। মামলা-মোকদ্দমা, দেনদরবার, উকিল-মুহুরির জুলুমে সর্বস্বান্ত হয়েও এরা বাঁচার স্পৃহা ত্যাগ করে না। পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায়বোধ এদেরকে বিচলিত করে। অপরাধ করে অবনত মস্তকে সাজা নেয় কৃত অপরাধের ন্যায্য পাওনা হিসেবে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর নোংরামি আর অকথ্য কদর্যতার মধ্যে বাস করেও এরা জীবনের সুস্থ কামনাকে বিসর্জন দেয় না। চরম অমানুষিকতার মধ্যেও এরা মনুষ্যত্বের পতাকা ঊর্ধ্বে ধরে রাখে।

তবু এদের কয়েজনকে মনে রেখেছি। মনের কোনায় এরা আঁচড় কেটে গিয়েছে কিন্তু স্থায়ী কোনো দাগ রেখে যেতে পেরেছে কি? নুরজাহানকেও ভুলে যেতাম যদিনা ওকে ঘিরে এতগুলো প্রলয়কাণ্ড ঘটে না যেত। বিশেষ করে সেদিনের ঘটনাটি।

অক্সফোর্ড শু-র সাথে ম্যাচ-করা লুঙ্গি আর সেই লুঙ্গির সাথে ম্যাচ করা হাফ শার্ট। শার্টওয়ালা লোকটির নাম জানতে পেরেছিলাম, করিম। একদিন আবিষ্কার করলাম করিম মেয়েদের মতো ইনিয়েবিনিয়ে শুধু কাঁদতেই জানে না, নিষ্ঠুর আক্রোশে আগুনের ফুলকির মতো জ্বলে উঠতেও পারে।

পুরোদমে কাছারির কাজ শুরু হয়েছে। আসামি উকিল-মোক্তারের ছোটাছুটিতে সরব বাগ্‌বিতণ্ডায় মুখর বারান্দাগুলো। পেয়াদা-কর্মচারীরা

BanglaBook.org

উপরওয়ালাদের ধমকে শশব্যস্ত। করিম কোন ফাঁকে এসে বসে পড়েছে নুরজাহানের দরজার সামনে।

দ্যাখ নুরজাহান, গাছে উইঠ্যা মই ফালাইয়া দিবি না। বালো অইব না কইলাম।

তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কঠিন ভঙ্গিমা আর মুখের মাংসপেশির ত্বরিত সঞ্চালন স্পষ্টই বলছিল সে আজ একটা ফয়সালা করেই ছাড়বে।

আমারে মাইরা তুই শান্তি পাইবি ভাবছস? মরার আগে তরে খুন করতাম না? তর হাড্ডি-মাংস একসাথে কইরা রক্ত চুইষ্যা চুইষ্যা খামু না?

প্রশান্ত নির্বিকার নুরজাহান। খুনখারাবি, খল প্রতিহিংসার মালিন্য তাকে যেন স্পর্শ করতে পারছে না। জীবনের ভয়টিকেও যেন সে জয় করে নিয়েছে। মোটা মোটা লোহার গারদের দরজায় ভারী তালা-আঁটা খাঁচার পূতিগন্ধ আর কদর্য বিভীষিকার অনেক ঊর্ধ্বে বুঝি সে উঠে গিয়েছে। স্বাস্থ্য, স্ত্রী আর সৌন্দর্যের সুস্পষ্ট প্রতীক তার উজ্জ্বল দেহে অন্য রূপের আভা-ভাস্বর অঙ্কিত চর্বি-থলথল মুখে অন্য কথা। আগুনে পোড়া আঘাত-পোক্ত মনে কীসের চিন্তা তাকে আনমনা করে রেখেছে। করিমের হুমকি সে-মনে কোনো রেখাপাত করতে ব্যর্থ হয়। স্বৈরিণী বিলাসিনীর নির্মোক মনের জন্য চিন্তা নুরজাহানকে বুঝি কোনো অতীন্দ্রিয় আবেশে টেনে নেয়। নিরুত্তরে হরিণচোখের গোলাকার মণিগুলোকে সুস্থির করে সে তাকিয়ে থাকে করিমের বক্রভঙ্গি দেহের পানে।

তুই কেমন নেমকহারাম রে! সোয়ামি ব্যাটার গুঁতা খাইয়া খাইয়া গায়ের হাড্ডি যখন ঝাঁজরা হইছিল আমি না তরে বসতি দিছি, খাইবার দিছি? ভুইল্যা গেলি? রাগের মাথায় রোসনারে নাহয় বাড়ি মারছিলাম একডা। হেতে যে মাইয়েডা মইর‍্যা যাইব তা কি বুঝছিলাম, না তুই বুঝছিলি?...

আমি মিথ্যা সাক্ষী দিবার পারমু না।

তার কথাটা শেষ না হতেই নুরজাহান জবাব দেয়। ধীর, সংযত, দৃঢ় কণ্ঠ।

ক্যান দিবি না সাক্ষী? আমারে বাঁচান লাগব না? ভারি হাঁছা কথা কওনেওয়ালি রে? তরে আমি খুন কইরা তবে আমার সাধ মিটামু হারামজাদি মাগি। যাইবি কই?

মিথ্যা সাক্ষী দিবার পারমু না—এক কথা নুরজাহানের মুখে।

শিকের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ করিম দুহাত বাড়িয়ে নুরজাহানের পাজোড়া জড়িয়ে ধরে। দরজার চ্যাপটা লৌহপাতের উপর মাথাটা উন্মাদের মতো আছড়াতে থাকে। সশব্দ কান্নায় আর্তনাদ করে ওঠে :

তর পায়ে পড়ি নুরজাহান, আমারে মারিস না। আমি বাঁচবার চাই। আমারে বাঁচা।

বহুত পাপ করছি। আর না।

BanglaBook.org

খাঁচার মতো জানালাহীন ঘরগুলোতে চতুর্দিকে কংক্রিটের নিরেট আবরণে ঢাকা বারান্দার নিস্তরঙ্গ বাতাসে নুরজাহানের কথাগুলো দূরাগত কোনো লোক-সংগীতের মতো করুণ মূর্ছনায় ভেঙে পড়ে। অনেক পাপ করেছে সে—এখানেই পাপের ইতি টানতে চায়। গারদের শিকে দুহাতের সমস্ত জোর কেন্দ্রীভূত করে পা-জোড়া প্রাণপণে টেনে নেয় করিমের বাহুবেষ্টন থেকে। বিরক্ত কুঞ্চিত মুখের রেখায় তার আশ্চর্য প্রতিজ্ঞা।

মায়া হল লোকটির জন্যে। সেদিনের রাগের কথাটা মনে পড়ে কেমন যেন লজ্জা অনুভব করলাম। ভাঙা মাস্তুলের মতো বিধ্বস্ত লোকটির অসহায় কাকুতি আমার সহানুভূতি আকর্ষণ করল। সেই অনুপাতে নুরজাহানের প্রতি বিতৃষ্ণায় মনটি ভার হল। কী একরোখা মেয়েটি! ওর কাছে একটি জীবনের কোনো দাম নেই। লোকটিকে উদ্দেশ করে বললাম, কেন মিছিমিছি নিজেকে ছোট করছ? ঐ ডাইনি মেয়ের দিলে কি রহম আছে? দেখছ না, কীরকম সিমারের মতো চোখ!

বুঝলাম ওরা কেউ আমার এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ পছন্দ করলে না।

করিম একবার ঘাড়টা ফিরিয়ে গারদের গায়ে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদছে। নুরজাহানের পুষ্ট ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসির একটি ক্ষীণ তরঙ্গ খেলে গেল। হয়তো আমার বেওকুফির জবাব। এত কিছুর মধ্যে মেয়েটি হাসতে পারে!

কিন্তু পলক না ফেলতেই সে-হাসি আতঙ্কিত চিৎকারে ঝরে পড়ল। নিমেষের মধ্যেই ঘটে গেল তুমুল কাণ্ড। কোমরের কোনো অদৃশ্য ভাঁজ থেকে নেপালি কুকরির মতো ছোট একখানি ছোরা বের করে করিম চিড় চিড় করে চালিয়ে দিয়েছে নুরজাহানের বুকে, হাতে-বাহুতে। নেশাগ্রস্ত ক্ষিপ্তের মতো ছোরাবদ্ধ হাত অভ্যস্ত টানে আঁচড় কেটে চলেছে। রক্ত ছুটছে ফিনকি দিয়ে।

হারামজাদি ছিনাল। পাপ আর সয় না। তরে বেহেশতের টিকিট কিইন্যা দিতেছি। লে, লে, ধর। শালি বজ্জাত...।

ক্ষিপ্ত মস্তিষ্কের হিংস্র প্রলাপ। বন্য প্রতিহিংসার অন্ধ প্রকাশ। দূরে ছিট্‌কে পড়ে নুরজাহান, প্রাণভয়ে ভীতা হরিণীর মতো।

হকচকিয়ে যায় দারোগা, সান্ত্রি। এত লোকজনের হৈচৈ আনাগোনার মাঝে এমন নৃশংস আর গর্হিত কোনোকিছু ঘটতে পারে তা ছিল ধারণার অতীত। সান্ত্রি দৌড়ে এসে করিমের রক্তমাখা হাতটি ধরে ফেলল। টেনে নিয়ে গেল পুরানো খাঁচায়।

রসদ-গুদামের সামনে উদ্বাহু বটের মাথা থেকে ধীরে ধীরে নেমে এসেছে নিরেট অন্ধকার। নিকষ কালো হাতের শক্ত মুঠোয় অসহায় রাত্রির টুঁটি চেপে ধরেছে। চেতনাহীন কথাহারা রাত্রি বোবা কান্নায় প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু কে শুনছে তার কান্না? কে দেখেছে তার কালো চোখের বেদনা? অন্ধকার দৈত্য ক্রূর প্রতিহিংসায় দলে পিষে গুঁড়িয়ে চলেছে পেলব রাত্রির কুল্লবিথার কামনাগুলোকে। দয়াহীন, মায়াহীন সেই নিষ্ঠুর দানব। স্তব্ধ রাত্রি আত্মযাতনার কোনো নির্বীর্য

BanglaBook.org

উল্লাসে নিজেকে সঁপে দিয়েছে তার কণ্টককোলে। আজ তাই ঘুম নেই তার চোখে।

কুৎসিত আর ভয়ংকর কারাগারে এই নিদ্রাহীন কালো রাত্রির চেহারা। পাষাণ-প্রাচীরের ঘণ্টাচূড়ায় দাঁড়িয়ে কোন বিষকন্যা ঢেলে চলেছে গরলধারা? অন্ধকার চুঁইয়ে চুঁইয়ে সে-গরলধারা ঝরে পড়ছে গারদে গারদে, ইট-কংক্রিটের গায়ে গায়ে। ইস্পাতের কড়ায়, পেতলের আংটায়, মরচে-পড়া শিকলিতে, ডান্ডাবেড়ির গায়ে শত-সহস্র বিষ-মুখ ছোবল মেরে চলেছে ঘুমন্ত মানুষের বুকে। লৌহদেহী প্রেতাত্মার দল মৃত্যুগুহার দ্বার খুলে বেরিয়ে পড়েছে নিশীথ-অভিসারে। তাদের হিমেল নিশ্বাস আর উন্মত্ত দাপাদাপিতে ত্রাসবিদ্ধ রাত্রি শিউরে উঠছে ক্ষণে ক্ষণে। কারাগারের চোখে ঘুম নেই। কারাবাসীরা বিনিদ্র চোখে কানা খাড়া করে রয়েছে মৃত্যুঘণ্টার শেষ ধ্বনি শুনবে বলে।

আজকের এই ভয়ংকর রাত্রে সিপাহি-সান্ত্রির মনেও বুঝি আতঙ্ক বিভীষিকার সঞ্চার করেছে। সেই ভয় ঢাকবার জন্যই বুঝি মাঝে মাঝে অস্বাভাবিক স্বরে চেঁচিয়ে উঠছে...আট নম্বর...। অন্ধকারের বুক চিরে দূর আট নম্বরের আওয়াজ ভেসে আসে তার এক ডান্ডাবেড়ি, তিন লালটুপি, চার বাত্তি, থালাবাটি ঠিক আছে বুঝাইয়া দিলাম তেসরা পাহারা—গিনতি করা দশ নম্বর...অন্ধকার তরঙ্গে ভেসে গিয়ে কথাগুলো ধাক্কা খায় দূর প্রাচীরে। এ-গারদ সে-গারদকে বরাভয় জানায় এমনি নিজস্ব ভাষায়। ভয়াল রাত্রিতে সবাই সজাগ। উৎকর্ণ প্রতীক্ষায় প্রহর গড়িয়ে যায়।

মরা চোখের মতো জ্যোতিহীন হারিকেন বাতিটাকে উসকে দিয়ে সিপাহিজি এবার আশ্রয় নেয় কাঠে-ঘেরা গুমটিঘরের নিরাপদ কোণে। অবসাদটা ঝেড়ে ফেলার জন্য বুটের লোহাপেটা গোড়ালিটাকে স্ম্যব দেওয়া মানে বারকয়েক ঠোক্কর মেরে হাতের আর পায়ের মটকা ভেঙে নেয়। কড়কড় ঠকঠক বুটের শব্দে সচকিত করে তোলে আতঙ্কিত রাত্রিকে। দু গোড়ালির সংঘর্ষে ধাতব গর্জন তুলে টানটান হয়ে স্যালুট দেয় সিপাহি।

হুঁশিয়ার রহ্না। সাহাবকা আনেকা টাইম হোগিয়া।

জমাদার দোসরা নম্বরের উদ্দেশে চলে যায়।

হাবিলদার এসে আবার হুঁশিয়ারি দিয়ে যায়। কড়া ডিউটি। আজকের রাত্রে ঢিলেমি, অসতর্কতা চলবে না।

মিশকালো টুঁটিচিপা রাত্রির আয়ু কমে আসে।

একটি মানবশিশুর হঠাৎ আর্তনাদে অন্ধকার কেঁপে উঠল। এ-কারাগারে কোন নবজাতকের কান্না?

বটের মাথা থেকে অন্ধকার যবনিকা যখন গুটিগুটি নেমে আসছিল সেই তখন বেহাগবেদনার মতো একটি চাপা কান্নার করুণ মূর্ছনায় গারদের মধ্যে সচকিত হয়ে উঠেছিলাম। বিষবাণে জর্জরিতা কোন গারদবাসিনীর অর্ধস্ফুট বিলাপ।

BanglaBook.org

লৌহপ্রেতিনীর সুবিপুল প্রাগৈতিহাসিক দেহের অজস্র সুড়ঙ্গপথ বেয়ে সে বিলাপ ছড়িয়ে পড়ছে।

মানবশিশুর ঘুমভাঙা চিৎকারে আবার চমকে উঠলাম। আমার ঘরের দেয়ালে কান পেতে রইলাম। ভয় বিস্ময়ে দেহের ধমনিপ্রবাহ মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়াল। পাঁচ ইঞ্চি দেয়ালের ওপার থেকেই দমকে দমকে ক্রন্দনের রেশ ভেসে আসছে। আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বিলাপের বেগে নুরজাহানের বহুভোগ্যা সুকোমল তন্বী দেহটি বেঁকে বেঁকে ভেঙে পড়েছে। কম্বলের রুক্ষ ঘর্ষণে বহুআকর্ষিতা নরম বাহু দুটি ফুলে উঠেছে। হরিণচোখে ঢল নেমেছে। আশ্চর্য হলাম। নুরজাহান কাঁদছে? সে কাঁদতে পারে? যে-মেয়ের মুখে এত হাসি, হরিণচোখে যার এত কামনা?

কালো রাত্রির দুষ্ট প্রহর ঘনিয়ে আসে। বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। ঠুক করে একটি ঘণ্টা বাজল। লৌহকপাটের মাস্টার লক খুলে গেল। লায় লস্কর পরিবেষ্টিত কারাধিপতি প্রবেশ করলেন। অতি ধীর আর অকম্পিত পদক্ষেপে তারা অন্ধকারে সাদা ছায়ার মতো এগিয়ে গেল। দূর কোনো গারদের কোণে মিলিয়ে গেল শেষ রাত্রির দুঃস্বপ্নের মতো।

অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে। ঘন্টি-চূড়ার গুমটিঘরে রাইফেলধারী সান্ত্রির নিশ্চল দেহটি দাঁড়িয়ে রয়েছে মাটির পুতুলের মতো সদা অ্যাটেনশন করা। পাকঘরে গরম গরম লপসি ঢালার শব্দ ভেসে আসছে। প্রেতরাত্রির অসাড়তা কাটিয়ে কাকের দল প্রাতরাশের সন্ধানে বেরিয়েছে। মেথর টিন নিয়ে নৈমিত্তিক দায়িত্ব পালনের কাজে চলেছে।

ছোট ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে কালো কাপড়ে ঢাকা লাশটি বের করে আনা হল আধো অন্ধকারের আবছায়ায়। জিলাজজের দণ্ড মোতাবেক করিমকে আজ ভোর রাত্রি চারটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে ফাঁসিতে ঝুলানো হয়েছিল।

কোনো উদ্বেলিত রোদনের বুকফাটা আর্তনাদ শোনার জন্য আমি কান পেতে রইলাম। শুনতে পেলাম না কিছুই। জৈবিক অর্চনায় উন্মত্ত ক্ষুধিত কাকের চিৎকারে হয়তো সে-আর্তনাদ তলিয়ে গিয়েছে।

আতঙ্কিত ছিলাম নুরজাহানের সাথে আবার কখন দেখা হয়ে যায়। মনে-প্রাণে কামনা করছিলাম তাকে যেন আর দেখতে না হয়। এই ভ্রষ্টা নারীর হৃদয়হীন আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলাম।

অভিশাপ আর অকল্যাণের এই মূর্তিমান প্রেতিনীর বিরুদ্ধে তিক্ততায় বিষিয়ে ছিল মনটি।

অন্ধকার রাত্রির ফিকে প্রহরে অপস্রিয়মাণ সেই কালো কাফনটির স্মৃতি আজও আমাকে উন্মাদ কাপালিকের তান্ত্রিক নেশার মতো তাড়িয়ে বেড়ায়। খাটিয়ার উপর মৃদু হিল্লোলিত নিষ্প্রাণ দেহটি আজও যেন আমাকে চাবুকের মতো প্রহার করে চলেছে। করিম ফাঁসির দড়িতে ঝুলতে ঝুলতে যে-অন্তিম কামনা রেখে

BanglaBook.org

গিয়েছিল এই পৃথিবীর উদ্দেশে, তা যেন আমারই কথা। তার মানবীয় প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার দায়িত্বটাও যেন আমারই স্কন্ধে ন্যস্ত। নুরজাহানের সাথে দেখা না করেই সেই জিঘাংসার আগুনে তাকে কেমন করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে যোগ্য শাস্তি দেওয়া যায় তাই ভাবছিলাম। আর একান্তই যদি দেখা হয়ে যায় তবে আচ্ছা করে অপমান করে দেব এটাও ভেবে রেখেছিলাম। যে-মানুষ চলে গিয়েছে জীবনের কামনাকে অতৃপ্ত রেখে তার অভিশাপ নুরজাহানের প্রাপ্য। সেই শাপে তাকে দগ্ধ হতেই হবে।

কিন্তু ভাবাটাই সার হল। সেই কালরাত্রির পর আরও ষাটটি রাত্রি পেরিয়ে যখন করিম অসংখ্য অর্থহীন জীবন আর ততোধিক অর্থহীন মৃত্যুর ভিড়ে অস্পষ্ট হয়ে আসছিল আমার স্মৃতিতে, তখন নুরজাহানকে দেখলাম আর-এক বিস্ময়ের চমকিতে চোখে।

স্বাস্থ্যশ্রীতে আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হয়েছে নুরজাহান। সুপুষ্ট দেহের খাঁজে খাঁজে জড়িয়ে রাখা শাড়িখানা দেহসৌষ্ঠবকে আরও স্পষ্ট আরও ইঙ্গিতময়ী করে তুলেছে। সুর্মাটানা হিরণচোখে যেন যৌবনবতীর প্রথম ভাষা।

বিলোল কটাক্ষে রক্তজাগা নেশায় সে-ভাষা ঝরে পড়ে।

ছয় মাস আগে ক্ষুধার্ত কঙ্কালিনীর ডাইনিদৃষ্টি দেখে শিউরে উঠেছিলাম। তারপর প্রথম বৃষ্টি-পাওয়া ঘাসডগার মতো তন্বী কিশোরীকে দেখে চিনতে পারিনি। আর আজ লাস্যময়ী যৌবনবতীর পরিতৃপ্ত সুখী মুখখানি দেখে অবাক হলাম। এত সুখের সন্ধান কোথায় পেল নুরজাহান? স্বামীনিগৃহীতা দেহবিলাসিনীর এই উচ্ছল লাবণ্য আর সরস কৌতুক কোথায় লুকানো ছিল এতদিন? মনে হল কোনো রুপোর কাঠির জাদুস্পর্শে নতুন সৌন্দর্য নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছে। অবরুদ্ধ স্রোতের হঠাৎ মুক্তি পাওয়া কলকল গতি আর উপচে-পড়া প্রাণ তার কথার টানে, পেলব তনুভঙ্গিমায়, পুষ্ট ঠোঁটের চিকন হাসিতে।

ইতরসমাজের তীর্থভূমি। অপরাধী দুনিয়ার সূতিকাগার। সেই জানালাবিহীন নিচু দেয়ালঘেরা খাঁচার মতো ঘর। স্বদেশি গন্ধে ভরপুর। তিন ইঞ্চি ফাঁক ফাঁক লোহার শিকওয়ালা একটিমাত্র দরজা। লৌহখিলান আর ইস্পাতের কবজায় শক্ত করে আঁটা। দেহটি কলমিলতার মতো বেঁকিয়ে আবাহুবন্ধনীতে লৌহদরজাটা আবৃত করে নুরজাহান দাঁড়িয়ে। দরজার ওপারে উত্তরদেশীয় সান্ত্রি আর কতিপয় ইয়ার ভক্তের সুপরিচিত দলটি। অবাধ হাস্যালাপ আর চটুল দৃষ্টিবিনিময়ে আজকের আবহাওয়া গন্ধ-উতল উৎসবরাত্রির মতো। একটুখানি চাহনির কৃপায় ভক্তের অসীম কৃতজ্ঞতায় হাতজোড় করে গলে পড়ছে ওর পায়ের কাছে। কেউ আনছে সন্দেশ, কেউ মিষ্টান্ন। কেউ ছাঁচি পান। নুরজাহান কাউকেই আজ ফিরিয়ে দিচ্ছে না। এক টুকরো সন্দেশ মুখে পুরে ঠোঙাটা তুলে দিচ্ছে ওদেরই হাতে, নাও তোমরা খাও। পানটা মুখে পুরে হয়তো-বা স্থূল রসিকতায় হেসে উঠছে, নাসির মিঞা, তুমি কি আমারে ঘরের বউ করবার আইছো? দেনমোহর কত দিবা

BanglaBook.org

কও দিহি? হিমালয়ের মতো নুরজাহানের ভক্তকুলের ধৈর্য। এই কুপিতা নারীর একটুখানি সোহাগদৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কতদিন ধরে তারা দূর থেকে প্রার্থনা নিবেদন করে চলেছে। খররোদে পুড়ে অথবা বৃষ্টিঝড়ে ভিজে ভিজেও অপেক্ষা করেছে—যতক্ষণ না নুরজাহান তার ঘেরা গাড়িতে চড়ে তার স্ব-নির্বাচিত আস্তানায় ফিরে এসেছে। সান্ত্রির গুঁতো খেয়েছে। দারোগাসাহেবের অশ্রাব্য গালি খেয়ে মুখ কাঁচুমাচু করেছে। তবু তারা কাছে এসে নুরজাহানকে এক পলক দেখে নেবার লোভ ছাড়েনি। দূর থেকে সকরুণ নিবেদনে চোখের জল ফেলেছে। আজ তাদের মহাউৎসবের দিন। দীর্ঘ প্রতীক্ষাশেষে ঈপ্সিত প্রিয়াকে বরণ করে নেবার দিন। অনেক দিন ভেবেছি। আজও ভাবছি ওদের মধ্যে কেউ কি নুরজাহানকে ভালোবাসেনি? সবাই কি শুধু তার সুন্দর দেহের প্রতিই প্রলুব্ধ? সবাই কি ওকে বাজারের পণ্যরূপেই ব্যবহার করতে চায়? ওদের মধ্যে এমন কেউ কি নেই যে নুরজাহানকে প্রিয়া ও জীবনসঙ্গিনীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়?

অনেক দিন এ-প্রশ্ন মনে জেগেছে। অনেক দিন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। এমন দৃশ্যের জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। অনুতপ্ত, শোকে বিহ্বল, কৃশ নূরহাজানের হাসিই কল্পনা করে রেখেছিলাম। তবু মনে-মনে বহুবার রিহার্সেল-দেওয়া কথাগুলো শাণিয়ে নেবার চেষ্টা করছিলাম। দারোগাসাহেবের তাড়া খেয়ে ভক্তবৃন্দের আড্ডাটা একটু হালকা হতেই নুরজাহানের চোখে চোখ পড়ল। একটি আধুনিকা তরুণীর মার্জিত হাসি দিয়ে সে আমায় অভ্যর্থনা করলে। কাছে এসে দেখলাম উচ্চশ্রেণির আধুনিকা তরুণীদের মতো বুককাটা ব্লাউজের উপর একটি ছবি-আঁকা সিল্কের শাড়ি পরেছে সে শৌখিন ভঙ্গিতে। শাড়ি-ব্লাউজের সাথে স্যান্ডেলজোড়াও ম্যাচ করা। এমন করে নুরজাহানকে কোনোদিন আসতে দেখিনি। কোনোরকম ভূমিকা না করেই জিজ্ঞেস করলাম, করিমের খবর জান? তার তো ফাঁসি হয়ে গেছে।

এমন প্রশ্নের জন্য হয়তো সে প্রস্তুত ছিল না। থতমত খেয়ে পালটা প্রশ্ন করল অনুচ্চ কণ্ঠে, করিম? কোন করিম?

ততক্ষণে মাথায় আমার খুন চড়তে শুরু করেছে। রিহার্সেল-দেওয়া কথাগুলো প্রলয়ংকরী বন্যার তোড়ে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল তা আর চিনবে কেন? দয়ামায়া বলে কোনো পদার্থ তো আর মনের মধ্যে বাঁচিয়ে রাখনি। দেহটি যেমন খোলা বাজারে বিক্রি করছ তেমনি হৃদয়টির মধ্যেও লোহা ঢুকিয়ে রেখেছ। তাই দুর্দিনের যে-বন্ধুটি জল্লাদের হাতে মারা গেল তার জন্য এক বিন্দু অশ্রু ঝরে না। ইতর স্তাবকদের নিয়ে ঠাট্টা-ইয়ারকিতে এতই মশগুল হয়ে পড়েছ যে, তার নামটিও মনে করতে পারছ না। তোমাদের মতো মেয়েরা সমাজের শত্রু। ফাঁসিতে ঝুলিয়ে তোমাদের মারা উচিত।

নুরজাহানের এই ক্ষমাহীন আচরণে সত্যি রেগে গিয়েছিলাম। রাগে আর উত্তেজনায় বিশেষভাবে পছন্দ করা কড়া কথাগুলো ভুলেই গেলাম। তবু সেই

BanglaBook.org

আঁধাররজনী থেকে আজ পর্যন্ত যে-আক্রোশ আমার মনে স্তরে স্তরে পুঞ্জীভূত হয়েছিল তার খানিকটা জ্বালা মেটাতে পেরে তৃপ্তি পেলাম। এখানেও নুরজাহান আমার অনুমানটা মিথ্যা প্রমাণিত করল। একটুও সংকুচিত হল না সে। ক্রুদ্ধা সর্পিণীর মতো বিষজিহ্বা বিস্তার করে পালটা ছোবল মারার জন্য এগিয়ে এল না। স্বল্পপরিচিত পুরুষের অনধিকার চর্চা বলে ক্রোধ প্রকাশ করল না। যেন বিস্মিত হয়েছে এমনভাবে অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, আপনিও বুঝি তা-ই মনে করেন?

আমার নাতিদীর্ঘ বক্তৃতার পর এত ছোট একটি প্রশ্ন প্রত্যাশা করিনি। পৌরুষগর্বে আঘাত পেয়ে প্রত্যাঘাতের জন্য প্রস্তুত হলাম, বললাম, পরিষ্কার করে বল না কেন?

এর মানে আমাদের মতো মেয়েরা সমাজের শত্রু, আমাদের ফাঁসি হওয়া উচিত?

নিশ্চয়।

বিচারক বুঝি আপনারা? অর্থাৎ আপনার মতো ইমানদার চরিত্রবান সব পুরুষেরা?

বুঝলাম এবার আমার দেয়ালে পিঠ দিয়ে আত্মরক্ষার পালা।

বেশ তো, বিচার হোক। যারা এক গন্ডা কলেমা পড়া বই ঘরে পুষেও দিল খোশ করার জন্য বাজারের রূপসীদের পেছনে ছোটেন, তাঁদের বিচারটা আগে হওয়া দরকার নয় কি?

কিন্তু তোমার স্বামী তো সেরকম ছিলেন না।

তার চেয়েও অধম। সে আমাকে তার বন্ধুর বাড়ি তুলে দিয়ে আসত ব্যবসার সুবিধার জন্য।

তারপর?

বন্ধুদের মনোরঞ্জন করতাম।

তুমি প্রতিবাদ করনি?—অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

কতদিন মার খেয়েছি।

তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি চলে যাওনি কেন? চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তালাক হয়নি।

কেন? ইসলামি বিয়েতে মেয়েরা তো যে-কোনো সময় তালাক দিতে পারে।

ওটা আপনার ভুল ধারণা।—আমার জ্ঞানের প্রতি অনুকম্পার ম্লান একটু হাসি জুড়ে দিয়ে কথাটা বলে নুরজাহান। তালাক নাহয় হল না। বাপের বাড়ি গিয়ে চুপচাপ বসে থাকলেই স্বামীরত্নটি ঢিট হয়ে যেত।

তার কোনো উপায় ছিল না। আমি তো বাপমায়ের অমতে বিয়ে করেছিলাম।

প্রেম করেছিলে?

লোকে তা-ই বলে। আমিও তা-ই মনে করতাম।

BanglaBook.org

তবে তো দোষটা তোমারই। ভালোবাসার পাত্রকে মনের মতো করে গড়ে তোলাটা তো প্রেমেরই সাধনা।

আপনার কি মনে হয় সে চেষ্টা করিনি?

ব্যর্থ হয়েছ?

সফল হইনি।

নুরজাহানের অভিশপ্ত জীবনের আর-এক কাহিনিতে আচমকা ঢুকে পড়লাম। কথার পিঠে কথাই বেড়ে চলেছিল। যা ভেবে রেখেছিলাম তার কোনোকিছুই বলতে পাবার সুযোগ না পেয়ে নিজের উপরই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম।

প্রশ্ন করলাম অন্য খাতে। বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম। লেখাপড়া তো তোমার মন্দ ছিল না। নিজের সৎ উপায়ের উপর নির্ভর করে সৎ জীবনযাপন করলে না কেন? পাপপথে কেন এলে?

ছেলেটা কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়েছিল। মাথার তলায় একটি ইট গুঁজে দিয়ে ওকে মেঝের উপর শুইয়ে দিলে। মুক্তোর মতো দাঁতগুলো অনামিকার ডগা দিয়ে খুঁটতে খুঁটতে একটুখানি কী যেন ভাবল নুরজাহান। তারপর অতি সংক্ষেপে বললে—গ্রহের ফের।

অর্থাৎ নিজের বদ প্রবৃত্তির তাড়নাটা চাপিয়ে দিচ্ছ ভাগ্যের উপর।

যথেষ্ট কাঠিন্য আর ঝাঁজ জুড়ে দিলাম কথার সাথে।

একটি কঠিন ধাক্কা সামলে নিল নুরজাহান। কুঞ্চিত ভ্রূর নিচে হরিণচোখের কালো তারাগুলো দপ করে জ্বলেই নিবে গেল পরমুহূর্তে। দেখলাম একরাশ সিঁদুরে মেঘ তার মুখের উপর রক্তিম ছায়া ফেলেই চকিতে সরে গেল। অনেকক্ষণ চুপ করে রইল সে।

কী জানেন আপনি এদেশের মেয়েদের সম্পর্কে? বাপ-মা বা স্বামীর আশ্রয় যাদের নেই সেই মেয়েদের স্থান কোথায় তা জানার চেষ্টা করেছেন কোনোদিন? কোনো মেয়েকে একলা রাস্তায় চলতে দেখলে আপনাদের মতো ভদ্রসন্তানেরা এখনও পিছু নেন। গুন্ডারা ওত পেতে থাকে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য। স্বাধীনভাবে সৎ জীবিকা নির্বাহের কোনো পথ যদি আমার খোলা থাকত তবে কি আমি করিমের আড্ডায় গিয়ে উঠতাম! উপার্জনের ঐ একটি পথই তো আপনারা আমার মতো হাজার হাজার অসহায় নারীদের জন্য খোলা রেখেছেন।

নুরজাহানের কথাগুলো লঙ্কার ছিটার মতো আমার চামড়ায় জ্বালা ধরিয়ে দিল। বললাম, দেহবিলাসিনীর মুখে নারীস্বাধীনতার উপর বক্তৃতা শোনার মতো রুচি আমার নেই।

তাতে আপনাদের অপরাধ একটুও কমে না।

তোমাদের উচ্ছৃঙ্খলতায় সায় না দিলেই অপরাধ হয় বুঝি?

দেশোদ্ধার করতে গিয়ে যারা জেল খাটে তারা যে গালাগালি করে এটা তো জানতাম না।

BanglaBook.org

কথাটা কাঁটার মতো এসে বিঁধল আমার গায়ে। গালাগালি নয়; বলছিলাম, সৎপথে চলার সময় এখনও তোমার ফুরিয়ে যায়নি।—স্বরটাকে যথাসম্ভব মোলায়েম করে বললাম।

কী এক গভীর বেদনায় করমচারাঙা দুটি ঠোঁট কেঁপে কুঁচকে অদ্ভুতভাবে বেঁকে রইল। যেন একটি গভীর জিজ্ঞাসা সমুদ্রের অতল গভীর থেকে উঠে এসে ওর ঠোঁটের কোণে আশ্রয় নিয়েছে। জীবন-মন্থন-করা হলাহল ওর মুখে নীল কাঠিন্য ছড়িয়ে দিল।

নেবেন আমাকে আপনাদের বাড়িতে, বোনের মতো, স্ত্রীর মতো করে? সেই সাহস আছে?

গবাক্ষহীন ঘরে রুদ্র তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়ল কথাগুলো।

না তা নয়, কথাটা হল নিজের পায়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করা উচিত তোমার।

আমতা আমতা করে বললাম।

ভারি সুন্দর হিতোপদেশ।

বিদ্যুতের এক টুকরো হাসি ঝিলিক মেরে গেল। আমি দেখেও না-দেখার ভান করে চুপ রইলাম।

জানেন? ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে আমরা ভাইবোনেরা মিলে এক বুজুর্গ আলেমের কাছে আরবি কোরান পড়তাম। সেই মৌলবিসাহেবের কাছেই আমি নামাজ পড়া থেকে শুরু করে বাংলা প্রথমভাগ শিখি। খুব ওয়াজ করতেন তিনি আমাদের বাড়িতে, মসজিদে আর আশেপাশের গ্রামেও। তারপর কী হল জানেন?

কী হল?

মৌলবিসাহেব একদিন আমাদের চাকরানিটিকে নিয়ে পালিয়ে গেলেন।

তারপর?

তখন থেকেই যারা নসিহত খয়রাত করে তাদের প্রতি আমার বিরাগ।

একটা জুতসই জবাব দিতে গিয়ে উগ্র বিদেশি গন্ধে মুখে রুমাল চাপলাম। চকচকে সার্ক স্কিনের সুট-পরা নুরজাহানের ব্যবসায়ী স্বামী। সংগতি আর প্রতিপত্তির ছাপ তার পদক্ষেপে। ডিউটি সিপাহি সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ায়। দরজা থেকে দূরে এসে আমিও ওর দিকে সৌৎসুক্যে চেয়ে রইলাম। কালো কোট-টাইপরা একজন উকিল তার পেছনে।

টুলু এসেছে।

কোথায়, কোথায় টুলু? আমার কাছে নিয়ে এসো না ওকে! —রুদ্ধশ্বাসে কথাগুলো বলে গেল নুরজাহান। উত্তেজনায় ওর হাত পা কাঁপছে আর ঘনঘন নিশ্বাসের টানে বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। ব্যগ্র প্রতীক্ষা আর অধীর উত্তেজনায় ওর গলার শিরাগুলো যেন টান হয়ে দাঁড়াল। নিজেকে সামলে নেবার ব্যর্থ প্রয়াসে আরক্ত চিবুকটা রুদ্ধ দরজার শিকে ঘষে ঘষে আরও লাল করে তুলল।

গাড়িতে বসে আছে।—ওর স্বামী উত্তর দেয় সংক্ষেপে।

BanglaBook.org

গাড়িতে কেন? এখানে আনো-না! একটিবার দেখি ওকে।

একটি নারীর সমস্ত আবেদন ফুটিয়ে তুলল নুরজাহান তার মিনতিকরুণ কণ্ঠধ্বনিতে আর আবেগবিহ্বল মুখে।

উকিলসাহেবকে নিয়ে এসেছি। ওকালতনামাটা তা হলে সই করে দাও।

দাও, দাও এখুনি সই করে দিচ্ছি।—প্রবল আগ্রহে নুরজাহান হাত বাড়িয়ে দিল উকিলের দিকে।

ওকালতনামার ডান পাশে কম্পিত হস্তে কোনো রকমে সইটা বুলিয়ে দিলে নুরজাহান। সইটা নিয়ে উকিল আর স্বামী বেরিয়ে গেল।

গভীর ঔৎসুক্যের সাথে আমি এই নতুন দৃশ্যটা দেখছিলাম। এই মধ্যযুগীয় কারখানায় যেখানে ঘোড়া পিটিয়ে গাধা করা হয়, সেখানে অভাবনীয় সব ঘটনা ঘটে। ছেলে চুরি করে মায়ের কানের সোনা। বাপ মেয়েকে বিক্রি করে দেয়। স্বামী স্ত্রীকে ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। এসব ঘটনায় এখানে কেউ ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করে না। এখানে প্রতি মুহূর্তে জীবনের কেনাবেচা চলছে, জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে। আর সেসব ঘটনা কোনো কৌতূহলী পথিকের হয়তো চোখে পড়ে (চোখ তুললে) কিন্তু মনে কোনো দাগ কাটে না। এই নিয়মের সাথে আমি এখনও পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারিনি বলে ক্ষণে ক্ষণে আশ্চর্য হই। যা দেখি তা নিয়ে মনের মাঝে নাড়াচাড়া করি। ভালোমন্দের একটি যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা মনে-মনে বানিয়ে নিই। তারপর চোখ বুজে চলি। আবার চোখ খুলে কোনোকিছু চোখে পড়লেও না-দেখার ভান করে চলে যাই।

চলে যাই কেননা মনে আঁচড় কাটতে দিলেই তো ব্যাখ্যার সন্ধান করতে হবে। আর তাতে স্নায়ু ও দেহ দুটোরই আয়ু যায় কমে।

কিন্তু নুরজাহান সম্পর্কে চোখ বুজে থাকা অসম্ভব। তার ব্যাপারে আমার ঔৎসুক্য স্বাভাবিকের তুলনায় বেশি। শ্যামলা রঙের এক দুষ্টু খোকাকে নিয়ে ভদ্রলোক একটু পরেই প্রবেশ করলেন। বছর চারেক বয়সের ছেলেটি—দেখতে রোগা হলেও লাবণ্যের সুষমায় অপূর্ব সুন্দর। চোখ দুটোতে দুষ্টুমির বুদ্ধি। মুখে অশিশুসুলভ একটি দাম্ভিক তেজস্বিতা যা একমাত্র বিদ্রোহী যৌবনেরই বৈশিষ্ট্য।

লৌহকপাটের শিকের ফাঁক দিয়েই দুটো উন্মুখ বাহু নুরজাহান প্রসারিত করে দিল টুলুর দিকে। তারই সন্তান। তারই রক্তের একটি কণা। তারই কলজের ছিন্ন অংশ। রুদ্ধ নিশ্বাসে আমি দেখলাম, স্নেহব্যাকুল মায়ের উদ্বেলিত বক্ষে সন্তানের নির্ভয় আত্মসমর্পণ। দরজাটা খুলে দিতেই টুলুকে নুরজাহান বুকের মাঝে লুফে নিল। ওর গায়ে, মুখে, গলায় হাতটা বুলিয়ে নিল। বারবার চিবুকটা মুখের কাছে টেনে তুলে আদর করল। শিশুর সুন্দর লাবণ্যঝরা মুখটি কতভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। হাতের নরম তালুগুলো বারবার টিপে টিপে পরখ করল। তারপর ওর মাথাটি বুকের উপর চেপে ধরে চোখ বন্ধ করল।

BanglaBook.org

সমস্ত ঘটনাটি আমার কাছে অবিশ্বাস্য আর অভাবনীয়। নুরজাহান যে মা, সে যে এমনভাবে ভালোবাসতে পারে এটা কল্পনাতেও কোনোদিন আমি ভেবে দেখিনি।

এই পাপপঙ্কে পাপের বোঝা মাথায় নিয়েই নুরজাহান এসেছে। অপরাধ আর ধূলিবালির এই কুৎসিত পরিবেশে ওকে নানা মূর্তিতে দেখেছি। আদালতের আসামি, বাড়িওয়ালির বহিনঝি, স্তাবকের কদর্য প্রশস্তিতে নেশাতুর নুরজাহান। স্বামীপরিত্যক্তা, স্খলিতজীবনা নুরজাহানের তীক্ষ্ণ মর্যাদাবোধ। যেদিন ওকে তরল আনন্দের জীবন প্রত্যাখ্যান করে আত্মশুদ্ধির প্রেরণা জোগায়—সেদিনও ওকে দেখেছি। কৌতূহল বোধ করেছি। একটি বিচিত্র জীবনের পরস্পরবিরোধী আর বিচিত্রতর অনুভূতির পরিচয় পেয়ে চমকপ্রদ কৌতুক অনুভব করেছি। কিন্তু আজ স্তম্ভিত হয়েছি ওর মহৎ সৌন্দর্য দেখে। মাতৃহৃদয়ের যে-বিপুল সৌন্দর্য লুকিয়ে ছিল ওর স্বৈরিণী মন আর দেহসৌষ্ঠবের আড়ালে তার ক্ষণিক দীপ্তিতে এই অন্ধকার গহ্বরও আলোর ছটায় চমকে উঠেছে। নিশ্বাস বন্ধ করে নুরজাহান আর টুলুর দিকে আমি চেয়ে রইলাম। দেখলাম সব সময় ঘ্যানঘ্যান-করা দারোগাও নিষ্পলক নয়নে অভিভূতের মতো এই অপূর্ব দৃশ্যটি দেখছে। সিপাহি ছাদের দিকে হাঁ করে যেন কোনো মঙ্গলদেবতার অদৃশ্য আবির্ভাবকে সবিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করছে।

'এখনই আসছি' বলে ওর স্বামী টুলুকে নিয়ে যখন বেরিয়ে গেল তখন নুরজাহানের চোখের কোনায় জলের ফোঁটা চিকচিক করছে। এই প্রথম ওকে কাঁদতে দেখলাম।

ওর হরিণচোখের চটুল চাহনির সাথেই এ-দেয়ালগুলো অভ্যস্ত। ক্বচিৎ উজ্জ্বল মণির অগ্নি-আভায় চমকে উঠেছে বন্ধ অঙ্গন, যখন নুরজাহান প্রত্যাখ্যান করেছে তরল জীবনের মদির পাত্র। কিন্তু আজ ওর হরিণচোখে কাজলমেঘের ছায়া। বর্ষণব্যাকুল আকাশের মতোই সে-চোখ সজল। আনন্দের আতিশয্যে অথবা অবসাদে নুরজাহান চোখের উপর হাতটি রেখে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়ল। এই মুহূর্তটুকুকে একান্ত নিজের করে পেতে ওর যেন কোনো ব্যাঘাত না ঘটে তাই আমি চলে গেলাম টানা বারান্দার দরজাটির দিকে যেখান থেকে ওকে দেখা যায় না। দেহপসারিনি বিপণির মালিকা সান্ত্রির হাতে শিরোপাস্বরূপ একটি টাকা গুঁজে দিল। কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টায় বিপুলা শরীরখানি নিয়ে ক্ষুদ্র দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার আগে সেই লোভাতুর হাসিটি পুনর্বার ছড়িয়ে গেল। বাইরে তখন ফেরার হাজতিদের নিয়ে গাড়ি বোঝাই করা হচ্ছে। এক দুই তিন গুনে গুনে মুরগির মতো খাঁচার মধ্যে পোরা হচ্ছে এই আদমসন্তানদের। মুখখোলা বোরখা পরা একটি মেয়ে ব্যাকুল উদ্বেগে একবার দরজার দিকে, একবার গাড়ির মুখে ঘুরঘুর করছে। সারাটি দিন ওকে বসে থাকতে দেখেছি ব্যারাকের দূর কোনায় কীসের ব্যগ্র প্রতীক্ষায়।

BanglaBook.org

এক নজর খালি দেইখবার দ্যান, কথা কইমু না। খালি দেখমু।

উত্তরদেশীয় সান্ত্রি তার কথা বুঝেছে কি না কে জানে? কিন্তু উত্তর দিয়েছে, হুকুম নেহি হ্যায়; দারোগাসাহেব নাচার; আইন নেই। দেখা করতে পারে যদি হাকিমের হুকুম নিয়ে আসে। তবু মেয়েটি বসে থেকেছে।

এক নজর দেখতে চেয়ে ধমক খেয়েছে, গালি খেয়েছে। সারাদিন এমনি করেই কেটেছে।

অবরুদ্ধ অভিমানে ভেঙে এল মেয়েটির কণ্ঠস্বর। ছলছল চোখে বসে পড়লে দরজার গোড়ায় যেখানে কয়েদিগাড়ির পেছনের সিঁড়িটা এসে মিশেছে। নারীত্বের সমস্ত অভিমান বিস্মৃত হয়ে সে দারোগাসাহেবের হাত দুটো জড়িয়ে ধরে। যেন পাষাণ বিধাতার পায়ে মাথা কুটতে থাকে মেয়েটি। কতগুলো অশ্রাব্য বিশেষণ উচ্চারণ করে দারোগাসাহেব বেরিয়ে গেলেন।

যা যা, ভিড় বাড়াইস না। আমার চাকরিটা খাইবি নাকি?

তবু নাছোড়বান্দা মেয়েটি। বসে রইলে কবাট আগলে। তার গা-ঘেঁষে সান্ত্রির ডাকে সাড়া দিতে দিতে আসামিরা গাড়িতে চড়ছে। একটি বেঁটেবুটে লোক এগিয়ে এসে লাইন থেকে একটু সড়কে এল। মেয়েটি কয়েকটি বিড়ি আর এক খিলি পান ওর হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, তুমি চিন্তা করবা না। মোক্তারসাবের লগে আমি দেহা করছি।

পেছন থেকে লাইনের চাপ পড়ছে। দুটো বাক্যবিনিময়ের সময় নেই। শুধু একটি দৃষ্টি। মুহূর্তের জন্য একটুখানি ছোঁয়া। একটি বা দুটি ছোট্ট কথা। সারাদিন ব্যাকুল প্রতীক্ষার পর ক্ষণিক নজর বুলিয়ে নেয় বন্দি প্রিয়তমের মুখের উপর। আর একটু আশ্বাস দেওয়া তা যতই মিথ্যে হোক। হয়তো এই একটি মুহূর্তের জন্য আয়োজন চলেছে সারা মাস ধরে। হয়তো তার চেয়েও বেশি। সান্ত্রি হুঙ্কার ছাড়ল—এই হটো।

শেষবারের মতো মেয়েটি পূর্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখল ওর আপাদমস্তক। আকাশের নীল প্রশান্তি আর পৃথিবীর সমস্ত ভালোবাসা সে-দৃষ্টির সাথে ঝরে পড়ছে প্রিয়তমের উদ্দেশে। নির্ভয় আশ্বাসের মতো একটি মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠল মেয়েটির ঠোঁটের কোণে।

প্রচণ্ড শব্দ করে গাড়ির কাঠের দরজাটি বন্ধ হয়ে গেল। তালা পড়ল, বন্দুকধারী দুটি সিপাই দরজার পাদানিতে উঠে দাঁড়াল। ভেতর থেকে লোকটি চেঁচিয়ে বলল, তারিখ পড়ছে সামনের মাসে। তুমি আইসো। নিষ্পলক নয়নে মেয়েটি চেয়ে রইল যতক্ষণ না গাড়িটি অদৃশ্য হয়ে গেল দৃষ্টির বাইরে। তারপর একটি শান্ত নিশ্বাস টেনে চলে গেল নিজের বস্তির উদ্দেশে।

সামনের মাসের কোনো-একদিন আবার আসবে মেয়েটি। দেয়ালঘেরা এই ত্রিকক্ষের চারপাশে সারাদিন ঘুরঘুর করবে। হয়তো এক নজর স্বামীর মুখটি দেখতে পাবে। হয়তো পাবে না। ব্যর্থ প্রতীক্ষায় বেলাশেষে ফিরে যাবে পরবর্তী

BanglaBook.org

মাসের আর-একটি তারিখ মনে গেঁথে রেখে। এমনিভাবে মাস-বছর কাটিয়ে হয়তো সে ক্লান্ত হয়ে পড়বে। আর আসবে না। হয়তো জীবনের তাগিদে নতুন সাথি খুঁজবে সে। অথবা লোকটিই আর ফিরে আসবে না কোনোদিন ওর উষ্ণ শয্যাপার্শ্বে।

ময়ূরের মতো একটি কর্কশ কণ্ঠে উচ্চকিত হয়ে দরজার পাশে সরে এলাম। স্ফীতোদরা অনাবৃতনাভি বাড়িওয়ালি। সাদাকালো দাঁতের কুৎসিত হাসি একবার দারোগার দিকে একবার নুরজাহানের দিকে নিক্ষেপ করে এগিয়ে এল। মিষ্টির চাঙারিটা নুরজাহানের হাতে দিয়ে বলল, বহুত কষ্ট করছস, এইবার আইস্যা পড়। তর সায়েব আইছিল আমার ডেরায়। নয়া বাড়ি করছে। হেইখানে গিয়া থাকবি। হুনছস?

একটি পূর্ণ উদ্ভাসিত হাসিতে নুরজাহান অভ্যর্থনা জানাল তার দেহবিপণির প্রাক্তন স্বত্বাধিকারিণীকে। হুঁ, আসমু।

আমার লগে উনার কথা অইছে।

বাড়িওয়ালির মুখে খবর পাওয়া গেল ৫৪ ধারার মামলাটি হাকিম ডিশমিশ করে দিয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল আচরণের যে মামলা দায়ের হয়েছিল তাও পুলিশ তুলে নিয়েছে। অভিযোগের সপক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ নাকি পাওয়া যায়নি। তৃতীয় মামলাটি একটু সঙ্গিন। বিষপ্রয়োগে হত্যাচেষ্টার অভিযোগ। বাড়িওয়ালি জানালে এতেও নুরজাহানকে ফাঁসানো যাবে না। হুল্লোড়ের মধ্যে কে কাকে বিষ খাইয়েছে হলফ করে কে বলবে? কোর্ট রাজি হয়েছে জামিন দিতে। নুরজাহানের স্বামী উকিল নিয়ে উপস্থিত ছিল কোর্টে। কিন্তু হাকিম এজলাস বন্ধ করে দেওয়ায় জামিনের দরখাস্ত আজ আর পেশ করা গেল না। সামনের দিন পেশ হবে। জামিন হয়ে যাবে। এখন নুরজাহানের সুমতি হলেই হল।

আজকা জামিন না অইয়া ভালোই অইল।

ইনজেকশন বাকি ছিল একডা, হেইডা অইয়া যাইব। খালাম্মা ব্যারামডা এইবার সাইর‍্যাই গেছে। সুমতি যে তার হয়েছে সেটা স্পষ্ট।

হ হ, হেইড্যা তর ছিরি দেইখ্যাই বুঝছি...যৌবনের বয়স ফুর্তিটুর্তি কইর‍্যা লইলি। এইবার সোয়ামির সংসারের মধু খাইবি ঠ্যাঙ্গের পর ঠ্যাং তুইল্যা—মাংসে ঢাকা খরগোশের চোখের মতো কুতকুতে চোখগুলো প্রায় বুজে নিয়ে বলল বাড়িওয়ালি খালাম্মা। তারপর চোখের ভ্রূজোড়া অনেক কষ্টে আলগা করে একটি লোভাতুর দৃষ্টির লেহনিতে নুরজাহানের আপাদমস্তক বুলিয়ে নিয়ে আসল কথাটি পাড়ল—আমারে ভুলবি না তো?

সপ্রতিভ নুরজাহান বিনীত লজ্জায় ওর হাতটি নিজের দুহাতে তুলে নিয়ে বলল, ছি খালাম্মা! তুমি তো আমার মায়ের তুল্য।

নুরজাহানের চিবুকে দুআঙুলের একটি আদুরে স্পর্শ লেপে দিয় বাড়িওয়ালি খালাম্মা খুশির লহরে মৃদু মৃদু কাঁপিয়ে তুলল চর্বিজমা বাতস্ফীত দেহখানি।

BanglaBook.org

আমি এগিয়ে এলাম নুরজাহানের ঘরের দিকে। ওর যে মতি স্থির হয়েছে সে-খবরটা বোধ হয় ছড়িয়ে পড়েছে। ভঙ্গদলের ভিড়টি দুপুর থেকেই হালকা হতে হতে এখন শূন্যের কোঠায় পৌঁছেছে।

তা হলে স্বামীর বাড়িই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করলে? বেশ খুশি হয়েই বললাম আমি।

ছেলেকে দেখলে আমি সবকিছু ভুলে যাই।

তা হলে ছেলের টানেই স্বামীর ঘরে যাচ্ছ?

হুঁ। কিছুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলল, কিন্তু ছেলেটার কী গতি হবে? তাই ভাবছি। দুশ্চিন্তার কুঞ্চনরেখা ওর কপালে।

কেন?

ওকে রাখব কোথায়?

সে কেমন কথা; তোমাদের সাথেই থাকবে।

সে যে পরের ছেলে একথাটা তো আমি আর গোপন রাখতে পারি না।

এতদিন গোপন রেখেছ কেন?

ছেলের ভবিষ্যতের কথা ভেবে।

তবে এখনও গোপন রাখো। কিছু না-ভেবেই ওকে পরামর্শটা দিলাম।

তা কি কখনও হয়?

তবে নাহয় বলেই ফেলো। সবকিছু স্বীকার করে নিয়ো স্বামীর কাছে।

তাতে কি সংসার টিকবে?

সমস্যাটা নিঃসন্দেহে জটিল। তবু বললাম, ছেলেকে সাথেই রেখো।

স্বামী যখন তোমাকে ফিরিয়েই নিচ্ছে তখন অতটুকু উদারতা নিশ্চয় দেখাতে পারবে।

আপনি হলেও পারতেন না। কোনো স্বামীই পরের সন্তানকে সইতে পারে না। হয়তো তা-ই নুরজাহানের অভিজ্ঞতা। চুপ করে গেলাম।

আমার নথিপত্রগুলো এসে গিয়েছে। গাড়িও প্রস্তুত। আবার যথানিয়মে হাজিরা দিতে হবে পনেরো দিন পর।

জমাদারনি আজও ঝগড়া বাধাবে। শুধুশুধু তার দেরি করানো হচ্ছে। নুরজাহানকে নিয়ে সে আমাদের গাড়িতেই যাবে।

কিন্তু আইন অলঙ্ঘনীয়। আইন হচ্ছে আমি যখন গাড়িতে চড়ব তখন চালক আর আমার পার্শ্বচর (যারা সব সময় পাশে পাশে চলে) ছাড়া আর কেউ তাতে চড়তে পারবে না। জমাদারনি এই অদ্ভুত নিয়মের যুক্তি খুঁজে পায় না। আমি যাব ড্রাইভারের পাশে বসে। সে যাবে কাঠের পার্টিশান দিয়ে পৃথক করা পেছনের বেঞ্চিতে বসে। এতে ক্ষতিই-বা কী আর অসুবিধাই-বা কী? হাজতরক্ষকের চাকরির ভয় আছে। অতএব নুরজাহানকে পরের দফার জন্য অপেক্ষা করতেই হবে।

BanglaBook.org

গভীর প্রীতি ও সমবেদনায় মেয়েটিকে নতুন চোখে দেখলাম। করিমের ফাঁসি যে-কারণেই হোক, মনেপ্রাণে কামনা করলাম, তার অভিশাপ যেন নুরজাহানকে স্পর্শ না করে। যেন তার নতুন জীবন অতীতের গ্লানিকর স্মৃতির পীড়ন থেকে মুক্ত থাকে। এতদিনে সত্যি সত্যি যেন তার হৃদয়ের উৎসব শুরু হল।

বললাম, সুখে থেকো। সুখে ঘরসংসার কোরো।

নুরজাহান মণিশুভ্র দাঁতের আলো-ছড়ানো উজ্জ্বল হাসিতে নিষ্পাপ জীবনের প্রতিশ্রুতি জনিয়ে আমায় বিদায় দিল। গারদের ফাঁক দিয়ে একটি হাত বের করে সালাম জানাল।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বললাম, আবার যেন তোমার সাথে এখানে দেখা না হয়।

এরপর নুরজাহানকে মনে রাখার কথা নয়। ক্লেদগ্লানির পূতিগন্ধ এখানে যাদের টেনে আনে তাদের অনেকের সাথেই ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে গেছি। অনেককে শুধু দেখে গিয়েছি দিনের পর দিন আরশিতে-পড়া প্রতিচ্ছবির মতো। আরও অনেকের সাথে সমান ভাগে ভাগ করে নিয়েছি পল্লিজীবনের সুখ-দুঃখ, অনুভব করেছি আত্মীয়তার টান। এই নিষ্করুণ পৃথিবীর মতো উষ্ণস্পর্শে প্রাণের সন্ধান পেয়েছি। কত ধূসর মুহূর্ত সাথিত্বের আনন্দে সজীব হয়ে উঠেছে। আমার দীর্ঘ কারাবাসে এদের সান্নিধ্য যদি না পেতাম তা হলে মানুষকে ভুলে যেতাম না কি? তবু কতজনকে মনে রাখতে পেরেছি? যাদের সাথে দিনের পর দিন একটি বিড়ি ভাগ করে টেনেছি, এক টুকরো রুটি ভাগ করে খেয়েছি তাদের অনেকেই তো আজ তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতল তলে। যে-মহাস্রোতের টানে আমি ভেসে চলেছি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকবার উপায় নেই। কাউকে, কোনোকিছুকে অবিনশ্বর চিরস্থায়ী বলে আঁকড়ে থাকবার পথ নেই। সেই স্রোতে আরও যারা ভেসে চলেছে দুদণ্ড দাঁড়িয়ে তাদের সাথে চারটে সুখদুঃখের কথার বিনিময় করেছি কি করিনি। দিগন্তপ্রবাহের টানে আবার ছিটকে পড়েছি। নুরজাহান কূল পেয়েছে এই ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম। অনেক দুঃখবেদনার পর সে হয়তো সুখের সংসার গড়ে তুলেছে। যাদের সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় তাদের ভুলতে সময় লাগে না। সেই ধূলিধূসর হাজত-প্রাঙ্গণে বিদায় নেওয়ার পর নুরজাহানকেও ভুলে যেতাম। কিন্তু এই কদর্য প্রবাহের টান বোধ হয় অনিরুদ্ধ। তাই নুরজাহান কূল পেয়েও ফিরে এল।

জন্ম নিয়েও যারা জানতে পারে না জীবনের অর্থ কী, যারা স্বাদ নিতে পারে না আঙুরগুচ্ছের, চেনে না ফুল আর কবিতা, এখনও পর্যন্ত পৃথিবীতে হয়তো তাদের সংখ্যাই বেশি। যারা বাঁচে না, কোনোরকমে মৃত্যুকে পরিহার করে চলে, তাদের সাথেই এখানে আমার গড়ে উঠেছে এক ছোট্ট পৃথিবী। অনেকের মধ্যে নুরজাহানও ছিল নানা দিনের নানা মুহূর্তের সহচরী। যেখানে আলোর স্পর্শে ফুলের বুকে শিহরন জাগে না, যেখানে গানের কলিরা কানে-কানে গুঞ্জন তোলে

BanglaBook.org

না, সেখানে মানবীয় সম্পর্কের অবকাশ কোথায়? তবু মানুষে-মানুষে একটি সহজাত সম্পর্ক গড়ে ওঠে; ভেসে চলতে চলতে তরল আনন্দে নুরজাহান হয়তো নেহাত ঘটনাচক্রেই এখানে এসে পড়েছিল। আর আমার আগমনটা জবরদস্তি। এ-দুয়ের মধ্যে পাহাড়-প্রমাণ বৈসাদৃশ্য। কিন্তু আমি যেমন এই জবরদস্তিকে ঘৃণা করি তেমনি যারা স্খলিত, অধঃপতিত, যারা বিচারের চোখে পাপী, তারাও এই গারদগুলোকে ঘৃণা করে। এক মুহূর্ত এখানে টিকতে চায় না। সুস্থ স্বাভাবিক আর সাহসী মানুষগুলোকে এখানে এসে ভয়ে চুপসে যেতে দেখেছি, তারা ভয় করে এই নিষ্করুণ গারদঠাসা জীবনকে। তাদের আমি ডুকরে ডুকরে কাঁদতে দেখেছি। পাথরের মতো শক্ত কলিজাওয়ালা যেসমস্ত লোক, যারা ঠান্ডা মাথায় জোড়া খুনের অপরাধে অরপাধী, তাদেরকেও অসহায় শিশুর মতো গড়াগড়ি খেতে দেখেছি। এমনকি উন্মাদ আর স্বভাব-অপরাধীও দেখেছি এই শৃঙ্খল সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না।

নুরজাহান এই নিয়মের এক অত্যাশ্চর্য ব্যতিক্রম। পরমতম বিস্ময়ে যেদিন নুরজাহানের আরজিটা লিখে দিয়েছিলাম সেদিন ভাবতে পারিনি সুনীতি বা দুর্নীতির প্রশ্ন তার মনকেও আলোড়িত করে। কী গভীর বেদনায় সে স্বাধীনতা পেয়েও গ্রহণ করতে নারাজ তার পরিমাপ করার প্রয়োজন বোধ করিনি। যে-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি অসহ্য প্রতীক্ষায় দিন গুনছি, নুরজাহান সে-শৃঙ্খল স্বেচ্ছায় পরে নিল এতে অবাক হয়েছি; কিন্তু চিন্তিতবোধ করার কারণ খুঁজে পাইনি।

একটি নিরাপদ আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই, সে বেছে নিয়েছিল লৌহফাটকের সেল—এইটুকুই ভেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু এই বাছাই চিরদিনের জন্য পাকাপাকি করে নেওয়ার কথা সেদিন কি তার মনে ছিল? সে কি স্থির সিদ্ধান্ত করে নিয়েছিল—গারদের নিরাপত্তাই তার বাকি জীবনের কাম্য? সেই কামনাই কি তাকে চরম দণ্ড গ্রহণের জন্য প্ররোচিত করেছিল? অথবা তার নীতিবোধ? স্বৈরিণী-জীবনের স্ব-আরোপিত মূল্য? কিংবা পালিয়ে বাঁচবার একটি দুর্বল প্রচেষ্টা?

নাওয়াখাওয়ার মতোই আমার যাতায়াতটা চলছিল নিয়মিত ব্যবধানে। বিরক্তি থাকলেও এর মধ্যে রয়েছে ক্ষণিক বৈচিত্র্যের আনন্দ। নাজিমুদ্দিন রোড থেকে কখনও বংশাল রাস্তা ধরে নবাবপুর, কখনও-বা জিন্নাহ অ্যাভিনিউ ঘুরে রথখোলা—এর মধ্যে অনেক কিছুই নতুন। কত নতুন অপরিচিত মুখ, কত কাজের কত তাড়া। বিবর্ণ ধূসরতা আর ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে ওঠে তখন এই সামান্য ভ্রমটুকুই রঙের বৈচিত্র্যে আর মুক্ত বায়ুর আস্বদে এক অপূর্ব মধুরতার সন্ধান দিয়ে যেত। দৃশ্য আর অদৃশ্য প্রাচীরের সীমানা-টানা পৃথিবীর বাইরে এসে হঠাৎ দিগন্তখোলা আকাশের নিচে খুঁজে পেতাম ধূলিকাদায় মেশানো জীবনের প্রগাঢ় উষ্ণতা। তাই ভালো লাগত এই আসা-যাওয়াটা; সিপাহি-পেয়াদাদের অহেতুক কুচকাওয়াজ আর গ্লানিকর হাইহাঁক সত্ত্বেও।

BanglaBook.org

পা রেখেই চমকে উঠলাম। এত পরিচিত জায়গাটাও আজ কেমন অপরিচিত মনে হচ্ছে। কোর্ট-ব্যারাকের সম্মুখের ময়লা-ছড়ানো খোলা জায়গাটুকু সাক্ষাৎপ্রার্থীদের জটলাতে প্রায়ই জমজমাট থাকত। গাড়ি থেকে নেমে দেখলাম দু-চারজন পাহারারত সান্ত্রি ছাড়া মাঠটুকু সম্পূর্ণ ফাঁকা। তার পরই ব্যারাকের বারান্দা, সেই বারান্দা পেরিয়ে ঢুকতে হয় হাজতে। বারান্দায় বরাবরই অপেক্ষাকৃত ভদ্র বেশধারী আর সৌভাগ্যবান বহিরাগতদের বসবার বা দাঁড়িয়ে থাকার ব্যবস্থা ছিল। আজ সেখানে ভাঙা কাঠের বাক্সের উপর বসা সাদা পোশাকের একটি লোক ছাড়া আর কোনো দ্বিতীয় প্রাণী নেই। গায়ের জামা আর পায়ের জুতো দেখে বুঝে নিলাম ইনি বাইরের লোক নন, ডিউটি দিচ্ছেন।

অসংখ্য নরনারীর ইতর গালাগালি, চিৎকার আর কিলঘুসির অবাধ বিনিময়—এভাবেই জায়গাটি দেখে এসেছি। নির্জনতা অথবা শান্ত পদক্ষেপ ওখানে যেমন অপরিচিত তেমনি বেমানান। আশ্চর্য হলাম। অনভ্যস্ত আবহাওয়ায় সংকুচিত বোধ করলাম। পরিচিত গেট-সান্ত্রি আজ হাসি দিয়ে অভ্যর্থনা করল না। আমার আলাপ-জমানো অভিবাদনের জবাবে শুধু ইঙ্গিতে দেখিয়ে দিল বসার টুলখানি। ডিউটির অতিরিক্ত কড়াকড়ি চলছে।

খাঁচার ভেতরটাও কেমন যেন অস্বস্তিকর ভূতুরে নীরবতায় ডুবে আছে। ৩০০ ফুট পরিমিত খোপরায তিনটি তালাবদ্ধ, সেখানে একটি প্রাণী যেন কোনো নিষ্ঠুর অভিশাপে কথা বলার ক্ষমতা হারিয়েছে।

এতগুলো লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দও যেন কোনো জাদুমন্ত্রে বিলীন হয়ে গিয়েছে। গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে-বসে থাকার তকলিফ আছে। তার প্রকাশ আছে সরব প্রতিবাদে। আজ তাও অনুপস্থিত। দারোগাসাহেব চলাফেরা করছেন অত্যন্ত সাবধানী পদক্ষেপে। কী এক মহাপ্রলয়ের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি যেন মানবতরীর হাল ধরেছেন।

আলোহীন বায়ুহীন তালাবদ্ধ অন্ধকার ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে শঙ্কিত মানুষগুলোকে আগলে। দুপুরবেলায় আকাশের নিচে এমন অনাত্মীয় পরিবেশ আমি আর কোনোদিন দেখিনি।

ক্বচিৎ সান্ত্রির হুঁশিয়ারি ভেসে আসছে। কোমরে দড়িবাঁধা আসামিদের পাল তাড়া করে আনবার বা নেবার সময় সামান্য একটু চাঞ্চল্য। শিকলের ঝনঝনি, হাতকড়ার ধাতব কান্না আর তালাচাবির নির্দয় আচরণ। কয়েক জোড়া আরক্ত চক্ষু ভেসে বেড়াচ্ছে...সদ্য মাজাঘষা একটি ইস্পাতের ফলা চকচক করছে...বদ্ধ হাওয়ায় কঠোর শাসানি...এতটুকু শব্দ করা চলবে না...গোলমাল চলবে না।

কিন্তু চরমতম বিস্ময় তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। দুঃস্বপ্নেও যা কল্পনা করা যায় না সেই মহাদুর্যোগ যখন অকস্মাৎ মাথার উপর ভেঙে পড়ে, তখন বিস্ময়বিমূঢ় অবস্থাটা হয়তো বর্ণনার অতীত। স্তব্ধ বিস্ময়ে দেখলাম জেনানা ঘরের মেঝেতে নুরজাহান শুয়ে রয়েছে। কথা বলতে গেলাম।

BanglaBook.org

পেলাম। আমার ডাকটা ওর কানে পৌঁছেছে কি না বুঝবার আগেই বন্দুকধারী সান্ত্রি এসে কড়া হুকুম জানিয়ে দিল। কথা বলা বারণ। চলে এলাম। আমার গতিবিধিটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল বাইরের বারান্দায় পাশে হাবিলদারের খাসকামরায়।

আকাশ-পাতাল চিন্তা করেও নুরজাহানের এখানে ফিরে আসার কোনো যুক্তিসহ কারণ ভাবতে পারলাম না। স্বামীর সাথে ঝগড়া করেছে?

তা-ই যদি হবে তো এখানে আসবে কেন? পুনরায় অতীত অভ্যাসে ফিরে গিয়ে নতুন কোনো অপরাধ করেছে? প্রশ্নটা মনে উঠলেও বিশ্বাসের উপযুক্ত ভিত্তি খুঁজে পেলাম না নিজের মনের মধ্যে। নুরজাহান সে-জীবনকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে এই ধারণাটা আমার বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিল।

তবে কি সে স্বামীকে কিছু করেছে? খুন, জখম, বিষপ্রয়োগের চেষ্টা বা ঐ ধরনের কিছু? হতেও পারে। জীবনের বিরুদ্ধে, সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে তার যে-অভিমান তা-ই হয়তো প্রতিহিংসার আকারে প্রকাশ পেয়েছে। সন্দেহটা মনের কোণে উঁকি মারতেই কেমন যেন বিশ্বাস্য আর স্বাভাবিক বলে মনে হল। ওর ঘরের দিকে আবার এগিয়ে গেলাম। কিন্তু দরজা পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই আইন-প্রিয় সান্ত্রির অনুনয়ে ফিরে আসতে হল।

অপরাধ যা-ই হোক, সেটা যে বেশ গুরুতর এবং মারাত্মক তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। আজকের এই বিশেষ ডিউটির ব্যবস্থা, এত কড়াকড়ি সবই নুরজাহানের জন্য। দায়রা আদালতে তার বিচার হচ্ছে। লোকজনকে তার কাছে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না।

কীসের বিচার? কী তার অপরাধ? আজই রায়দানের তারিখ, রায় বের হল।

জুরিদের সাথে একমত হয়ে দায়রা হাকিম নুরজাহানকে জোড়াখুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড দান করলেন।

পৃথিবী অপরিবর্তনীয় বেগেই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। অদূরে কাছারি-প্রাঙ্গণ থেকে রোজকার মতোই মানুষের কোলাহল ভেসে আসছে। গ্রামআগত কৃষকরা ছাতা-বগলে কালো কোট পরা মামলাজীবীদের পেছনে দল বেঁধে ধরনা দিয়ে চলেছে।

গুরুগম্ভীর ক্লান্ত হাকিমরা নিজ নিজ এজলাসে বিরতি দিয়ে মধ্যাহ্নভোজনে খাসকামরায় প্রবেশ করেছেন। অভিব্যক্তিহীন মুখ, উত্তরদেশীয় সান্ত্রি অবিচল নিষ্ঠায় পাহারা দিয়ে চলেছে খুনি ডাকাতদের। সেই মুখখোলা বোরখাপরা মেয়েটি আজ আবার এসেছে কুম্ভিপাতায় মোড়া একটি 'অমৃতি' হাতে।

চতুস্পার্শ্বের পৃথিবীতে কোথাও কোনো পরিবর্তন হয়নি। নিত্যকার কর্মপ্রবাহে কোনো ছেদ পড়েনি। একটি ছিন্নমূল নারীর জীবনে পরমতম দুর্যোগের যে-কালো ছায়া নেমে এল তা মিলিয়ে গেল দিনের আলোতে, তার উজ্জ্বলতাকে কিছুমাত্র ম্লান না করে। নুরজাহান এখানকার নিত্যকার ঘটনা।

BanglaBook.org

মুখের অনেকগুলো মিষ্টি কথা আর কয়েকটা সিগারেট খরচ করে ভেতরে ঢুকবার ব্যবস্থাটা অবশেষে করে নিলাম। লোহার দরজা ডবল বেড়ির উপর আড়াই সের ওজনি তালা দিয়ে আটকানো। গবাক্ষবিহীন সেলের অন্ধকার কোণে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে রয়েছে নুরজাহান। ওর মুখটা দেখতে পেলাম না। আধভাঙা বাহুটি চোখের উপর ন্যস্ত। সেই দূর কোণে যেখানে আলো-আঁধারিতে ওর দেহটি অস্পষ্টভাবে মিশে রয়েছে সিমেন্ট আর ধূলিশীতল শয্যায়, সেখান থেকে পুরীষ গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে ঘরময়। কত দিনের পেচ্ছাব, ময়লা জমে রয়েছে কে জানে? অ-বেদন মনের চরম নিস্পৃহার মধ্যেও এ-দুর্গন্ধ অসহ্য। সুদীর্ঘ কালের নিত্য পরিচিতি সত্ত্বেও এ-দুর্গন্ধে এখনও আমার বমি আসে। বিলাসিনী নুরজাহান কেমন করে এরই মাঝে নির্বিকল্প শয্যা নিয়েছে ভেবে অবাক হলাম।

ডাকলাম।

কোনো সাড়া এল না পুরীষ-অধ্যুষিত গহ্বর থেকে। এবার গলাটা একটু উঁচুতে তুলে ডাক দিলাম। অচঞ্চল দেহটি একটু নড়ে উঠল। আঁচলটা বুকে গলায় জড়িয়ে নিয়ে নুরজাহান ওঠে এল। তূরীয় শান্তিতে অকারণ বাধায় বিরক্ত হয়েছে এমন ভঙ্গিতে শিকে হাত রেখে দাঁড়াল। নাকের পাতাটা বারবার কুঞ্চিত হয়ে বিরক্তিটা প্রকাশ করল।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে আমি লক্ষ করলাম ওর নিষ্কম্প দেহ আর নিরুদ্বেগ মুখের এই একটিমাত্র অভিব্যক্তি। জীবনমেয়াদ কারাদণ্ডে দণ্ডিত যে-সমস্ত নর-নারীকে আমি দেখেছি তাদের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু দু-একটি অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম ছাড়া সর্বক্ষেত্রেই দেখেছি নিয়তির দরবারে অসহায় চোখের করুণ ফরিয়াদ। ভীতিপ্রকম্প দেহে স্নায়ুতন্ত্রের দুর্বল সঞ্চারণ। কোনো অবলম্বনকে আঁকড়ে না ধরে বাঁচার অভিলাষ। অন্তিম মুহূর্তেও জীবনের প্রতি মানবীয় দুর্বলতা। পরিচিত পৃথিবীর সাথে বিচ্ছেদবেদনায় কাতর।

মৃত্যুর চেয়েও ভয়ংকর অপরিচিত জগতের নিষ্ঠুর আমন্ত্রণে সংবিৎহারা। নুরজাহানের মুখে লক্ষণগুলোর একটিও আবিষ্কার করতে পারলাম না। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। ওর হরিণচোখ, রসপুষ্ট ঠোঁট, ভারী আর ভরাট চিবুক, পাতা-সবুজ মুখ। উদ্বেগ নেই। শঙ্কা নেই। অদৃষ্টের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে নৈসর্গিক কোনো আনন্দলাভের কষ্টকর প্রচেষ্টাও দেখলাম না। যেন কোথাও কিছু হয়নি, ভূমণ্ডলের ঘটনাপ্রবাহ যেন ওরই অকম্পিত পথে চলেছে।

ওকে ডেকে নিজেই অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। কী বলব, কোথা থেকে শুরু করব? ওর অনির্বেদ নির্লিপ্ততার মুখে আমার কথার উৎস শুকিয়ে নৈরাশ্যহীন হয়ে গেল। নীরবতা ভাঙবার উদ্যোগটা ওর কাছ থেকেই এল : আজ এত কড়াকড়ি কীসের?

নুরজাহানের মুখ থেকে প্রশ্নটা অপ্রত্যাশিত। যাকে নিয়ে এত নিয়মের কড়াকড়ি সেই কিনা জিজ্ঞেস করে, কেন? বললাম, তোমার সুবিচার নির্বিঘ্ন করার জন্য।

BanglaBook.org

একটি শুষ্ক হাসির ক্ষীণ প্রচেষ্টায় মুখটাকে বিকৃত করল নুরজাহান। সেই মুক্তোঝরা হাসি সুদূর কালাপানির দেশে নির্বাসিত হয়েছে বুঝি। হাজতবাসীদের গুমোট আবহাওয়াটাকে ও যে-হাসি দিয়ে উৎফুল্ল করে রাখত, তার বেদনা আজ করুণ প্রহসনের মতো চোখে ঠেকল। নির্বান্ধব মেয়েটির একমাত্র সহচরীও আজ ওকে পরিত্যাগ করেছে। কিন্তু হাসিকান্নার মাঝামাঝি এই বিষণ্ণ ঔদাসীন্য ওকে যেন আরও সুন্দর, আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। ওর বিষণ্ণ দেহকে ঘিরে রয়েছে কী এক শান্তিসৌরভ। কোনো-এক অজ্ঞান মহিমায় সে যেন পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা, নীচতার অনেক ঊর্ধ্বে পৌঁছে গিয়েছে। এই নিঃসঙ্গিনী নারীর উদ্দেশে আমার মনের নিগূঢ়তম শ্রদ্ধা নিবেদন না করে পারলাম না।

নিজের পেটের ছেলেকে শেষ পর্যন্ত নিজের হাতেই খুন করলে? অজান্তেই প্রশ্নটি বেরিয়ে এল আমার মুখ দিয়ে।

উপায় ছিল না। আমার পাপের সাক্ষী। যতদিন সে বেঁচে ছিল মুহূর্তে মুহূর্তে তুষের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরেছি।

আর স্বামীটি?

তার যোগ্য শাস্তিই সে পেয়েছে।

এমন নিষ্ঠুর প্রতিশোধ নিলে?

প্রতিশোধ...? আহত দৃষ্টিটা আমার দিকে তুলে বলল, ছেলের লোভ দেখিয়ে সে আমায় নিয়ে গিয়েছিল সংসার করতে নয়, তার জেদ বজায় রাখতে।

কীরকম?

আমি তার ঘর ত্যাগ করে এসেছি সেখানেই ফিরে গেলাম—এ তো তার জয়।

স্বামীর হয়ে স্ত্রী যদি আনন্দ প্রকাশ করে?

তাতেও সে খুশি নয়, অত্যাচারের নতুন নতুন ফন্দি বের করে আমার জীবনটা অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।

সে কি তোমায় মারত?

সে তো দিনে দুবার। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রহরে বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থা হত।

নুরজাহানের কথাগুলো শুনছিলাম আর গায়ে কাঁটা ফুটছিল। প্রশ্ন জাগছিল মনে, কোনটি নৃশংসতর অপরাধ—স্ত্রীহত্যা, না সন্তানহত্যা? কে অধিকতর ঘৃণার পাত্রী—পতিতা, না স্বামীর অত্যাচারে জর্জরিতা বিদ্রোহী নারী।

এই বেদনাদায়ক প্রসঙ্গটির আলোচনায় ওর দুঃখের বোঝা না বাড়িয়ে চুপ করে রইলাম।

বাকি জীবনের শক্ত পৃথিবীর যে-ক্ষুদ্রতম পরিসরটুকু ওর জন্য নির্ধারিত হয়ে গেল সেখানে যে আরও গভীরতর বেদনা রয়েছে সেটা কি নুরজাহান বুঝতে পারছে না?

BanglaBook.org

কেমন করে সে বিশটি বছর ঐ অন্ধকার গর্তে কাটাবে? জীবনের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে চির-নিরানন্দের ঐ পাষাণজগতে সে কেমন করে বাঁচবে? চলিষ্ণু পৃথিবীর সাথে যোগাযোগের ক্ষীণতম সূত্রটিও যেখানে থাকবে না সেখানে কীসের অবলম্বনে নুরজাহান দিন কাটাবে?

হয়তো সে ভাবছে অন্য কথা। এসব মামুলি প্রশ্নে মাথা ঘামানোর কোনো দরকার আছে বলে হয়তো সে মনে করছে না।

হেমন্ত-দুপুরের আকাশের মতো ভাষাহীন নুরজাহানের মুখের দিকে তাকিয়ে কোনো যাবজ্জীবন নির্বাসিতার অনুভূতিকে বুঝবার চেষ্টা বৃথা।

জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে?

মুক্ত আর শান্ত।

বিশ বছরের কয়েদিজীবন কেমন করে কাটাবে?

নিরুদ্বেগ জীবনের সাধনায়।

সাধনায়? তড়িতাঘাতের মতো শব্দটি আমার গায়ে ফোসকা তুলে দিলে।

বাঁচার জন্য এতই তোমার আগ্রহ?

মরার আগে সামান্য খড়কুটোকে আঁকড়ে ধরেও তো মানুষ বাঁচতে চায়!

কিন্তু এ-বাঁচার লক্ষ্য কী? কারাগার থেকে তুমি কি জীবিত বেরিয়ে আসতে পারবে? আর যদি বেরিয়ে আসতে পার তখন তো বুড়িয়ে যাবে। বাঁচার নেশা থাকবে কি তখন?

নিশ্চয়!

আশ্চর্য!

দিন তিন-চারেক পর।

পত্রিকার পাতা উলটাতে গিয়ে একটি বিদেশি খবরের উপর চোখটি বিঁধে রইল। রয়টার সংবাদ দিচ্ছে—হিরোশিমার এক জাপানি পিতা তার সাত বছরের মেয়েটিকে নিজের রিভলবার দিয়ে গুলি করে মেরেছে। মেয়ের রক্তাক্ত মৃতদেহের পাশে পিতার সংজ্ঞাহীন দেহটি আবিষ্কার করেছে পুলিশ।

জবানবন্দিতে সে বলেছে :

হিরোশিমায় যে-বীজাণু আমার মেয়ে বহন করছে তা থেকে আমি বাঁচাতে চাই ভবিষ্যৎ বংশধরদের। যে-যাতনা আমি ভোগ করে চলেছি, সে-যাতনা থেকে আমি মুক্ত করতে চাই আমার মেয়েকে আর তার বংশধরদের।

BanglaBook.org

অনুগল্প

১. কুকুর বনাম বাছুর

বাচ্চা কুকুর আর বাছুরের তর্ক বেধেছে সুখ কাকে বলে? কত দার্শনিক যুক্তি, কত সৌন্দর্যতত্ত্বের চুলচেরা বিচার হল। কিন্তু মীমাংসা হল না।

বাছুর রেগেমেগে বললে বেশ তো তুমিই বলো-না সুখটা কী!

বাচ্চা কুকুর জবাব দিল, আরে তুই সুখের কী বুঝবি? শীতের সকালে গেরস্ত যখন গরম ছাইগুলো ফেলে যায় তখন লেজ গুটিয়ে সেই ছাইয়ের গাদায় শুয়ে থাকার সুখ যে কী অপূর্ব তার তো কোনো ধারণা তোর নেই। তুই তো তখন কুয়াশাঢাকা মাঠে শীতের মাঝে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বেড়াস।

২. খোদা-সন্দর্শন

মগরেবের নামাজশেষে অজিফা পড়ত সেই এশা পর্যন্ত—কিছুই চাই না খোদা, শুধু তোমাকে দেখতে চাই। সেই খাটেই নামাজ তেলাওয়াত, সেই খাটেই শয্যা। তেতলা ঘর।

প্রথম রাতে ঘুমে শুনলে তেতলার উপর মচমচ করে।

পরের রাতে ঘুমে শুনলে...

তৃতীয় রাতে ঘুমে শুনলে...

চতুর্থ রাতে তিনি সজাগ হয়েই জিজ্ঞেস করলেন, এই কে? উত্তর এল, চিনবেন না। পরদিন আল্লার নামে শপথ করে শুল। সেইদিনও একই প্রার্থনা, একই শব্দ—কী কর? উত্তর—আমি গরু-ঘোড়াকে ঘাস খাওয়াই। কী? আমার ঘরের উপর ঘাস খাওয়ায় (সজাগ হয়ে)!

তার পরদিন আবার প্রশ্ন আমার তেতলার উপর গরু খাওয়ায় ঘাস? উত্তর—তেতলার উপর খোদা? তিনি ভাবলেন।

BanglaBook.org

সকালে ছেলেদের ডেকে বললেন—বাবা, বুঝে নাও সব। আমি চললাম। চললেন ছয় মাসের খাদ্য আর সব বিছানাপত্রসহ।

চলতে চলতে দেখলেন এক লোক শুধু কোষে পানি খায়। প্রশ্ন এল মনে, আমি বেরিয়েছি খোদার সন্ধানে আর আমার গ্লাস থালা বাটি? তিনি সব থালা বাটি ছুড়ে ফেলে দিলেন।

চলতে চলতে দেখলেন একটি লোক হাতের শিয়রে মাথা রেখে গাছতলায় ঘুমুচ্ছে। প্রশ্ন এল মনে তার, এই লোকটা দিব্যি ঘুমুচ্ছে, বালিশ নেই, বিছানা নেই আর আমি আল্লার সন্ধানে; আমার এত বড় পোঁটলা? বিছানা-বালিশ দিলেন ছুড়ে।

চলতে চলতে দেখলেন এক পাগলা ন্যাংটা নামাজ পড়ছে। জিজ্ঞেস করলেন, ন্যাংটা নামাজ হয়? সে বললে, আমি পৃথিবীতে আসি ন্যাংটা, সেইজন্য ন্যাংটাভাবেই ডাকি খোদারে। ফেলে দিলেন গায়ের কাপড়।

হুকুম হল—জিব্রাইল যাও, ঐ লোক কী চায়?

জিব্রাইল এল—কী কও? উত্তর আমি চাই খোদাকে দেখতে।

জিব্রাইল ফিরে গেল খোদার কাছে। খোদা বললেন—বর্শা নিয়ে বলো যে তুমিই খোদা।

জিব্রাইল এসে বললেন—আমিই খোদা।

লোকটি বলল—তুমি যদি খোদা হও, আমার আগমন, আমার মনের কথা তুমি বলো।

জিব্রাইল সত্য সত্য ঘটনা বর্ণনা করলে।

তখন বলল—বিশ্বাস করি তুমিই খোদা, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করি তোমাকে কি খোদাই পাঠিয়েছে?

জিব্রাইল স্বীকার করল—খোদা আমাকে পাঠিয়েছে।

না, তুমি বলো আমি তাকেই দেখতে চাই।

জিব্রাইল উত্তর নিয়ে ফিরে এল—না, আদমসন্তান তাকে দেখতে পায় না।

তুমি যাও। বলো, আমি তাকেই দেখতে চাই।

সাতবার একই উত্তর নিয়ে ফিরে এলেন। অষ্টমবারে বললেন, ঠিক আছে। তুমি প্রস্তুত থাকো, খোদা দেখা দেবেন তোমাকে।

সে দেখল, কিন্তু বলে যেতে পারল না আদমসন্তানদের, খোদার সেই নিরাকার রূপ কী। চোখ তার ঝলসে গিয়েছিল এক অপার্থিব আলোতে আর সে সংজ্ঞা হারিয়ে ছিল। জ্ঞান আর সে ফিরে পায়নি।

৩. মামা-ভাগ্নে

বাঘ কিছুই খেতে পায় না।

সে কী ভীষণ খিদে!

BanglaBook.org

বনে-বনে ঘুরে বেড়ায় পথ। শিকার জোটে না। কোনো পশুপক্ষীর সন্ধান মেলে না।

সাত দিন সাত রাত্রি পেরিয়ে যায়। কিছুই পড়ে না পেটে। বেচারা বাঘ বুঝি পাগল হয়ে যায়।

ক্লান্ত হাতপাগুলো টেনে টেনে চলে। চলে আর ভাবে, এবার বুঝি না-খেয়েই মরতে হয়, অথবা ঘাস খেয়ে জাত দিতে হয়।

চলতে চলতে বাঘ বন পেরিয়ে গ্রামের কাছাকাছি এসে পড়ে। বিল আর গ্রামের সীমানায় বিরাট দিঘি। সে-দিঘিরই এক গর্তে শিয়ালের বাড়ি। হঠাৎ বাঘ দেখে, গর্তে অন্ধকার থেকে কড়কড়, মড়মড় শব্দ আসছে। দূর থেকে উঁকি মেরে দেখলে, শিয়াল কড়কড় করে হাড্ডি চিবুচ্ছে।

শিয়াল আগেই জানত বনে দুর্ভিক্ষ চলছে। বাঘ এসে হয়তো একদিন তার ঘাড়ই চেপে ধরবে। তাই শিয়াল আগেভাগেই বুদ্ধি করে মরা গরুছাগলের ঠ্যাং গর্তে জমিয়ে পাকা আশ্রয় নিয়েছিল। বাঘ তো আর গর্তে ঢুকতে পারবে না! দূর থেকে বাঘের গন্ধ পেয়ে বুদ্ধিমান শিয়াল সেই মরা হাড়গুলোই কড়মড় করে চিবুতে শুরু করে।

গর্তের মুখের কাছে একটু এগিয়ে এসে বাঘ বলল—ভাগনে, খাচ্ছ কী?

খাচ্ছি? কী যে বলেন মামা, খাবার কি আর দেশে আছে? শিয়াল ভ্রূ কপালে তুলে রীতিমতো অবাক সুরে বলে।

কিন্তু নিজের কানকে তো আর অবিশ্বাস করতে পারে না বাঘ। জিজ্ঞেস করলে তবে কুড়মুড় শব্দ হচ্ছে কীসের, ভাগনে?

হোহো! শিয়াল তো হেসে কুটিপাটি। অনেকক্ষণ পর হাসি থামিয়ে বলল—মামা তুমি বুঝি না খেয়ে খেয়ে চোখের জ্যোতিটাও হারিয়ে ফেলেছ। দেখছ না নিজের হাত-পাগুলো খাচ্ছি, তুমি তারই শব্দ পাচ্ছ।

হাত-পা খাচ্ছ? বাঘ আঁতকে উঠল।

মামা, খাদ্য যে দেশে নেই তা তো নিজেই দেখতে পাচ্ছ। তাই হাতপাগুলো খেয়ে কোনোরকমে উদর পূর্তি করছি। কিছু খেতে হবে তো? নইলে বাঁচব কেমন করে?

বাঘ এবার থতমত খেয়ে গেল। বলে কী? নিজের হাত-পা খেয়ে বাঁচবে কেমন করে শিয়াল?

শিয়াল বুঝতে পারে বাঘের মনের কথা। বলে—বুঝেছি, তুমি ভাবছ হাত-পা খেলে পঙ্গু হয়ে যাব কি না? আর হো, মামু, তুমি তো এখন বনের বাইরে মনুষ্যজগতের নিয়মকানুন কিছুই জান না, এখন যে আমি হাত-পাগুলো খাচ্ছি, আষাঢ় মাসে মেঘ এলেই ওগুলো আবার গজাতে শুরু করবে আর বৃষ্টি পেলে তো কথাই নাই, হাঁইহাঁই করে বেড়ে যাবে।

BanglaBook.org

বাঘ ভাবল, বুদ্ধিটা তো মন্দ নয়। যেই ভাবা সেই কাজ, বাঘ নিজের এক জোড়া হাত আর এক জোড়া পা তৎক্ষণাৎ খেয়ে ফেলল আর চিরদিনের জন্য ঠুঁটো হয়ে দিঘির পাড়েই পড়ে রইল।

৪. বলদ কেমন করে মানুষ হল?

তিন কুলে বুড়ির নেই কেউ, স্বামীপুত্রকন্যা—কেউ না। স্কুলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনলে বুড়ি, মাস্টার বলছে, 'ধ্যাত বলদ।' আবার শুনলে, 'এই বলদ দাঁড়া।' বুড়ির কেমন খটকা লাগল, তা-ই তো, এই স্কুলে কি বলদ পড়ে? আবার শুনল বুড়ি, মাস্টারের গলা—এই বলদটা, বল বল দেখি? বুড়ি নিশ্চিত হল—এ-স্কুলে বলদের পড়ার ব্যবস্থা আছে।

বুড়ি আস্তে আস্তে ঢুকে পড়লে ভেতরে। মাস্টারের সাথেই দেখা। প্রশ্ন করল—মাস্টারমশায়, আপনি তো সব বলদ পড়ান, তো আমার একটা বলদ আছে, আর কেউ নেই তিন কুলে। ওকে একটু লেখাপড়া শেখাতে চাই। মাস্টার অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, তুমি কেমন করে জান আমি বলদ পড়াই! জাদু, ঐ যে আপনি কেলাসে 'বলদ-বলদ' বলে ডাকছিলেন। মাস্টারের মনে পড়ে গেল একটু আগের তথা, তা-ই তো, এখন বুড়িকে কী বলা যায়!

কিছুক্ষণ ভাবল মাস্টার। তারপর বলল, তুমি ঠিকই শুনেছ, বুড়ি। আমি বলদ মানুষ করি।

বুড়ি তো আহ্লাদে আটখানা, তার বলদ লেখাপড়া শিখে মানুষ হবে। আর এমন ওস্তাদ পাওয়া গেছে।

বাড়ি এসে বুড়ি বলদটা নিয়ে যায় স্কুলে। মাস্টার একটু হতভম্ব হয় কি? কেননা সে ভাবেনি বুড়ি সত্যি সত্যি আস্ত একটা বলদ নিয়ে হাজির হবে। বুড়ি পঞ্চাশটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিল, বাবা, এটা তোমার দক্ষিণা আর ভর্তির খরচ। বাকি পয়সা আমি পরে সংগ্রহ করে পাঠাচ্ছি।

BanglaBook.org

৫. কেক বনাম রুটি

মেরি এন্টোনেয়েটকে যখন তাঁর মন্ত্রীরা এসে বলল, রুটির অভাবে প্রজারা উপবাসে মরছে তখন সরলমনা রানি জবাব দিয়েছিলেন, 'ওরা কেক খায় না কেন? ওদের কেক খেতে বলো।'

মন্ত্রীরা প্রত্যুত্তরে কিছু বলেছিল কি না অথবা কেককে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কোনো প্রচার-অভিযান শুরু করেছিল কি না ইতিহাসে তা লেখা নেই। ইতিহাসে যেটুকু লিখিত আছে সে হল সুন্দরী রানির ভাগ্যবিড়ম্বনার কাহিনি।

ঐতিহাসিকেরা রানিকে খামোখাই দোষ দিয়েছেন। চারুশীলা রানির রুচি ছিল মার্জিত। অন্তত খাদ্যের ব্যাপারে ফরাসি ও প্রাচ্যদেশের উৎকৃষ্টতম

রন্ধনশিল্পের তিনি যে একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন—তার বহু নজির পাওয়া যায়। আর খেতে তিনি বেশ পছন্দ করেন, বাছাই-করা সব ডিশ। তাঁর সেই রাজসিক রুচি আর অভিজাত জ্ঞানগম্যি নিয়ে তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে, রুটির কিছু ক্যালোরিক মূল্য ছাড়া আর কোনো সার পদার্থ নেই। কেক রুটি অপেক্ষা খাদ্য হিসেবে অনেক সুস্বাদু, আর খাদ্যমূল্য যদি বিচার করা যায় তা হলে কেকের সাথে রুটির কোনো তুলনাই হয় না। রুটির মাঝে যে-ক্যালোরি থাকে কেকে তা তো রয়েছেই, উপরন্তু রয়েছে সুগার (চিনি), ফ্যাট (ক্রিম) ডিম প্রভৃতি। কেকে-কেকেও আবার প্রভেদ রয়েছে। যেমন সেমন কেক চারটে পাঁচটে লোক মাথায় বয়ে নেয়, তার মাঝে থাকে কতকিছু, পেস্তা, বাদাম, আখরোট, মালাই ক্রিম, হাজারো সব তাকতওয়ার চিজ।

এর পরও রানিকে কি দোষ দেয়া যায়? যেমন আমার ডাক্তারকেও দোষ দেয়া যায় না।

আমার অ্যামিবিক হেপাটাইটিস। ডাক্তারসাহেবকে বললাম, দেখুন, আমি ঘ্যাঁটঁ্যাট সইতে পারি না। বাড়িতে দই ছানা দুবেলায় খেতাম আর খেতাম লিভার। আপনি তার ব্যবস্থা করে দিলে বেঁচে যাই।

উত্তর পেলাম—আমার তো লিভারের দোষ। দুমুঠো মুড়ি খেয়ে সকালে ঢকঢক করে দুগ্লাস পানি খাই। গরিবের একদম ঐ নাশতা তেমনি আহারটাও ডালভাত। তবু দেখুন বেঁচে আছি তো!

এরপর রানি এন্টনেয়েটকে দোষ দেওয়া যায়? ডাক্তার বোধ হয় ফরাসি দেশের এই জবরদস্ত রানির কাহিনিটি জানে না।

BanglaBook.org

৬. কাক নিয়ে কথা

রবি ঠাকুর ব্যাঙের প্রেমে পড়েছিলেন, দাদুরিকে নিয়ে তিনি কবিতা লিখেছেন। দোয়েল-কোয়েলের প্রতি প্রেমে বিশেষ বয়সে তরুণ-তরুণীর জীবন কাব্যময় হয়ে ওঠে জীবনে অন্তত একটিবারের জন্যও। কোকিলের প্রেম থেকে বঞ্চিত হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। কবিরা তো সবসময়ের জন্য এদের প্রেমে ডুবে থাকেন শুনেছি।

কিন্তু কাকের প্রেমে পড়েছেন এমন কথা শুনিনি কখনও। কোনো রচনায় তাদের সম্পর্কে দুটো ভালো কথা লিখিত হয়েছে বলে জানা নেই আমার। বরঞ্চ যতটুকু আলোচনা কাক সম্পর্কে মানুষের ছাপা বইতে স্থান পেয়েছে তা হল তার দুর্নাম, নোংরামি ইত্যাদি। আর রয়েছে কাককে নিয়ে সেই নিষ্ফল আকাঙ্ক্ষার বিদ্রূপটি 'কাকস্য পরিবেদনা'। কিন্তু না শুনলেও দেখলাম এক ভদ্রলোককে সত্যি সত্যি তিনি কাকের প্রেমে পড়েছেন এবং সে হল পবিত্র নিষ্কাম প্রেম। অবাক হবার কথা বটে!

কাকের পুড়ে যাওয়ার কাহিনিটি মনে পড়ল :

'কিষানভাই, কিষানভাই, দাও না একটু আগুন
মেষপালক তা দিয়ে গড়বে কাঁচি
সে-কাঁচিতে কাটবে ঘাস
সে-ঘাস খেয়ে মহিষভাই পাবে জোর
কেটে তুলবে দলা দলা মাটি
সে-মাটিতে কুমোর ভাই গড়বে বাটি
নদী দেবে বাটি ভরে পানি
সে-পানিতে ঠোঁট ধুবো—চড়ুই হবে বন্ধু।'

৭. ইমাম মেহেদি

টিকা বাবু আইছেরে—পালা পালা।

ভাগ ভাগ সব।

দরজায় খিল দে।

কেন রে পালাব কেন?

ওমা, জান না বুঝি?

বল-না পষ্ট করে।

ছি ছি জানে না রে জানে না, হো হো জানে না।

তবে শোনো।

ইমাম মেহেদির নাম শুনেছ?

জি।

তিনি আসবেন আসমান থেকে নেমে দুনিয়াকে বালা-মসিবত থেকে রক্ষা করতে। পাপ, অনাচার, হানাহানি, কাটাকাটি, লোভ, হিংসায় মানুষ যখন অধঃপতনের নর্দমায় ঢুকে যাবে, তখন তিনি আসবেন এক হাতে কোরান আর এক হাতে তরবারি নিয়ে। নাসারাদের নিশ্চিহ্ন করবেন পৃথিবী থেকে। সারা দুনিয়ায় মুসলমানের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করবেন।

সে তো বুঝলাম। তার সাথে টিকার কী হল?

বলছি বলছি, যাইব না সাব। সেটাই তো আসল কথা। এই ইংরেজ-নাসারারা ভয় করে ইমাম মেহেদিকে। তারা ওত পেতে আছে ইমাম খুঁজে বের করতে, আর লোকে টের পাবার আগেই চুপিসারে তাকে খুন করতে। জানেন তো, ইমাম মেহেদিকে প্রথমে কেউ চিনবে না।

আচ্ছা!

কিন্তু তাকে চেনা যাবে কয়েকটি লক্ষণ মিলিয়ে। তিনি হবেন অদ্ভুত ফরসা, খুবসুরত। তার গায়ের রক্ত হবে দুধের মতো সাদা। নাসারারা এটা জানে, জানে বলেই যেখানে যেখানে তাদের রাজ্য রয়েছে, সেখানে সেখানে মানুষকে ফুঁড়বার কানুন জারি করেছে।

BanglaBook.org

কেন?

কেন আর বুঝলেন না? ফুঁড়লেই তো বোঝা যাবে রক্তটা সাদা না লাল। সাদা হলে কি আর রক্ষা আছে! আর নাসারারা এমনি করে দুনিয়ার বেবাক মানুষকে ফুঁড়ে চলেছে।

তা হলে ইমাম মেহেদির কী হবে? তাকে কি আর খুঁজে পাবে? ইমাম মেহেদি আসবেন ঠিকই। নাসারাদের জারিজুরি সবই হার মানবে। ঠিক সময়টিতে তিনি এসে হাজির হবেন, কেউ টেরও পাবে না।

সে তো বুঝলাম। তুই টিকা নিচ্ছিস না কেন? তুই তো আর ইমাম মেহেদি না?

ওরে বাবা, সে বলবেন না মেজোসাব। খ্রিস্টানিদের এই সব হার্মাদি বুদ্ধিতে ভুলতে আছে কখনও? কে বলবে যে ওর মধ্যে বিষ নেই? ওরা তো চায় মুসলমানরা যাক খতম হয়ে।

৮. খুনি

ছমিরের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক কথা মনে পড়ে। সে কী ভাবছে? কীসব ভাবনা ওর প্রাণে তোলপাড় খাচ্ছে?

ফাঁসির পরোয়ানাপ্রাপ্ত আসামি ঠিক কী ভাবছে মুখটি দেখে কি বোঝা যায়? না অনুমান করা যায়?

এতদিন ছিল সে স্থির, শান্ত, যেন কিছুই হয়নি, কিছুই হবে না, খোশ মেজাজে না হলেও, দুশ্চিন্তার রেখা ছিল না তার কপালে, কোনো অসহ্য ভারে পীড়িত দেখিনি তাকে। খেত প্রচুর, পানি খেত তার চেয়ে বেশি। কলস কলস পানি সারাদিন ঢকঢক করে গলা দিয়ে টেনে নিত। কেন যে এত পানি সে খায়, আর কোথায় যায় ঘড়া ঘড়া পানি বুঝতে পারতাম না। মাঝে মাঝে মনে হত অন্তরতম প্রদেশের প্রজ্বলিত কোনো দাবানলকে প্রশমিত করার জন্যই ওর অত পানির প্রয়োজন। কোনো-এক ডাক্তারের মুখে শুনেছিলাম, স্নায়ু যাদের সদা-উত্তেজিত থাকে বেশি বেশি জলপানটা তাদের পক্ষে ভালো। স্নায়ুর উত্তেজনা প্রশমে সাহায্য হয়। হয়তো ছমির অভিজ্ঞতা দিয়েই বুঝে নিয়েছে পানিটা ওর পক্ষে ভালো।

বাড়ির কথা, শ্রমের কথা, তার নকরির কথা—দুনিয়ার সব কথাই হত। কিন্তু মামলার ব্যাপারটি এলেই সে চুপ করে যেত। খুব পীড়াপীড়ি করলে বলত—আমি বেকসুর সায়েব, দেখবাইন হাকিম আমারে খালাস দিবায়েন।

তা হলে তুই খুন করিসনি লোকটারে? একটু কড়াভাবে জিজ্ঞেস করতাম ওকে।

একটুও অবিচলিত না হয়ে সে উত্তর দিত, দেখবাইননে আপনি, হাকিম তো রায় দিবায়েন।

BanglaBook.org

রায়টা যখন এল আর যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তাই যখন হল অর্থাৎ ওর ফাঁসির নির্দেশ। জেলা আদালতে ও থাকল তখন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল ওর কথা। তিন দিন তার কাছেই ঘেঁষতে পারলাম না। চতুর্থ দিনে তেমনি হঠাৎ কথার স্রোত বইতে লাগলে অবিশ্রান্ত।

সুন্দরী বৌ তার, হঠাৎ একদিন সে রাগের মাথায় বলে বসল, তালাক, এক তালাক, দুই তালাক, তিন তালাক। পাশের বাড়িতে ছিল দুশমন, সে শুনে ফেলল। ওরা নিয়ে এল সাক্ষীসাবুদ, মসজিদের ইমামসাহেব এলেন। শালিসে তার তালাক বহাল থাকল। তালাক দেওয়া স্ত্রীর সাথে ঘর করা নাজায়েজ বেশরা। সে আপত্তি করল। শুনল না কেউ, মোল্লাজি, হাফেজ, ইমাম আর মাতব্বরদের বিচার কেমন করে সে অগ্রাহ্য করবে! মেনে নিল—ঠিক করল, হিল্লে শরা করে বৌকে আবার ফিরিয়ে আনবে ঘরে। কিন্তু বৌ করলে কিনা, সেই দুশমনকে বিয়ে করে বসল, সে বলল ফিরে এসো। ফিরে এল না। দুশমনকে তখন সে দায়ের এক কোপে দুখান করে দিয়েছিল। ঘটনাটি বলে সে জিজ্ঞেস করে মুখ তুলে, অন্যায় করেছি কি?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

আষাঢ়ে গল্প

কলম আলি খুনি এটাই জানতাম। কিন্তু সে স্ত্রীঘাতী, কথাটা শুনে ঘৃণা আর বিতৃষ্ণায় মনটা ওর প্রতি বিষিয়ে উঠল। আমাদের মানদণ্ডে লোকটি শিক্ষিত। স্বল্পভাষী হলেও সদালাপি। একদা শিক্ষকতার পবিত্র দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে-লোক স্ত্রীহত্যার ঘৃণ্যতম অপরাধে অপরাধী, অবিশ্বাস্য হলেও কথাটা সত্য। কলম আলি নিজে এজলাসে দাঁড়িয়ে কৃত পাপ স্বীকার করেছে।

অপরাধমাত্রই অপরাধ, খুনিমাত্রই অপরাধী, অতএব শাস্তির যোগ্য। নরহত্যা আর নারীহত্যা দুটোই হত্যাকার্য। দুটোই গুরুতর অপরাধ; দুয়েরই শাস্তি এক। আমার দশ হাতের মধ্যে খুনের অপরাধে দণ্ডভোগী অন্তত ডজনখানেক রয়েছে, ওদের সাহচর্যটা গা-সহা হয়ে গিয়েছে। তাই তাদের নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করি না। অপরাধীদের সাথে একই সারিতেই তারা বিরাজ করছে। কিন্তু স্ত্রীঘাতী কলম আলিকে সে-পর্যায়ে ফেললে তার অপরাধকে যেন লঘু করা হয়। ওরা পাপী হলে কলম আলি মহাপাপী, ওরা খুনি হলে কলম আলি তার চেয়েও নৃশংসতর কিছু। এই ধারণাটা যতই আমার মনে বদ্ধমূল হতে থাকে ততই কলম আলির সাথে স্বাভাবিক মেলামেশা দুরূহ হয়ে উঠল। ওকে বুঝতে দিলাম তার গায়ে-পড়া খাতিরটা আমার ভালো লাগে না। কারণে-অকারণে তাকে কটুকথা বলে অপমান করতেও ছাড়লাম না। হাসপাতালের খুদে কর্তা সে। বলতে গেলে আমার রিজিকটা তার দয়ার উপর নির্ভরশীল। তাকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলাম আমার জন্য বিশেষ কোনো ব্যবস্থা বা সুবিধার প্রয়োজন নেই। আর সব রোগীর জন্য যা পাক হয় তা-ই খাব। সাধারণ চুলোতেই আমার রান্না হবে। পৃথক পাকের ব্যবস্থাটা তুলেই দিলাম। এমনকি বারান্দায় পায়চারিটাও কমিয়ে দিলাম যেন সে বুঝতে পারে তার মতো স্ত্রীঘাতীর অনুগ্রহে সামান্যতম কোনো সুবিধা গ্রহণ করতে আমি অরাজি।

BanglaBook.org

কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত করে দিয়ে কলম আলি অপমানগুলো একটুও গায়ে মাখাল না। উলটো খবরদারির মাত্রাটা দিল বাড়িয়ে। আমার ওষুধপথ্য সুবিধা-অসুবিধার প্রতি তার উৎকণ্ঠা দিনে দিনে বেড়েই চলল। সময়-অসময় সে দোতালায় উঠে আসবে। আমার টেবিলের শিশিপত্রগুলো অপ্রয়োজনীয়ভাবেই নেড়েচড়ে, ঝেড়েমুছে নতুন কায়দায় সাজিয়ে রাখবে। বেদরকারি জিনিসপত্র নিয়ে চলে যাবে। কখনও-বা অযত্নের অজুহাত তুলে আমার ফালতুমির আদ্যশ্রাদ্ধ করে নিজেই চাদরটা, মশারিটা নিয়ে নেবে যাবে ভাটিতে দেবার জন্য। আমার সাথে কথাবার্তা বন্ধ। তাই আমার মতামত নেওয়ার প্রশ্নই উঠত না। লোকটির বেহায়াপনায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে একদিন মুখ খুলতে বাধ্য হলাম। বলে দিলাম আমার কোনো জিনিস সে স্পর্শ করতে পারবে না। ওটা তার কাজ নয়।

কেমন যেন রোষ চেপে গিয়েছিল আমার। এই শিক্ষিত হত্যাকারীটিকে চোখের সামনে সহ্য করা কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার বেহায়াপনার উৎপাত রীতিমতো ঢাকা দিলেও ওকে ডেকে এনে সবগুলো কড়া গাল শুনিয়ে দিলাম।

এই হৃদয়হীনতার জন্য পরে নিজেকে কতবার ধিক্কার দিয়েছি। অনুতাপের আগুনে জ্বলেপুড়ে মরেছি। কিন্তু তখন ভুল শোধরাবার সকল পথই আমার সামনে রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। কলম আলি যেন সর্বপ্রকার চেতনাঅনুভূতির বাইরে, অন্য জগতে।

সেদিনের গালিগালাজের পর সে একটু সংযত হল। আমার বিছানার পাশে সময়-অসময় আসাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমিও হাঁপ ছাড়লাম। কিন্তু পরদিনই বেশ লক্ষ করলাম একটি অদৃশ্য ছায়া যেন অহরহ আমার অনুসরণ করে চলেছে। কলম আলি চোখের বাইরে গেল কিন্তু তার অশরীরী স্পর্শ থেকে পরিত্রাণ পেলাম না। দূর থেকে চোখে-চোখে, ইশারায়-ইঙ্গিতে তার খবরদারি অব্যাহত থাকল। আমার দিকে সময়মতো আহার, চা প্রভৃতির ব্যবস্থাপনা রইল। হঠাৎ বারান্দায় এসে পড়লে তার নির্বিঘ্ন আনন্দ উগরে পড়ে সব নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে। ব্যবস্থাগুলো অব্যাহত থাকল আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও। দূর থেকেই এই নারী-হত্যাকারী আমার দৈনন্দিন জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল।

সেদিন ছিল রবিবার। ছুটির দিন। অফিসের কাজকর্ম বন্ধ। মেট, পাহারাদাররা তাস খেলে অথবা গল্প-আড্ডায় ছুটির আনন্দে মেতে গিয়েছে। শেষরাত্রি থেকেই বৃষ্টি হচ্ছে। কখনও ঝমঝম বর্ষাবাদলের ধারা, কখনও-বা টিপটিপ শ্রাবণের একঘেয়ে বর্ষণের মতো। জানালার ধারে বসে ঘোলাটে পদ্মার বুকে বৃষ্টি আর জলের খেলা দেখছিলাম। বাংলাদেশের এই বর্ষার রূপ মনকে টেনে নিয়ে যায় অনেক দূরে। মেঘে মেঘে কাজল চোখের মায়া খালবিলে, বনবাদাড়ে বৃষ্টি-জলের হুল্লোড়, গাছে গাছে বর্ষাপাখির আলাপ পূর্ববাংলার নিজস্ব সম্পদ। মাটির সাথে প্রকৃতির এক নিবিড়তম আত্মীয়তায় এই বর্ষারূপ অনিন্দ্য সুন্দর। কবিতায় গানে, বাউলের সুরে, ভাটিয়ালির টানে এই বর্ষা যুগ যুগ নন্দিত। পূর্ববঙ্গের প্রাণ বর্ষা। এটাই আমাদের মরণ।

BanglaBook.org

বৃষ্টি পড়ছে, থামছে, আকাশে চলছে মেঘ আর সূর্যের লুকোচুরি। হঠাৎ অন্ধকার বিদীর্ণ করে রোদ হাসছে। সে-রোদের গা বেয়ে রুপালি সুচের মতো বৃষ্টিধারা গড়িয়ে পড়ছে। আবার মেঘ এসে সূর্যের মুখে কালি লেপে দিচ্ছে। নদীর দিকে মুখ করে আকাশকন্যার এই যুগপৎ হাসিকান্না কত যুগের কত কালের। তবু নতুন জল, বৃষ্টি, রোদ, মেঘ, ভিজে কাদামাটি। ঘোলাটে পদ্মার ঘূর্ণিনাচ। সব মিলিয়ে বর্ষাঋতুর অপরূপ রূপের অভিব্যক্তি বিচিত্র রং আর মৃত্তিকাগন্ধের সমারোহ। চোখ, মন দুটোই ডুবে গিয়েছিল তার মধ্যে।

অন্ধকার...রেড়ির তেল—বাতি...। কতগুলো অসংলগ্ন কথা ভেসে আসছিল। একত্রে মনোযোগে ছেদ পড়ায় বিরক্ত হলাম। কথাগুলোর উৎসমুখ আমারই জানালার উলটোদিকের কোনাটা। সেখানে ছুটির বৈঠকে বোধহয় আষাঢ়ে গল্প জমেছে।

চট করে এক কাপ চা বানিয়ে নিয়ে আমি পুনরায় বৃষ্টি-রোদের খেলায় মন দিলাম। বৃষ্টির বেগটা কমে এসেছে। দেয়ালের পাশ দিয়ে লাল সুরকির যে-সরু রাস্তাটা গিয়ে উঠেছে নদীর পাড়ে, তার মাঝে মাঝে গর্ত হয়ে কাদাপানি জমেছে। একটি কালো রঙের মোটরগাড়ি সে কাদা আর পানির ছিটে গায়ে মেখে ডান দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। নীল ডোরাটানা জাঙিয়া আর হাতকাটা কোর্তা পরা, পায়ে লোহার খাড়ু-আঁটা কতগুলো লোক মাথায় পুঁইডাঁটার বোঝা নিয়ে চলেছে যেদিকে কালো মোটরটা একটু আগে মিলিয়ে গেল সেই দক্ষিণ কোনা ঘেঁষে।

কিন্তু আষাঢ়ে গল্পের বান ডেকেছে ঘরের মধ্যে। তারই ঢেউ বারবার কানের মধ্যে আছড়ে পড়ে বাইরের মনোযোগটা আমার কেটে দিচ্ছে। তবু মুখ না ফিরিয়ে জানালার কপাটে গাল রেখে আমি আরও গভীরভাবে ডুবে যেতে চাইলাম দেয়ালের ওপারে বর্ষাঋতুর কৌতুক খেলায়। তিন বছর ধরে শুনে আসছি এসব একঘেয়ে কাহিনি। ডাকাতি, রাহাজানি, নরহত্যা অথবা হাইকোর্টের আপিলের শুনানি। শুনে শুনে বিরক্তি জন্মে গিয়েছে। সময় কাটাবার জন্য এসব গল্পে আজকাল মন লাগে না। তবু কথাগুলো আমার কানে এসে ধাক্কা মারে। বাইরের ছবিটা ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আর-একটি ছবি আমার অজ্ঞাতসারেই চোখের সামনে রক্তমাংসের আকার ধরে মূর্ত হয়ে ওঠে। হাটবারে এমনিতেই আমি দেরি করে বাড়ি ফিরি। সেদিন কাছারিতে কাজ পড়েছিল। নায়েবমশায়ের সাথে কাজ সেরে হাট করতে করতে অনেক রাত হয়ে যায়। বেশি রাত দেখে মাছ আর কিনলাম না। আলু তরকারি, ডাল, পেঁয়াজ আর এক ভাঁড় দই কিনে হাট শেষ করলাম। বাড়ি ফেরার সঙ্গী না পেয়ে চাঁদ ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম।

এই বিলম্বটাই আমার কাল হয়ে দাঁড়াল। চাঁদ উঠল। হাটের লোক যে যার ঘরে ফিরে গিয়েছে। গ্রামগুলো ঘুমে নিঝ্ঝুম। চাঁদের ক্ষীণ আলোয় কোনাকুনি আগের পথ ঠাহর করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরলাম। পুকুরঘাটে পা ধুয়ে উঠোনে এসে দেখি ঘরের দরজাটা আধভেজানো। বাতাবিলেবু গাছে চাঁদটা আটকা পড়ে

BanglaBook.org

ঘরের দাওয়ায় আলো-আঁধারের মায়া সৃষ্টি করেছে। হঠাৎ যেন একটি বিড়াল ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আবছা আলোতে আর কিছু দেখা গেল না। শুধু শুকনো পাতার উপর দিয়ে মড়মড় শব্দে লঘু পায়ে কী যেন চলে গেল। বাতাবিলেবুর মিষ্টি গন্ধটা কী এক উগ্র আবেগে বাতাসের হালকা অঙ্গ জড়িয়ে ধরেছে। আমি সকিনার নাম ধরে ডাকলাম। সারা না পেয়ে অবাক হলাম। দরজা খোলা রেখে নিশ্চয়ই সকিনা ঘুমিয়ে পড়েনি। হয়তো পাকঘরে আছে। পাকঘরে গিয়ে দেখি দরজাটা বাইরে থেকেই তালা লাগানো। দাওয়ায় উঠে এসে সকিনার নাম ধরে জোরে জোরে ডেকেও আওয়াজ না পেয়ে কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। বাজারের চাঙারিটা দাওয়ায় রেখে আধভেজানো দরজাটা খুলতেই দেখি সামনেই চাটাই বিছিয়ে সকিনা ঘুমুচ্ছে। চৌকিতে এখনও বিছানা পাতা হয়নি, চৌকির পাশে সিন্দুকের উপর বাতিটা নিবুনিবু করছে। রেড়ির তেল এনেছিলাম হাট থেকে। তেল ঢেলে সলতেটা উসকে দিলাম। সকিনা শুয়েছিল পাশ ফিরে। অবিন্যস্ত শাড়িখানা কোনোরকমে লেপটে রয়েছে গায়ের সাথে। মুখের উপর আড়াআড়িভাবে রাখা ডান হাতের কনুইটা বাম হাতের তালুর সাথে এসে মিশেছে ঠিক তার চোখ আর কপালের উপর। ছোট ছোট নিশ্বাসের সাথে অরক্ষিত বুকখানা উঠছে নামছে। গভীর রাত্রির নির্জনতায় আমি তখন আচ্ছন্ন।

কৃষ্ণপক্ষের চাঁদনি রক্তহীন মুখের পাণ্ডুরতার মতো লেপটে রয়েছে মাটির গায়ে। ঘরের পেছনের বেতঝোপ থেকে ঝিঁঝি পোকার একঘেয়ে ডাক ভেসে আসছে। কখনও কখনও গাছের দু-একটি পাতা ঝরে পড়ছে। তারই শব্দে হঠাৎ গা ছমছম করে ওঠে।

জনমানুষহীন আলোর পথে চলতে চলতে একটা ভয়, কী-একটা আতঙ্ক আমায় জড়িয়ে ধরেছিল। সারা পথ আমায় এক অশরীরী মূর্তি পেছন থেকে ধাওয়া করে নিয়ে এসেছিল। দরজা-খোলা ঘরের মধ্যে চৌকির উপর বসে মনে হল ভীতি আর আতঙ্কের সেই মূর্তিটিও আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার চাল অবধি লম্বিত শীর্ণ দেহটিও যেন আমি দেখতে পাচ্ছি। সকিনা ঈষৎ আড়মোড়া দিয়ে ডান হাতখানা সরিয়ে নিয়ে বাঁ কাত হয়ে শুল। মুখটা এবার স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে।

আকস্মিক, হ্যাঁ নেহাত আকস্মিকভাবেই আমি চৌকি থেকে নেবে এলাম। যন্ত্রচালিতের মতো সকিনার পাশে বসে দুহাত বাড়িয়ে দিলাম তার গলার দিকে। আঢাকা গলা আমার আঙুলের চাপে দেবে গেল। এক প্রচণ্ড ঝটকায় সকিনার মাথাটা পড়ে যায় পেছন দিকে। জড়ানো পা দুটো সোজা উপরমুখী নিক্ষেপ করে হাত দিয়ে সে আমার কোমর জড়িয়ে ধরল। আমি আরও জোরে ওর মাথাটা চেপে ধরলাম মাটির সাথে। বুকের উপর উঠে বসে তার হাত দুটো দুপাশে হাঁটুর চাপে গুঁড়িয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে বক্তার দিকে। হাঁ, মরা মুখের ঠোঁটগুলো যেন আলগা হয়ে অনেক দূর সরে গিয়েছে। কারো মুখে কথা নেই।

কলম আলি, এদিকে আসো, কণ্ঠস্বরের জড়তায় নিজেই একটু বিস্মিত হলাম। কিন্তু কলম আলি আদৌ চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না। আমার হুকুমটা সে তামিল না করেও পারে এমন একটা খিস্তি মুখভঙ্গিতে বসে বসে খৈনি টিপতে লাগল। কী জনাব? তোমাকে ডাকলাম যে! আমার অসহিষ্ণু আহ্বানটা এবার বোধহয় ওর কানে গেল।

রোগীদের খাওয়াবার টাইম হয়েছে। জটলার সাথিদের তাম্বি দিয়ে সে গায়ের আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে শরীরটাই এলিয়ে দিল মেঝেতে।

একে একে দলের লোকরা নিচে পাশের ঘরে চলে গেল। নিজে সে আরও কিছুক্ষণ খৈনি টিপল, হাই তুলল। তারপর আস্তে আস্তে কম্বলটা গুটিয়ে নিল। লক্ষ করলাম আমারই খাওয়ার কম্বল পেতে মিঞারা আসর জমিয়েছিলো।

স্যার।

থামো, স্যার বলতে না করেছি না? জিজ্ঞেস না করে কম্বল নিয়েছিলে কেন?

যতটা সম্ভব উষ্মা প্রকাশ করা যায় ততটা করলাম।

স্যার, ওটা ওইখানেই পাতা ছিল।

পাতা থাকলেই তোমাদের বসতে হবে?

আর বসব না স্যার।

মনে থাকে যেন।

নিজের মুখে বলা লোকটির অমানুষিক নিষ্ঠুরতার কাহিনি সমস্ত ঘরের বাতাসকেই করে তুলেছে বিষাক্ত। সে-নৃশংস ঘটনার প্রতিটি কথা, প্রতিটি বর্ণনা হাতুড়ির ঘায়ের মতো আমার দেহমনকে অনবরত আঘাত করে চলেছে। অথচ আশ্চর্য নির্বিকার কলম আলি। বর্ষার দিনে সে যেন গল্পের আসর মাতাবার জন্যই ভূতুড়ে গল্প ফেঁদেছে। আসরও শেষ, গল্পও শেষ। সব খুনিই কি একরম? ঠান্ডা রক্তে, স্থির মস্তিষ্কে তারা খুন করে; এবং সে-খুনের গল্প যত্রতত্র অনায়াসেই করতে পারে? স্থির মস্তিষ্কে পরিষ্কার হিসেব-নিকেশ করে যদি কলম আলি খুন না করত তবে খুনের এত নিখুঁত বর্ণনা এত বছর পরও সে কি দিতে পারত? সেই পাতা ঝরার মতো গা-ছমছম-করা, তুচ্ছ ব্যাপারটাও তো তার মনে গেঁথে রয়েছে! কিন্তু সেই হিসেবটাই-বা কি? কী উদ্দেশ্যে সে জীবনসঙ্গিনীর প্রাণটা কেড়ে নিল?

অথবা অন্যকিছু। এমনও তো হতে পারে যে, সে সেই অশরীরী রাত্রির অসহায় শিকার? নীরব, নিথর রাত্রির গভীরে সে শুধু এক অজ্ঞাত, অপরিচিত শঙ্কা আর ত্রাসের অদৃশ্য, কিন্তু অপ্রতিরোধ্য শক্তির তাড়নায় স্বীয় স্ত্রীকে খুন করেছে? হয়তো তাই ভীতি আর সন্ত্রাসের ছবিটা তার মনে এত গভীরভাবে গেঁথে গিয়েছে। কিন্তু কিসের ভীতি, কীসের শঙ্কা? কী সেই রাত্রির অশরীরী মূর্তি যার

BanglaBook.org

কুহেলি ইঙ্গিতে কলম আলি মাস্টার এমন জঘন্য পাপের প্ররোচন পেল? এমন পৈশাচিক নিষ্ঠুরতায় গলা টিপে নিজের স্ত্রীকে খুন করল?

ক্রোধে ঘৃণায় দেহের লোমকূপগুলো পর্যন্ত কেঁপে কেঁপে উঠল আমার। তবু কণ্ঠস্বর যথেষ্ট সংযত করে জিজ্ঞেস করলাম : কথাটা কি সত্যি?

সে জন্যই তো আমার সাজা হয়েছে, স্যার। যেন খুবই মামুলি ব্যাপার এমনিভাবেই উত্তর দিলে কলম আলি।

কৃত অপরাধের জন্য তুমি কি অনুতপ্ত নও?

প্রশ্নটা আদৌ তার মনঃপূত হল না। কী করে হেসে সে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল যাতে উত্তরের জন্যে পীড়াপীড়ি করার ধৈর্য বা সাহস পেলাম না। তার চোখটা নেচে নেচে আমার মুখের উপর স্থির হয়ে রইল। বুঝলাম আমার অসহায় পর্যুদস্ত অবস্থাটা সে পুরোপুরি অনুভব করছে আর নিষ্ঠুর উল্লাসে প্রতিহিংসাপরায়ণ মনের রিপুকে তৃপ্তি দান করছে। পরাজিতের গ্লানি মুছে ফেলে মুখের মাংসপেশিগুলোকে কঠিন করে বললাম তোমাকে শেষবারের মতো হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি আমার ঘরে আসবে না।

হ্যাঁ স্যার।

তোমাকে আমি ঘৃণা করি এটা জেনে রাখো।

জি স্যার।

আবার স্যার! ব্যাটা বদমায়েশ খুনি! নিজের বৌকে খুন করে সেটা আবার রসিয়ে সবাইকে শোনানো হয়! তুমি দোতালায় উঠেছ কি আমি তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। বের হও ঘর থেকে।

কলম আলি যদি ভস্মলোচন হত, তা হলে আমি এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যেতাম। আমার আপাদমস্তকে অগ্নিক্ষরা চোখে দুটো বুলিয়ে মাথাটায় একটি জোরে ঝাঁকানি দিয়ে ধপ করে নেমে গেল সে। বুঝিয়ে দিল সে থোড়াই পরোয়া করে আমার ঘৃণা ভালোবাসার। হয়তো তা-ই চেয়েছিল সে। হয়তো সে চেয়েছিল আমার দুর্বল স্নায়ুর উপর সামান্য পীড়ন চালিয়ে একটুখানি আমোদ উপভোগ করতে। আমার বৈকল্য, উষ্মা আর বিপর্যস্ত হয়রানিতেই হয়তো তার আনন্দ। সে সফল হয়েছে।

মেঘমেদুর সকালটা এভাবে মাটি হওয়ায় মনটা বিতৃষ্ণায় তিতিয়ে গেল। তেতো মুখে বিস্বাদ ঠেকল দুপুরের খাওয়াটা। শুয়ে ঘুমিয়ে সে-বিতৃষ্ণা বিষাদ দূর করতে গিয়ে নিজের অস্থিরতাটাই আরও বেশি করে প্রকাশ করে ফেললাম কলম আলির এজেন্টদের সম্মুখে। স্থির করলাম এই জঘন্য অপরাধীটার কথা যেমন করেই হোক মন থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।

তিন দিন কলম আলির ছায়াটিও নজরে পড়ল না। দু-একবার মনে হয়েছে দূরে একতলার আমগাছের নিচে অথবা ডিস্পেনসারির সামনের রোয়াকে কলম আলি দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঠিক কলম আলি না অন্য লোক সেটা চোখ তুলে

BanglaBook.org

যাচাই করার সাহস পাইনি। মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নিয়েছে। সভয়ে লক্ষ করলাম কলম আলিকে রীতিমতো আতঙ্কের চোখে দেখতে শুরু করেছি। গত তিন দিন ধরে যতবারই এই নিষ্ঠুর লোকটার চেহারা ভুলতে চেষ্টা করেছি ততবারই একটি ভীতি, একটি দুর্বোধ্য ত্রাস আমাকে নিঃসাড় করে দিয়ে গেছে। মনে হয়েছে নরক থেকে উঠে আসছে কোনো পিশাচ। সে-পিশাচ আমার ঘর, ঘরের আসবাবপত্র, বাতাস সবকিছুর মধ্যে একটা মূর্তিমান প্রতিহিংসার মতো বিরাজ করছে। চোখের সামনে আমার ভেসে উঠেছে কৃষ্ণপক্ষের ম্লান চন্দ্রিমায় ক্ষীণালোকিত একটি অভিশপ্ত রাত্রির ছবি। এক জোড়া লোমশ হাতের পেষণে পিষ্ট প্রাণহীন একটি মুখ। সে-মুখে ভয়ার্ত বিভীষিকায় ফুলে-ওঠা কালো শিরা, ঠোঁটের কোণে ফেনার বুদ্বুদ, চিবুকের নিচ দিয়ে বয়ে সরু রক্তের ধারা গলার কাছে গিয়ে থক থক জমাট বাঁধা। লোমশ হাতগুলো সে-রক্তে রঞ্জিত। স্ত্রীঘাতী কলম আলির আওতা থেকে বেরিয়ে আসতে গিয়ে আমি যেন তার অদৃশ্য প্রভাবে আরও বেশি করে জড়িয়ে পড়লাম। তিন দিন তার অসাক্ষাতে স্বস্তি পেলাম, না আমার চিন্তাতে ভুগলাম বুঝলাম না।

কিন্তু তৃতীয় দিন কলম আলি এসে উপস্থিত। হাতে সিরিঞ্জ আর বেরিনের কৌটো। আমার মনোভাব সম্পর্কে সে যে বিশেষ মাথা ঘামায় না, তা ইতিমধ্যে একাধিকবার জানা হয়ে গিয়েছে। হয়তো এই কারণেই আমার কোনো কাজ করার ব্যাখ্যাদান করার বাহুল্য সে বরাবরই বর্জন করে এসেছে। কিন্তু আজ কলম আলি ঘরে ঢোকার আগে সিঁড়ি থেকেই জানিয়ে দিল কম্পাউন্ডারবাবু অসুস্থ, ডাক্তার সাহেব আমাকেই ইনজেকশান দিয়ে দিতে বললেন।

আমিও প্রস্তুত ছিলাম। বললাম ব্যাখ্যার কোনো প্রয়োজন নেই। জল্‌দি জল্‌দি কাজ সেরে ফ্যালো।

কলম আলির তাড়া নেই। গরম পানিতে সিরিঞ্জটা ডুবিয়ে দিল। সুচটা বারবার নেড়ে চোখের উপর তুলে ধরে দেখলে। স্পিরিট দিয়ে তুলো ভেজাল। বিশেষ একটা ঢঙে স্পিরিটের শিশিটা বন্ধ করে আমার দিকে চোখ তুলল। সেই চোখ, সেই দৃষ্টি যা ভুলবার জন্য আমি প্রাণান্ত চেষ্টায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছি। চোখগুলো তার ধূর্ত কৌতুকে নেচে নেচে আমার আপাঙ্গ বিদ্ধ করল, যেন বলল, কী বাপু, আমি তো খুনি, কিন্তু আমাকে ছাড়া চলে?

এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপ থেকে আত্মরক্ষার জন্য মুখটা ঘুরিয়ে নিলাম। হঠাৎ করে একটু শব্দ বেরিয়ে এল, গলা থেকে না নাক থেকে বোঝা গেল না। আড়চোখে লক্ষ করলাম কলম আলির ঠোঁটে তেরচা হাসি। আমাকে জব্দ করার সাফল্যে তৃপ্ত দিগ্‌বিজয়ীর ধূর্ত হাসি, ক্রূর নিষ্ঠুর। প্রতিশোধের আগুনের হলকা সে-হাসির সাথে ছড়িয়ে পড়ে আমার সর্বাঙ্গে আগুন ধরাল।

তাড়াতাড়ি করো, ধমকে উঠলাম। সিরিঞ্জের মধ্যে সুচ ঢুকিয়ে কলম আলি যেন গরম পানি একবার তুলছে, আবার ছাড়ছে। কখনও বিজ্ঞ ডাক্তারি ঢঙে

BanglaBook.org

সিরিঞ্জটা উপরে তুলে আলোর দিকে রেখে কী যেন নিরীক্ষণ করছে গভীর মনোযোগে।

হঠাৎ আমার হৃৎপিণ্ডটা নিথর হয়ে এল, আতঙ্কিত ভয়ে দেহের রক্তপ্রবাহে অকস্মাৎ ছেদ পড়ল। আমার মনে হল কলম আলি আমাকে কষ্ট দেবে। এমনকি খুনও করতে পারে। যদি সে সুচটা আমার হাড়ের মধ্যে গেঁথে দেয়, অথবা মাংসটা থেঁতলে দেয় বা এমন আর কিছু, যাতে শরীরে বিষাক্ত বীজাণুর অনুপ্রবেশ ঘটবে, যার ফলে আমি তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব? স্ত্রীঘাতীর পক্ষে এটা এমন কী দুরূহ কাজ। প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার এমন অব্যর্থ সুযোগটা কলম আলি ছাড়বে না বলেই আমার ধারণা হল। ত্রাস-আতঙ্কের এক ভীতিবিহ্বল অনুভূতি তুষারস্পর্শের মতো আমার গরম দেহটাকে নিমেষের মধ্যে অসাড় করে দিল। কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলাম। হাত তুলে না করার আগেই দেখলাম সরু সুচটার অর্ধেকাংশই ডুবে গিয়েছে আমার মাংসপেশির মধ্যে। গোটা সুচটা ঢুকিয়ে দিয়ে স্পিরিটভেজা তুলোটা সে চেপে ধরল। তারপর ছোট একটা অভিজ্ঞ টানে বের করে নিয়ে একগাল হেসে বলল—এবার বেরিয়ে গিয়ে ডাক্তারি করব ঠিক করেছি।

হ্যাঁ, তাই কোরো। ইনজেকশনটা তুমি বড় চমৎকার দাও, টেরই পাওয়া যায় না। প্রশংসাটা সত্যিই তার প্রাপ্য।

পাঁচ বছর ধরে রোগী ঘাঁটলাম, কমপাউন্ডারি করলাম। এতে যা শিখলাম তাতে কি ডাক্তারি করা চলে না? আপনিই বলুন-না!

নিশ্চয়। ডাক্তারিও চলবে, খুন করতেও সুবিধে হবে। প্রচণ্ড একটা খোঁচা মারার লোভ সামলাতে পারলাম না।

কিন্তু খোঁচাটা যে এমন রূঢ়ভাবে কলম আলিকে বিদ্ধ করবে তা ভাবিনি। মুহূর্তের মধ্যে তার উজ্জ্বল মুখখানার উপর নেবে এল অমাবস্যার কালিমা। চোখে জেগে উঠল বৃষ্টিঝরা কাজল মেঘের ছায়া। ছলছল অদ্ভুত মিনতি-আকুল চোখ দুটো আমার মুখের উপর স্থির নিবদ্ধ করে যেন অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল, না।

মানে?

মানে আপনি যা ভাবছেন তা নয়? রুদ্ধ কণ্ঠস্বরের শক্ত প্রতিবাদ। আমার ভাবনার তোয়াক্কা সে করে না। এটাই জেনে আসছি। নীরব উপেক্ষা আর গর্বিত অবজ্ঞা ছাড়া অন্য কিছু তার দৃষ্টিতে খুঁজে পাইনি। কিন্তু আজকের মিনতি-আকুল চোখের সজল ছায়াটা নতুন। সেখানে বহু যুগের সঞ্চিত বেদনার ব্যাকুল কান্না। সে-কান্না একটি জীবনের নয়। বহু জীবনের, বহু প্রাণের ক্রন্দন অকস্মাৎ রুদ্ধগতি সাগরস্রোতের মতো দিশেহারা হয়ে যেন আছড়ে পড়ছে পাষাণপ্রাচীরের গায়ে। বেরিয়ে আসবার পথ তার রুদ্ধ। কলম আলি কঠিন প্রকৃতির মানুষ—সব খুনি যেমন হয়। সব খুনি-অপরাধীদের মতোই সে প্রতিহিংসাপরায়ণ, ঈর্ষাতুর, গোঁয়ার। আর-একটি জিনিস তার ছিল যা তার সমপাপীদের মধ্যে কদাচিৎ দেখা

BanglaBook.org

যায়। সে হল তার দেমাক। সকল ঘাগু অপরাধীই স্বীয় অপরাধ সম্পর্কে একটি মর্যাদাবোধ রক্ষা করে চলে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস না করলেও অন্যদের সামনে এই মর্যাদা জাহির করতে তারা অস্ত্রপ্রহর সজাগ। কিন্তু কলম আলির দেমাকটা ভিন্ন ধরনের। খুনি হলেও সে ডাক্তারকে থোড়াই মানুষ বলে গণ্য করে, আমাকে ভাবে নির্বোধ বালক—এখানেই তার দেমাক, খুনি হলেও ডাক্তার অপেক্ষা আমি বা আমার সমগোত্রীয় শিক্ষিত ভদ্র ব্যক্তি অপেক্ষা সে কোনো অংশেই নিচে নয়, এটা সে সর্বক্ষণ প্রকাশ করে বেড়ায় হাসপাতালের রোগীদের কাছে নানা কথার ছলে। ভদ্র রোগীরা তার কাছ থেকে কোনোদিন পক্ষপাতিত্ব তো পায়ইনি, বরঞ্চ পেয়েছে ক্রুদ্ধ কটাক্ষ আর সজ্ঞান অবহেলা। এমনকি নগদ ভেটের বিনিময়েও না। ভেটদানের চেষ্টা করতে গিয়ে অনেকে তার কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছে। তার নানা কাহিনি হাসপাতালে প্রচারিত। কঠিন কলম আলিকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে আমার আনন্দ হবারই কথা। এত দিনের জমানো আক্রোশটা সুদে-আসলে মিটিয়ে নেবার সুযোগ পেয়ে আমার উচিত তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তার গর্বিত কটাক্ষ আর পরোক্ষ অপমানগুলোর প্রতিশোধ গ্রহণ করার এই তো সুবর্ণ সুযোগ। চোখা চোখা কথার বাণে তাকে জর্জরিত করে ধুলোয় গুঁড়িয়ে দেওয়া দরকার। কথাগুলো আমার মাথায় খেলে গেল।

কিন্তু পারলাম না সাহসে ভর দিয়ে একটিবার চোখে চোখ রাখতে অথবা কথার বাণ ছুড়ে তাকে আক্রমণ করতে। আসলে আমি যে একটা কাপুরুষ এটা কলম আলি অনেক আগেই বুঝি ধরতে পেরেছিল। আজকের এই মাহেন্দ্রমুহূর্তেও আমার কাপুরুষতাই জয়ী হল। কিন্তু পরাজিতেরও অহংকার আছে। বোধ হয় সে অহংকারবোধই চরম গ্লানির মুহূর্তে ধুলায় লুণ্ঠিত বিজিতের মনে বিজয়ী শত্রুকে করুণা প্রদর্শন করার শক্তি জোগায়।

তুমি লেখাপড়া জানা মাস্টারমানুষ, বৌকে খুন করতে বিবেকে বাধল না? পুরানো প্রশ্নটিই আবার পেশ করলাম।

শিক্ষিত ভদ্দরলোকেরা বুঝি খুন করে না?

কোনো জবাব না দিয়ে চেয়ে রইলাম তার দিকে আরও কিছু শোনার আশায়। ধীরে ধীরে সে বলল। আমি শুনলাম। কয়েক দিনের একটানা বর্ষণশেষে কালিমার পর্দা অপসারণ করে আকাশের গায়ে আজ সূর্য দেখা দিয়েছে। মেঘেরা ত্রস্ত গতিতে ওর সাথে ধাক্কা খেতে খেতে পলায়নের পথ খুঁজছে। কখনও-বা সদ্য-জাগা সূর্যের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ধরা পড়ে গিয়ে নিদারুণ লজ্জায় গলে গলে পড়ছে।

বিক্ষুব্ধ পদ্মা অপেক্ষাকৃত শান্ত। তার ঘোলাটে চোখের উত্তেজনা স্তিমিত। লাল কাঁকরের রাস্তাটি রক্তিম হাসিতে উজ্জ্বল। বাঁধের ধারে লম্বা লম্বা ঘাসের ডগায় বৃষ্টিফোঁটার অবশিষ্ট কণাগুলো রোদ্দুরের ছোঁয়া পেয়ে মুক্তোর মতো জ্বলছে। আষাঢ়ে বর্ষার চতুর্দিকে ছড়ানো শরৎ অপরাহ্নের এমন নীলাভ উজ্জ্বলতা

BanglaBook.org

মনকে টেনে নিয়ে যেতে চায় উন্মুক্ত পৃথিবীর দিগ্‌দিগন্তে। কফিট উঁচু প্রাচীরের শাসানি মনে হয় কত কৃত্রিম। অথচ মনের সাথে মিতালি রেখে ঐ সবুজ ঘাসের সরু সরু ছায়ায় আবৃত ক্ষুদ্র মাঠটুকু পেরিয়ে শান্ত পদ্মার বুকে নির্ভাবনায় ঝাঁপিয়ে পড়ার উপায় নেই। মনের হুকুমে দেহ চলে না। ঐ কৃত্রিম বিঘ্নটুকুই দুর্লঙ্ঘনীয় অচলায়তনের মতো পথ আগলে থাকে আর মনে করিয়ে দেয় জীবন অভিশপ্ত অসহনীয়।

অনেকদিন পর কলম আলির হাত ধরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। আকাশের তলায় পদ্মাপাড়ের কতগুলো অবিস্মরণীয় সকাল-সন্ধ্যার মধুর স্মৃতির সাথে বিজড়িত এই ছোট্ট বারান্দাটুকু। রুগ্‌ণ জীবনের সেই সামান্য আনন্দ তীর্থযাত্রীর পবিত্র স্মৃতিকণার মতো আমার মনেও চিরদিনের মতো গেঁথে গিয়েছে। আবার এই বারান্দাতেই জামকাঠের চেয়ারে বসে সমস্ত পুলক মধুরতা ভুলে গিয়েছি। পশুপ্রবৃত্তির পরিচালনায় অবিশ্বাস্য নেশার ঘোরে একটি হৃদয়হীন মানুষের ঘৃণিত জীবনকাহিনির পাতা উলটিয়েছি। একটি বীভৎস ছবি প্রত্যক্ষ করে ক্ষণে ক্ষণে লোমকূপ খাড়া করে শিউরে উঠেছি। আমার সেই ক্ষুদ্র প্রশ্নটুকুর জবাবে এমন আকাশভাঙা প্রত্যুত্তর পাব জানলে কখনও এই অবিমৃশ্যকারিতার আশ্রয় হয়তো নিতাম না। কলম আলি দয়ামায়াহীন, কসাইয়ের মতো ধারালো ছুরির দাগ কেটে কেটে সে তার নৃশংস হঠকারী জীবনের চিত্র খুদে দিয়ে গেল আমার রুগ্‌ণ দুর্বল মনে।

উত্তরবঙ্গের কোনো-এক জেলাশহরের উচ্চাভিলাষী মধ্যবিত্ত তরুণ। দুষ্ট স্বভাব আর পিতার অকালমৃত্যুর ফলে ম্যাট্রিক পাশ করে নিজ শহরেই প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করল। সে হচ্ছে ১৯৪৪-৪৫ সালের কথা। কিন্তু শিক্ষকতার সংকীর্ণ পরিসরে আর নিরামিষ পরিবেশে তার উচ্চাভিলাষী মন সহসাই হাঁপিয়ে উঠল। শিক্ষকতার চাকরি আর জেলাশহর ছেড়ে সে বেরিয়ে পড়ল ভাগ্যান্বেষণে। বড় হতে হবে। এমন কিছু করতে হবে যাতে আসবে যশ খ্যাতি আর প্রতিপত্তি। লাখো মানুষ তার কথায় উঠবে বসবে। হাজারো প্রাসাদ তার ইঙ্গিতে ভাঙবে, গড়ে উঠবে। হাজার মানী লুটিয়ে পড়বে তার পদতলে। হাজার গুণী তার প্রসাদ পেয়ে ধন্য হবে। হাজার আভিজাত্য ধূলিসাৎ হবে তার অঙ্গুলিসংকেতে।

কীভাবে কোথা থেকে কলম আলির এই উচ্চাভিলাষ জন্ম নিল প্রশ্ন করে জবাব পাইনি। কখন তার মনে বড় হবার আকাঙ্ক্ষা জেগেছে সে-প্রশ্নেরও উত্তর পাওয়া যায়নি।

সময়টা ছিল কলম আলির অনুকূলে। ভাগ্য প্রসন্ন। নতুন রাষ্ট্র সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন সরকারের বিপুল কর্মের তাগিদ। কলম আলি ঘুরতে ঘুরতে উঠল গিয়ে সরকারের পুনর্বাসন দফতরের এক ছাউনিতে। সেখানে অনেক কাজ। অনেক লোকের প্রয়োজন। কলম আলি চাকরি নিলে না। কাজ নিল।

BanglaBook.org

প্রথমে সে কাজ নিল কুলি সংগ্রহের। তারপর ভাঙা লোহা আর ইট সংগ্রহের। গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে কুলি, ইট, লোহা সংগ্রহের সাথে সাথে সে সংগ্রহ করত আর-একটি দ্রব্য যা তার উন্নতির পথকে সুগম ও দ্রুততর করতে সহায়ক হল। দুবছরের মধ্যেই কলম আলি প্রভূত অর্থের মালিক হল।

কিন্তু তার চাই যশ, মান, খ্যাতি। অর্থ হল সেই রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রথম ধাপ মাত্র। কলম আলি লাখ টাকার চেকবইটা বগলে নিয়ে চলে এল রাজধানীতে।

দুবছরে কলম আলি শুধু অর্থোপার্জন করেনি, অর্জন করেছে মহামূল্যবান অভিজ্ঞতা। এ-দুবছরেই সে জীবনের নানা চোরাগলিতে আনাগোনা করেছে। অনেক অপরিচিত পথের সন্ধান পেয়েছে। এক সময় যে-পৃথিবী ছিল অজ্ঞাত, স্বল্প সময়ে সে তার নিগূঢ় রহস্যের যবনিকা উন্মোচন করে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতায় তাকে আপন করে নিয়েছে। একদা দূর থেকে যে-পৃথিবী নবপরিণীতা বধূর ঘোমটা-টানা মুখের মতো আকর্ষণ করত সে-পৃথিবীকে সে সবল হস্তে টেনে নিল আপন মুঠিতে। আয়ত্ত করে নিল সে জগতের নিয়মকানুন, আচারবিধি। তা ছাড়া প্রাথমিক সাফল্য কলম আলির মনে এনে দিয়েছিল আত্মবিশ্বাস আর অদম্য উৎসাহ। মনের স্বাভাবিক স্পৃহার সাথে এই বিশ্বাস আর অভিজ্ঞতার সংযোগে কলম আলির রাজধানী-অভিসার সার্থকতায় ভরে উঠল।

রাজধানীতে তখন চলেছে তরুণমনের দক্ষযজ্ঞ; তারই মতো দুঃসাহস আর দূরাভিলাষের আগুনে তপ্ত অসংখ্য তরুণহৃদয় তখন রাজধানীর আকাশে স্বপ্নের ভেলা ভাসিয়েছে। মেঘের পাল তুলে সে-ভেলা দিকবিহীন পথে পাড়ি জমিয়েছে। এদের মধ্যে কলম আলি খুঁজে পেল তার আদর্শ পুরুষের সন্ধান। কলম আলি দেখল তারই মতো এরা নেশার আগুনে প্রজ্বলিত কিন্তু অদাহ্য মানবসন্তান। ঈপ্সিতকে করায়ত্ত করার জন্য এদের বুদ্ধি আর সাহসের অন্ত নেই। এরা আদর্শ সৃষ্টি করে সে-আদর্শ ভেঙে নতুন আদর্শের বুনিয়াদ রচনা করার জন্য, এরা রাজনীতি করে, সমিতি করে, জীবন নিয়ে জুয়া খেলে। রাজপথে এরা হাওয়ার বেগে চলে, সংকীর্ণ গলিতে এদের মোটরযান আটকে থাকে না।

এরা রাত্রির আড্ডায় বাজি ধরে সবকিছু খুইয়ে আবার সকালের অবসরে তার চেয়ে দ্বিগুণ সম্পদ ফিরিয়ে আনে। এরা জানে অর্থই প্রতিপত্তির চাবিকাঠি। তাই অর্থ আহরণে এদের নিত্যনব কৌশল। আর অর্থ আহরণের কৌশলে হাত পাকিয়ে মগজ খাটিয়ে এরা আর-একটি মহান সত্য আবিষ্কার করেছে। সেটি হল প্রভাব, অর্থ, যশ ক্ষমতা সবকিছুই গোড়ায় রয়েছে প্রভাব। তাই তারা কোটি টাকার বিনিময়ে প্রভাব দ্রব্যটি খরিদ করে আর এই প্রভাব একবার করায়ত্ত করতে পারলে চতুর্গুণ অর্থের সাথে সাথে যশ-প্রতিপত্তি সবই আপনাআপনিই করতলগত হয়। তাই পৃথিবীজয়ের মূলমন্ত্র হিসেবে এই নবআবিষ্কারকে তারা উন্নত করেছে। চর্চা করে, আরাধনা করে এর নব নব রূপ সৃষ্টি করেছে। বিস্ময়কর উদ্ভাবনী শক্তিতে এরা সর্বত্র নিজের প্রতিবিম্ব আবিষ্কার করেছে।

BanglaBook.org

রাজধানীতে এই নতুন সঙ্গীদের পেয়ে কলম আলির সাধনায় নতুনতর প্রেরণা সঞ্চারিত হল। এদের সাথে সে গেল রাজনীতির আসরে, জুয়ার আড্ডায় আর ফটকা বাজারের কুলীন আড্ডায়।

এদের চোখ দিয়ে পৃথিবীটাকে দেখতে গিয়ে সে এই সর্বপ্রথম উপলব্ধি করল এ-দুনিয়া সে যতটুকু জানে তার চেয়ে অনেক বড়। সে-দুনিয়ার বিপুলতর রহস্যের কণামাত্র সন্ধান এখনও সে পায়নি। অনুভব করল তার অভিজ্ঞতার সীমা কত ক্ষুদ্র। এমনকি তার উচ্চাভিলাষটিও অতিক্ষুদ্র আর হাস্যকরভাবে সীমিত। এক অভূতপূর্ব রোমাঞ্চ-অনুভূতিতে সে অভিভূত হল। এক অনাস্বাদিত জীবনের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সে নতুন স্বাদ পেল। আবাল্য স্বপ্নের রঙিন মোড়কে যে-ভবিষ্যৎকে কল্পনা করে এসেছে, সে-ভবিষ্যৎ বুঝি তার মুঠোয় ধরা দিল।

রাজধানীর মায়াজগতে কলম আলি চারটি বছর কাটিয়ে দিল। এ-চার বছরে জীবনকে সে হাতের তালুতে তুলে নিয়ে চেখে চেখে দেখেছে। যশখ্যাতি প্রতিপত্তির স্বর্ণশিখরে উঠতে না পারলেও সে তার স্বাদ পেয়েছে, দেখেছে তার মহিমা।

হঠাৎ একদিন অঘটনটি ঘটে গেল। অতি আকস্মিক আর অভাবনীয় দ্রুততার সাথে। ঘটনার পরম্পরা অথবা কার্যকারণ বিশ্লেষণ করে বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সম্ভব নয় তার কোনো সহজ বিবরণ উপস্থিত করা। কলম আলি অকস্মাৎ আবিষ্কার করল সে দেউলিয়া। ব্যবসায় পরপর বিরাট অঙ্ক লোকসান গেল। ব্যাংকের পাওনা আদায়ের জন্য যা অবশিষ্ট ছিল তাও নিলামে উঠল। বিপুল বেগে রাজপথে বিহার করতে করতে কলম আলি ছিটকে গিয়ে পড়ল রাজধানীর কোনো অ্যাডভেঞ্চারহীন ঘিঞ্জি গলির অজ্ঞাত কোণে। বাজি খেলতে এসে সে নিজেই বাজির হাতিয়ারে রূপান্তরিত হল।

এ-পর্যন্ত বলে অতীতস্মৃতির মধ্যে হারিয়ে যায় কলম আলি। হাঁটুর উপর কনুই ভর দিয়ে দুহাতের তালুতে মাথা রেখে চোখ বুজে সে হয়তো তার পরের ঘটনাগুলোর সূত্র ধরতে চেষ্টা করছে। মাঝে মাঝে হাতের আঙুলগুলো কানের পাশের কাঁচাপাকা চুলের আগায় ইতস্তত সঞ্চারিত হচ্ছে।

আমার কৌতূহলের মাত্রা বেড়ে চলল। একগুঁয়ে আর অতিমাত্রায় আত্মসচেতন লোকটির নতুন পরিচয়ে তার প্রতি আরও বেশি করে আকর্ষণ অনুভব করলাম। শুধু মুখের বিচিত্র ভঙ্গিতে আর চোখের ইশারায় এতদিন যার পরিচয় পেয়ে এসেছি, সে যে নিজমুখে নিজের সম্পর্কে এত কাহিনি এমন অকপটে বলতে পারে তা আমার ধারণার অতীত ছিল। কৌতূহলের সাথে সাথে একটি আপন মায়ার টানে ওর সাথে সম্পর্কটি যেন অধিকতর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। কিন্তু তাকে বুঝতে দিলাম না, কোথায় যেন আমার মর্যাদাবোধে বাধল। তাই খোলাখুলি মত প্রকাশ করতে গিয়ে বলেই ফেললাম, 'তুমি যে এতটা নীচ প্রকৃতির অপরাধী তা ভাবিনি।' অথচ এ আমার নিজের সাথেই মিথ্যা বলা। তার দোষগুণ

BanglaBook.org

বিচার করার আগেই তার প্রতি আকর্ষণ জন্মেছিল। নির্বান্ধব কারাগারে অযাচিত সহানুভূতি আর অকৃপণ সেবায় সে আমায় অনেক আগেই নিকটে টেনে নিয়েছিল।

আজ তার অ্যাডভেঞ্চারের ইতিবৃত্ত শুনে সে-আকর্ষণ তো বেড়েই চলল। কিন্তু আমার ভদ্রলোকি অহংকার এই সহানুভূতিকে নিজের মনের কাছ থেকেই গোপন করার জন্য ব্যগ্র হয়ে রইল। তাই সত্যটা যেমন আর সামনে স্বীকার করতে পারলাম না, তেমনি তাকে কোনো প্রশ্ন করার সাহসও পেলাম না। এই অ্যাডভেঞ্চারের সাথে স্ত্রীহত্যার সম্পর্কটা কোথায়! দেউলিয়া হওয়ার পর যে কী কারণে প্রশ্নগুলো মনে এল তাকে জিজ্ঞেস করতে কেমন যেন বাধল। নিজের হাতে আগুন জ্বেলে সে-আগুনে ঝাঁপ দিয়ে কাউকে পুড়ে মরতে দেখিনি। হিসেব করে ঠান্ডা মাথায় পদেপদে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায় এমন লোকের গল্প শুনেছি। স্বচক্ষে কোনোদিন দেখিনি। কিন্তু স্কুলমাস্টার কলম আলি, জুয়াড়ি আর রোমাঞ্চবিলাসী কলম আলির এ কী দুঃসাহসী নেশা? এ কী শুধু অর্থলিপ্সা? শুধু যশপিপাসা? অথবা বিকারগ্রস্ত মনের অপরাধপ্রবণতা? কে অধিকতর অপরাধী? স্ত্রীঘাতী কলম আলি, না নারীমাংসের কারবারি কলম আলি? অথবা জালিয়াত কলম আলি? কারাপ্রবাসের নির্জন কুঠুরিতে কতদিন এ-প্রশ্নগুলো নিজের সামনে তুলে ধরেছি। কলম আলির জীবনকাহিনি শোনার পরও সে-করুণ কাহিনির করুণতর সমাপ্তির প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পাইনি।

কিছুটা ওষুধের প্রভাব বাকিটা পদ্মার হাওয়ায় শরীরটা ভালোর দিকে। বৃষ্টির আষাঢ়ে জোর বর্ষণ ক্লান্তিতে নিস্তেজ হয়ে এসেছে। কখনও হঠাৎ উড়ে-যাওয়া পাখির মতো এক-আধ পশলা বৃষ্টি দেখা দিয়ে আবার উধাও হয়ে যায়। পূর্ণ রোদের তাপে তার স্পর্শটুকুও লেগে থাকতে পারে না কোনো ঝরাপাতার গায়ে।

বৃষ্টির মতো পাহাড়ি ঢলেও বুঝি বিরতির ঢিলেমি এসেছে। তাই পদ্মার খরস্রোতে কেমন নিস্তেজ আলস্য লেগেছে। বাতাসের চুম্বনে ছুটির দিনের আলস্য কৌতুকে সে ঈষৎ কেঁপে কেঁপে এগোচ্ছে। খানিক প্রশান্তি, খানিক মন্থরতা রাত্রি-জাগরণের পর সকালের তন্দ্রা বাড়বার মতো। বন্য পশুর হিংস্র গর্জনের মতো যে-বেপরোয়া সংগীত কাল পর্যন্ত অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর আশঙ্কাটা জাগিয়ে রাখত পারের অসহায় মানুষগুলোর বুকে, সে-রুদ্র কণ্ঠ আজ যেন কোন মায়াবীর জাদুমন্ত্রে বশীভূত। কলম আলি ইদানীং উপরে আসছে কদাচিৎ। হাসপাতালের বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা হবে। তা নিয়ে সে মহাব্যস্ত। সকালে আর বিকেলে বেড়াবার সময় তার সাথে চোখাচোখি হয়ে যায়। বাক্যবিনিময় হয় খুব কম। তার ফুরসত কোথায়? কিন্তু সেই অল্প কথার ফাঁকেও আমার প্রতি তার ভাবান্তরটা লক্ষ না করে পারলাম না। সে তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাবটা নেই। আমাকে অসংখ্য ছোট ছোট উপকারের ঋণে আবদ্ধ করে সে ঋণ স্বীকৃতির উৎকট প্রচেষ্টায় যেন ভাটা পড়েছে। নেই করুণামিশ্রিত গা-পোড়ানো অসহ্য দৃষ্টিটা। তার বদলে দূর থেকে

BanglaBook.org

কাজের ফাঁকে কদাচিৎ যে-দৃষ্টিটা সে দেয়, তাতে বন্ধুত্বের আশ্বাস আর স্নেহের উষ্ণতা আমায় বিস্মিত করল। সহজ হাসি তার মুখে কোনোদিন দেখিনি। তিন বছর আগেও ওকে দেখেছি। আজও দেখছি। ক্ষণিকের তরেও কোনোদিন আবেগ অনুভূতির ক্ষীণতম ছোঁয়া ওর মাঝে পাইনি।

সে দিনগুলো আজও আমার মন স্পষ্ট জেগে রয়েছে। শিলালিপির মতো বহু ঝড়ঝাপটা, বহু বিস্মৃতির স্তর অতিক্রম করে আজও গেঁথে রয়েছে মনের সংগোপনে।

দুর্লঙ্ঘনীয় নিয়মের সঙ্গিন উপেক্ষা করে ওর সাথে গল্প করার সুযোগ আর করে উঠতে পারিনি। দুপুরে বিশ্রামের অবসরে সে কখনও উঠে আসত উপরে। দু-চারটি সমাচার অথবা কুশলবার্তা বিনিময় করে নেবে যেত। কিন্তু তিন বছর পূর্বের আন্তরিক সম্পর্ক যে আমাদের মধ্যে আবার ফিরে আসছে তা আমরা স্পষ্ট বুঝলাম।

ওরা সেবা গ্রহণ করেছি বিনা দ্বিধায়। ওর কথার জবাব দিয়েছি আন্তরিক কোমল কণ্ঠে। যেদিন সে আসতে পারত না সেদিন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমায় দেখত। ওর নীরব চোখের ভাষায় যেন বলত সে, নাই-বা আমরা এক চৌকিতে বসলাম, তবু তোমাকে তো চিনেছি। দরদ আর সহানুভূতির সার্বজনীন এ-ভাষা বুঝতে আমার কষ্ট হত না। এভাবে আমার বিশ্রামের মেয়াদটা প্রায় ফুরিয়ে এল। হাসপাতাল ছেড়ে যথাস্থানে ফিরে যাবার পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। স্বইচ্ছায় যেখানে কাজ চলে না সেখানে এই পরমার্শ মেনে নেওয়া ছাড়া তো গত্যন্তর নেই।

কিন্তু আমি? আমি কি তাকে বুঝেছি বা চিনতে পেরেছি?

যাব-যাব করছি, এমন সময় একদিন শুনতে পেলাম কলম আলি খালাস পাবে। বুঝতে পারলাম না এমন কী হঠাৎ ঘটতে পারে যার ফলে কলম আলির বাকি দশ বছরের দণ্ড এক নিমেষে ফুরিয়ে গেল? কথাটা মুখেমুখে সর্বত্র ছড়িয়ে গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটা কেউ বলতে পারলে না। বারান্দায় বারবার পায়চারি করে আর জানালায় উঁকি মেরে যা ও দু-একবার কলম আলির নজর টানতে পারলাম, কথা বলতে পারলাম না। হিসাবের কাজে সে বুঝি ডুবে রয়েছে। হাত নেড়ে সে জানিয়ে দিল এখনই উপরে এসে সে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করবে। কিন্তু গোটা সকালের মধ্যে তার ফুরসত হল না।

দুপুরে গোসল করতে নেমেছি নিচে। রান্নাঘরের পাশে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল কলম আলির সাথে। কতগুলো গ্যামাক্সিনের টিন বুকের কাছে দুহাতে চেপে ধরে সে যাচ্ছে অফিসের দিকে। ঐ অবস্থাতেই নিচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বলে গেল সংক্ষিপ্ত ঘটনাটি।

নোট জালের কারবারে তার সাথি ছিল ইয়াকুব আর ছমিরুদ্দিন। কলম আলির গ্রেফতারের পর ওরা ফেরার হয়ে যায়। কিন্তু পুলিশ নোট জালের এই

BanglaBook.org

নতুন কারবারটি সম্পর্কে তখনও ওয়াকিবহাল ছিল না। তাই কলম আলিকে তারা এ-ব্যাপারে ঘাঁটায়নি। হত্যার অপরাধেই তাকে ধরা হয়। সে-অপরাধেই ওকে সাজা দেয়। সেই ইয়াকুব হঠাৎ পাঁচ বছর পর কোর্টে আত্মসমর্পণ করেছে এবং জালিয়াতির অপরাধের সাথে সাথে কলম আলির স্ত্রীকেও খুন করেছে বলে স্বীকার করেছে। এই স্বীকৃতির ভিত্তিতে পুলিশ নতুন করে অনুসন্ধান চালায় এবং সেই অনুসন্ধানের ফলেই কলম আলির মামলা পুনর্বিবেচনার জন্য আদালতে ওঠে। আদালত কলম আলিকে খুনের অপরাধ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। নিঃসন্দেহে সুখবর। ওর কাঁধে সজোরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে আনন্দটা প্রকাশ করলাম।

কিন্তু তার পরের ঘটনাগুলো আরও আশ্চর্য, আরও অবিশ্বাস্য। নির্দিষ্ট মেয়াদের বহুপূর্বে এমন অপ্রত্যাশিতভাবে অনেকটা যেন দৈব কৃপায় মুক্তি পাওয়া মৃত ব্যক্তির জীবন ফিরে পাওয়ার মতোই অত্যাশ্চর্য ঘটনা।

এমন অকল্পনীয় মুক্তিতে আনন্দ-উল্লাসে কলম আলির উপচে পড়ার কথা। তার সাথিরা, হাসপাতালের রোগীরা এমনকি ওর সাথে সম্পর্কহীন অপরিচিত সাথিগুলোও আনন্দে আত্মহারা—তবু এমন আকস্মিক আর অভাবনীয়ভাবেও চিরদিনের জন্য ধিক্কৃত আর নিগৃহীত একটি লোক মুক্তি পেয়ে যেতে পারে। সেখানেই সকলের আশা। তাতেই সকলের আনন্দ।

আশ্চর্য! যাকে কেন্দ্র করে এই আনন্দ তার কোনো ভাবান্তর নেই। কলম আলির হাবভাব দেখে বোঝার উপায় নেই যে, সে খুশি হয়েছে বা দুঃখিত হয়েছে। কৌতূহলীদের কাছে এমনভাবে সে খবরটি পরিবেশন করে যেন তার হাসপাতালেরই কোনো একটি রোগীর আঙুলটা সামান্য একটু কেটে গিয়েছে অথবা কারো এক পাটি দাঁত তুলে ফেলার অপ্রীতিকর কাজটা তাকেই করতে হচ্ছে। অন্তত এ-খবরটির সাথে তার নিজের যে কোনো সম্পর্ক আছে সেটুকুও সে বুঝতে দিলে না কাউকে।

অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম কলম আলির দিকে। এত বড় খোশ খবরটিতেও যে-লোকের কোনো আনন্দ-উত্তেজনা নেই, সে হয় বিকৃতমস্তিষ্ক নতুবা দুরারোগ্য অপরাধী। কিন্তু কলম আলি বিকৃতমস্তিষ্ক নয়। বরাবরই দেখে এসেছি সে স্থিরমস্তিষ্ক, বুদ্ধিমান। তবে সে অপরাধী—খুনি এবং একাধিক অস্বাভাবিক অপরাধেই অপরাধী। তার আজকের আচরণকেও সেই অপরাধসুলভ মনের বিকৃত প্রকাশ বলেই তো ধরে নিতে হয়! তার সাথে দ্বিতীয়বার কথা বলার চেষ্টা বারবার ব্যর্থ হল। মনের মধ্যে একটি অসোয়াস্তি থেকে গেল। কলম আলি যদি স্ত্রীঘাতী না হয়, তবে সে অপরাধ স্বীকার করে এত বড় দণ্ড নিল কেন? ইয়াকুব এত বছর পর আত্মসমর্পণ করল কেন? স্বয়ং শার্লক হোমস ছাড়া এই রহস্যের উদ্‌ঘাটন আমার পক্ষে সম্ভব নয় একথা ভেবে মনকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলাম।

BanglaBook.org

কিন্তু আমার তো ক্ষমা চাওয়া হল না ওর কাছে! স্ত্রীঘাতী বলে যাকে ঘৃণা করে এসেছি, সে তো নিরপরাধ বলে সাব্যস্ত হয়েছে। যাকে সামান্যতম মানবীয় মর্যাদা দিতে গিয়েও মন বারবার বিদ্রোহ করেছে, বিবেকের অর্থহীন কৌলীন্যবোধে যাকে দূরে দূরে রেখেছি, সে নিরপরাধ লোকটির হাত ধরে মাফ নেবার সুযোগটা পেলাম না। তবু খুশি হলাম। খুশি হলাম এই ভেবে যে, বিকেলের মাঝেই লোকটি নির্জনপুরীর অভিশাপ থেকে মুক্তি পেয়ে পৃথিবীর উন্মুক্ত বায়ুতে নিশ্বাস টানবে, যে-পৃথিবীর নির্মল বাতাস আমার জন্য নিষিদ্ধ।

না-ই-বা বলা হল আমার মনের কথাগুলো। না-ই-বা জানা হল ওর মুক্তি-রহস্য।

দ্বিপ্রাহরিক ভোজনের পর একটু ঘুমের চেষ্টা করেছিলাম। হঠাৎ এক বিকট চিৎকারে হাসপাতালের দেয়ালগুলো কেঁপে উঠল। উৎকট, তীক্ষ্ণ চিৎকার শব্দতরঙ্গে মহাপ্রলয়ের আলোড়ন তুলে প্রাণী ও নিষ্প্রাণ জগতের যেন মৃত্যু ঘোষণা করেছে। সমস্ত হাসপাতালে লেগে গেল শোরগোল, দাপাদাপি, হৈ হামলা। ভয়ানক আতঙ্কে রোগীরা বিছানা ছেড়ে এদিক-ওদিক ছুটোছুটি করছে। কাচভাঙা, নিক্ষিপ্ত থালাবাটির ঝনঝন শব্দের সাথে মানুষের আর্তরব মিলে এক আতঙ্কিত আবহাওয়া।

সেই অস্বাভাবিক বিকট চিৎকার দুবার, তিনবার—আবার। বুঝতে ভুল হওয়ার কোনো কারণ নেই। এ-চিৎকারের সাথে আমার পরিচয় বহুদিনের। অসুস্থ মানুষের এই বীভৎস আর্তনাদ কত জায়গায় কতবার শুনেছি। কতদিন এ-চিৎকারে ঘুম ভেঙে চকিতে ভয়ে হাত গুটিয়েছি। কতদিন এ-আওয়াজে আমার কলজে চিরে রক্ত ঝরেছে। কত বিনিদ্র রজনী এ-আর্তনাদে আমার অন্তর আজও বিদ্ধ করে। চিনতে ভুল হয় না। ত্রস্ত পদে নিচে নেমে এলাম। দেখলাম ক্রুদ্ধ কলম আলির নীল শিরা ফুলে ফুলে ওঠা বাহুর আঘাতে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ছে মানুষগুলো। ডিসপেনসারির শিশি-বোতল, ওষুধের টিন, ভাঙা কাচ এদিকে-সেদিকে বিক্ষিপ্ত। হাতের কাছে যা-ই পাচ্ছে কলম আলি তাই দুমড়ে মুচড়ে ছুড়ে ফেলছে। আশেপাশে যাকেই পাচ্ছে তাকেই দুবাহুতে উপরের দিকে তুলে ছুড়ে মারছে দূরে! এই প্রলয়নৃত্যের সাথে সাথে চলছে উন্মাদ হুংকার, অশ্রাব্য গালি, যার অধিকাংশই অর্থহীন, দুর্বোধ্য। শুধু একটি কথাই বুঝতে পারলাম—খুনি, আমি খুনি, কে খুনি? কোনো ক্রোধান্বিত আত্মা আকাশের বজ্রকেও হার মানিয়ে প্রশ্ন করছে অপর কোনো অদৃশ্য আত্মাকে। সে-প্রশ্নে পৃথিবীর অনন্ত কালের বিষাদবহ্নি আর তীব্র খেদ। প্রশ্নটি হয়তো কলম আলির কিন্তু কণ্ঠস্বর তার নয়। পাতাল ফুঁড়ে সে-প্রশ্ন উচ্চারিত হচ্ছে কোনো অদৃশ্য বিচারকের উদ্দেশ্যে। কলম আলির ঘোলাটে চোখের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠলাম। উন্মাদের সমস্ত লক্ষণ সে-চোখে পরিস্ফুট। একবার যেন চোখে চোখ মিলে গেল। আমায় চিনতে পারল কি? কেবল মুহূর্তের জন্য। নিমেষের মধ্যেই

BanglaBook.org

কলম আলির দৃষ্টি সরে গেল নির্বিশেষ শূন্যতার দিকে। মনে হল পৃথিবীর সমস্ত বিদ্রূপ আর ব্যঙ্গ মিশিয়ে কলম আলি প্রশ্নটি করে গেল আমাকেই খুনি কে? আমার কাছেই কি সে জবাব চায়?

দুগন্ডা জোয়ানের সাথে এক ঘণ্টারও উপর ধস্তাধস্তি করে কলম আলির অবসন্ন দেহটি ঝুঁকে পড়লে সামনের দিকে। উন্মাদ কলম আলিকে পাঁজাকোলা করে ওরা নিয়ে গেল। শেষবারের মতো আমি চেষ্টা করলাম কলম আলির চোখের ভাষাটি পড়তে। কিন্তু চোখজোড়া তখন বন্ধ। শুধু ঠোঁটের কোণে মনে হল জেগে রয়েছে সেই কঠিন বিদ্রূপ আর কঠিনতর একটি প্রশ্ন—খুনি কে?

হাসপাতালের রং-করা পিঙ্গল দেয়ালেও যেন একই প্রশ্ন।

যে মাটির উত্তাপ কিছুক্ষণ পূর্বে উপরে উঠে গিয়েছে মেঘের বক্ষপিঞ্জর ভেদ করে, আবার সে-উত্তাপই ঝরে পড়ছে বৃষ্টিধারায়। পদ্মার বিদ্রোহী বুকে আজ কীসের এত প্রশান্তি?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

একই ছবির দুই পিঠ

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সমান প্রশস্ত ঘরখানি, বড় বড় জানালা, উঁচু উঁচু মজবুত দেওয়াল। জানালায় মোটা মোটা লোহার শিক। প্রথম নজরেই বোঝা যায় নবাবি আমলের কোনো নাচঘরকে ঘষেমেজে আধুনিক কায়দামাফিক অফিসঘর বানানো হয়েছে। ঘরের আসবাপত্র বাহুল্যবর্জিত, যা-কিছু সবই চকচকে ঝকঝকে। ঠিক মাঝখানটায় ইয়া লম্বা এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। দুপাশে চেয়ারের সারি। ঘরের তিন কোণে ইতস্ততভাবে ছড়ানো টেবিল, চেয়ার, আলমারি, ফাইলভর্তি শেলফ। চতুর্থ কোণটি সুন্দর বার্নিশ-করা সেগুন কাঠের পার্টিশান দিয়ে ঘেরা। ঘরের মধ্যেই আর-একটি ঘর, ছোট, দরজা-কপাট নেই। শুধু ঝুলছে বাদামি রঙের দামি সিল্কের পর্দা। পর্দার ঠিক উপরে কাঠের ফ্রেমে সাদা অক্ষর No admission। হয়তো অফিস-কর্তার খাসকামরা।

পড়ন্ত সূর্যের রক্তিম আভা ঘরময় ছড়ানো। দুটো বাড়ির পরেই জনবহুল বড় রাস্তা। কিন্তু রাজপথের কলকোলাহল এখানে পৌঁছায় না—কান পেতে শুনলে মনে হয় বহু দূরবর্তী একটি মৃদু গুঞ্জরণ মাত্র। মাঝে মাঝে শোনা যায় স্টুডিবেকার গাড়িগুলির আধুনিক হর্ন—মাউথঅর্গানের মিষ্টি সুরের মতো কানে বাজে।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের দুপাশে বসে আছেন মি. মজিদ, মি. হাতেম, মি. তালুকদার। মি. মজিদ পক্বকেশ বৃদ্ধ, চোখেমুখে অভিজ্ঞতার ছাপ। একটি মৃদু হাসি সবসময় লেগে আছে ঠোঁটের কোণে। মি. হাতেম মাঝবয়সি, কাঁচাপাকা চুল। সবসময়ই পান চিবুচ্ছেন। পানের পিকে দাঁতগুলোর উপর পড়েছে কটা রঙের মসৃণ আস্তরণ। হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন সযত্নে বার্নিশ করা। দেহটি সুঠাম শক্ত, পেশিবহুল। মি. তালুকদার তরুণ অফিসার। ছিপছিপে দোহারা চেহারা। ফিটফাট পোশাক-পরিচ্ছদ—জাপানি সিল্কের হাওয়াই শার্ট আর কর্ডের লালচে রঙের প্যান্ট। যাঁর যতটুকু পদমর্যাদা ঠিক ততটুকু দূরত্ব রেখে সবাই বসেছেন। বসার কায়দা, মুখাবয়ব আর কথার ভঙ্গি, সর্বোপরি ধূমপানের বহর

BanglaBook.org

দেখে সহজেই অনুমান করা যায় প্রধানকর্তা হলেন মি. মজিদ। মি. হাতেম এবং মি. তালুকদার যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানের অধিকারী।

তারপর?

মি. হাতেমের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয় মি. তালুকদারের দিকে।

মুখস্থকরা কবিতার মতো গড়গড় করে বলে যান মি. তালুকদার—গত তিন দিন ধরে সারা মহল্লা চষে বেড়ালাম, স্যার। আমি নিজে, দুজন সাবইন্সপেক্টর, চারজন এ. এস. আই. আর পনেরো/ষোলো জন কনস্টেবল নিয়ে চব্বিশ ঘণ্টা ওয়াচ করেছি। পাঁচ-ছয়টি জায়গায় কড়া পাহারা মোতায়েন হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদও করা হয়েছে কয়েকজনকে; তাতে কিছু ক্লু মিলেছে যদিও আসল লোকগুলোর হদিস এখনও কিছুই পাওয়া যায়নি। বোঝাই যাচ্ছে না Ring leader কে বা কারা? আবার অসুবিধা হল...

কথা শেষ করতে পারেন না মি. তালুকদার। তাঁর নজর পড়ে মি. হাতেমের মুখখানির দিকে। বিরক্তিতে মুখ বিকৃত করে বিড়বিড় করে কী যেন তিনি বলছেন। ঊর্ধ্বতন অফিসারের এই অসহিষ্ণুতার সাথে বহুদিনের পরিচয় তাঁর। তাই বিন্দুমাত্র অপ্রতিভ না হয়েই বলেন...স্যার?

বলছিলাম, অসুবিধাটা কী? তরুণ অফিসার তোমরা, তোমাদের মুখে বারবার এই 'অসুবিধার' কথা শুনে শুনে আমি রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছি। আমরা তো রিটায়ার্ড হতে চললাম। ডিপার্টমেন্ট চালাবার দায়িত্ব তোমাদেরই তো নিতে হবে। হ্যাঁ, তারপর?

সে-সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকুন, স্যার। ইনশাল্লাহ্ আমরা দায়িত্ব গ্রহণ করে কামিয়াব হতে পারব। তারপর মাথা চুলকিয়ে একটু ইতস্ততভাবে যোগ করেছেন—অসুবিধাটা হল স্যার, আশেপাশের লোকগুলো একটুও Co-operate করছে না। তা ছাড়া ফ্যাক্টরি-এলাকার মধ্যে ঢোকা সে তো রীতিমতো বিপজ্জনক ব্যাপার। কাল সন্ধ্যায় এস. আই. রেজ্জাক আর রহমান ওয়াচার বেদম মার খেয়েছে। রহমানের হাতটা বোধ হয় fractured হয়ে গেল। রেজ্জাকের চোট লেগেছে কোমরে। দুজনই এখন হাসপাতালে। অবশ্য তারা বড্ড tactless, একেবারে ধর্মঘটিদের আড্ডাতেই ঢুকে পড়েছিল। তা না হলে এমন ব্যাপার কখনওই ঘটতে পারত না।

এতক্ষণ চুপ করে শুনছিলেন মি. মজিদ। ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির ঢেউ খেলিয়ে মুরুব্বিয়ানা সুরে বললেন—কাঁচা, কাঁচা—একেবারে কাঁচা কাজ। বুঝলে তালুকদার, ওভাবে কাজ হাসিল হয় না। বরং নিজেরই বিপদ ডেকে আনা হয়। আমি তো গত পঁচিশ বছর ধরে ওদের deal করে আসছি। তাদের আমি চিনি। ওরা যখন মেতে ওঠে তখন কেউটের বাচ্চা—যাকেই সামনে পাবে ছোবল মারবে। এমন সময় কখ্খনো ওদের সামনে যেতে নেই।

BanglaBook.org

কথাগুলো বলে পরিতৃপ্তির নিশ্বাস টানেন মি.মজিদ। সস্নেহ দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন তালুকদারের উপর যেমন করে নূতন আবিষ্কারক পরম তৃপ্তিভরে তাকান তাঁর অর্বাচীন অ্যাসিসটেন্টের প্রতি।

জি স্যার।

ঘাড় কাত করে সায় দেন মি. তালুকদার।

আজ মিলের ম্যানেজার মি. রিদওয়ান আমার সাথে দেখা করতে এসেছিলেন। ধর্মঘটের এগারো দিন পেরিয়ে গেল, মি. রিদওয়ানকে রীতিমতো চিন্তিত দেখলাম। এখন একটা হেস্তনেস্ত করতেই হয়। না হলে ডিপার্টমেন্টের বদনাম হবে।

ঊর্ধ্বতন দায়িত্বশীল অফিসারের দৃঢ় মনোভাব ফুটে ওঠে মি. মজিদের কণ্ঠস্বরে। মুখে দুশ্চিন্তার কুঞ্চিত রেখা।

হ্যাঁ স্যার, একটা হেস্তনেস্ত এবার করতেই হয়, প্রথমে পাণ্ডাগুলোকে Pick up করা দরকার। বিনীতভাবে নিবেদন করেন মি. হাতেম। সম্মতির আশায় মি. মজিদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলেন—আপনি সেই রহিমকে চেনেন তো স্যার?

গত বছর যাকে আমরা reward দিয়েছিলাম সে তো?

জি হ্যাঁ? সেই ব্যাটাকে গতকাল পাকড়াও করেছিলাম।

আচমকা খুশির ঢেউ খেলে যায় মি.মজিদের মুখে—তারপর?

ব্যাটা আজকাল খুব চালাক হয়েছে। সহজে কি আর বলতে চায়? তবে আমি বের করে নিয়েছি কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য। সেই অনুযায়ী যা-যা বন্দোবস্ত করার তাও করেছি। আজকের মধ্যেই চাঁইগুলোকে ঘায়েল করার আশা রাখি।

সম্ভাব্য কৃতিত্বের উল্লাসে সর্বাঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে বলে যান মি. হাতেম।

That is right—টেবিলে থাপ্পড় মেরে চেঁচিয়ে ওঠেন মি. মজিদ। কিন্তু সেদিকে বিন্দুমাত্র নজর না দিয়ে আর-একটি পান মুখে পুরে দেন মি. হাতেম। পিক ফেলতে ফেলতে মি. তালুকদারকে লক্ষ্য করে বলেন—'এটাই হল সঠিক পন্থা। দ্যাখো না এবার বাছাধনরা যায় কোথায়? শিখে নাও, শিখে নাও এসব। সবসময় মনে রাখবে ওদের weak spotটি খুঁজে বের করতে হবে প্রথমে। আর সুযোগ বুঝে সেখানেই ঘা মারবে, দেখবে ব্যাটারা একদম কুপোকাৎ। এখানেই যাচাই হবে তোমাদের দক্ষতা, সহিষ্ণুতা, Presence of mind.

এমন সময় মিলিটারি কায়দায় স্যালুট দিয়ে তড়িদ্‌গতিতে ঘরে ঢোকেন ইন্সপেক্টর আজিজ। সঙ্গে দুজন লোক, হাতে লোহার বেড়ি, কোমরে দড়ি বাঁধা। নিয়ে এসেছি স্যার, ভীষণ হয়রানি পোহাতে হয়েছে। ধরার সাথে সাথেই ব্যাটারা চ্যাঁচামেচি, মারামারি বাধিয়ে দেয়। প্রায় শ'খানেক লোকও জমা করে ফ্যালে। বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করেও কোনো ফায়দা হয় না। জনা-পঞ্চাশেক গ্রেপ্তার করেছি। বাকিরা তাই দেখে ভয়ে পিঠটান দিয়েছে—অতিরিক্ত ক্লান্তিহেতু জোরে নিশ্বাস টানতে টানতে কথাগুলো বলেন আজিজ।

BanglaBook.org

চোখের ইশারায় তাঁকে বাইরে যেতে বলে মি. হাতেম এক মিনিট মুখ ঝুঁকিয়ে ফিসফিস করে পরামর্শ করে নেন মি. মাজিদের সাথে। তারপর বেরিয়ে আসেন ইন্সপেক্টর আজিজের পিছুপিছু।

ক্ষিপ্রগতিতে পাশের ফাইলটি টেনে নেন মি. মজিদ। দু-এক মিনিট ফাইলের উপর চোখ বুলিয়ে এক টুকরো সাদা কাগজে ঘসঘস করে কলমের আঁচড় বসিয়ে যান। কাগজটি মি. তালুকদারদের হাতে দিয়ে ব্যস্তসমস্ত কণ্ঠে বলেন—তুমি এখুনি কোতওয়ালি যাও। এই স্লিপটা ও.সি.-কে দেবে।

তারপর একটু ইতস্তত করে, খানিকটা চিন্তান্বিত মুখে প্রায় আপনমনে বলেন মৃদুস্বরে—This is wrong, এতে বারুদে আগুন লাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই হবে না। হ্যাঁ—তুমি গিয়েই ঐ পঞ্চাশজনকে এখুনি ছেড়ে দেবার বন্দোবস্ত করো। তাদের উপর যাতে কোনো দুর্ব্যবহার না হয় তাও দেখবে।

স্যালুট দিয়ে বিদায় নেন মি. তালুকদার। হাতকড়া বাঁধা লোক দুটির আপাদমস্তক একবার তির্যকদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে মি. মজিদ বেরিয়ে আসেন বারান্দায়—যেখানে অপেক্ষা করে আছেন মি. হাতেম ও ইন্সপেক্টর আজিজ। নিচুকণ্ঠে সলাপরামর্শ চলে কিছুক্ষণ। হাত নেড়ে নেড়ে ঈষৎ উত্তেজিত ভাষায় বয়ান করেন ইন্সপেক্টর আজিজ তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের কাহিনী। চোখেমুখে উপচে পড়ছে সাফল্যের আনন্দ। তাঁর কাঁধে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলেন মি. মজিদ, well done আজিজ well done।

একটু আগেও যে-মুখ দুশ্চিন্তায় বারবার কুঞ্চিত হয়ে উঠছিল সে-মুখে এখন প্রশান্তির ছায়া। আনন্দিত হয়েছেন মি. মজিদ। তাঁর ডিপার্টমেন্টের সুনাম অক্ষুণ্ন থেকেছে। পরামর্শ শেষ করে হালকা কৌতুকের ঢেউ তুলতে তুলতে তাঁরা ফিরে আসেন কামরায়।

লোকদুটি তেমনি নীরবেই বসে আছে—অন্যদের উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্বিকার উদাসীন ভাব নিয়ে। পুরানো ফাইলের সোঁদা গন্ধ, আয়নার মতো তকতকে ফার্নিচারগুলো, মার্বেল পাথরের মেজের মোলায়েম স্পর্শ সবই যেন তাদের বোধের অতীত, ভারী জুতোর থপ থপ আওয়াজ তুলে ইতস্তত চলমান হাজারমণি অফিসারদের লাখমণি ব্যক্তিত্বও তাদের নাড়া দেয় না।

মাঝে মাঝে কৌতূহলী দৃষ্টি তুলে দেখছে এটাসেটা। বিশেষ কোনো দিকেই নজর নিবদ্ধ থাকছে না। মুখের নিশ্চুপ ঔদাসীন্যের আড়ালে অবজ্ঞার আভাস সুপরিস্ফুট।

লোকদুটির হাতকড়া খুলে দিয়ে, ডানদিকের লোকটিকে নিয়ে যায় ওরা ঘরের বাইরে।

মি. হাতেম উঠে ঘরের সব কয়টি বাতিই জ্বালিয়ে দেন। বিজলিবাতির চোখ-ধাঁধানো আলোতে লোকটি যেন নিজের মধ্যেই গুটিয়ে যায়। ভাববিহীন মুখটি কেমন ফ্যাকাশে।

সিগারেট?

BanglaBook.org

হাত বাড়িয়ে একটি সিগারেট তুলে নেয় লোকটি। জ্বলন্ত কাঠিটা মুখের কাছে নিতেই মুখ থেকে পড়ে যায়, ঠোঁট দুটি যেন কাঁপছে। ঈষৎ কম্পিত হাতে সিগারেটটা তুলে নিয়ে কোনোরকমে জ্বালিয়ে নেয়। অজানা আশঙ্কার দুরু দুরু করে বুকের ভেতরটা।

তোমার নাম ইসহাক না?

হ্যাঁ।

মুদু জবাবটি যেন আটকে যায় গলার মাঝপথে।

তুমি তো স্ট্রাইক কমিটির মেম্বার?

মুহূর্তের জন্য লোকটি কেঁপে ওঠে। বিস্ফারিত দৃষ্টি মেলে তাকায় প্রশ্নকর্তার দিকে। কিন্তু কোনো উত্তর দিতে পারে না।

আমরা জানি তুমি স্ট্রাইক কমিটির মেম্বার এবং গোপন লোকদের সাথে যোগাযোগ তুমিই রাখতে—কী বলো?

লোকটি এবারও নিরুত্তর।

বলো! চুপ করে রইলে যে?

তবুও জবাব আসে না।

চুপ করে থাকলে তো চলবে না। বলো।

বজ্রহুংকার চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে ঘরময়।

উলটো দিক থেকে এবারও কোনো সাড়া আসে না।

আচমকা পরপর দুটো ঘুসি এসে পড়ে তার মুখে। নিচের ঠোঁটটি যায় থেঁতলে। এক টুকরো মাংসপিণ্ড ঝুলে থাকে নিচের দিকে। শালা কথা বলে না কেন? মি. হাতেমের সরোষ গর্জনের প্রতিধ্বনি আছড়ে পড়ে বাতাসে ভয়াল প্লাবনের সর্বগ্রাসী তরঙ্গশ্রেণির মতো। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে লোকটি।

আহা—মারো কেন?

কৃত্রিম প্রতিবাদ মি. মজিদের।

শোনো, আমরা তোমাদের সব খবরই রাখি। কাজেই চুপ করে থেকে কোনো ফল হবে না, বরং যা যা জান বলে দাও। তোমার ভালোর জন্যই বলছি।

দরদভরা আওয়াজে লোকটির দিকে এগিয়ে এসে বলেন মি. মজিদ।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। লোকটি পকেট থেকে ময়লার পুরো পর্দায় আবৃত রুমালখানি বের করে নেয়, আস্তে আস্তে বুলোয় থেঁতলানো ঠোঁটের উপর। অজানা আশঙ্কায় চুপসে যায় লোকটি, ভীরু বিহ্বল মুখখানি নেতিয়ে পড়ে কোনো আশ্রয়ের প্রত্যাশায়। ওদের কারো দিকে তাকাবার ভরসা সে পায় না। ঠোঁটের উপর রুমালখানি চেপে ধরে চেয়ে থাকে শ্বেতপাথরের মেঝের দিকে।

চা খাবে, চা?

নীরবতা ভঙ্গ করেন মি. হাতেম। চাপরাশিকে হাঁক দিয়ে অর্ডার দেন চা-বিস্কুটের।

BanglaBook.org

নিজের চেয়ারটা একেবারে লোকটার কাছে টেনে এনে বলেন মি. মজিদ—সোজা কথাটা তোমায় বলছি—শোনো—আমরা তোমায় ছাড়ছি না সহজে। তোমার গত এক বছরের কার্যকলাপের কিছুই আমাদের অজানা নেই। তাই যদি বাঁচতে চাও তো আমার উপদেশটা শোনো। তোমার চাকরি তো থাকবেই, ইচ্ছা করলে তুমি foreman-ও হয়ে যেতে পার।

তারপর একটু কেশে চোখের চশমাটা টেবিলের উপর রাখতে রাখতে বলেন, তোমার বউ আছে, দু-তিনটা বাচ্চা রয়েছে। এদের দিকেও তো তোমার তাকানো দরকার? তুমি যদি জেলে গিয়ে পচতে থাক তা হলে এই বেচারিরা তো না-খেয়েই মরবে,...

চা এসে যায়। একটি কাপ লোকটির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে মি. হাতেম মুখ বাড়িয়ে তেমনি মৃদু কণ্ঠে আবেদনের স্বরে বলেন, সত্যই তো, পরিবারের প্রতি লক্ষ রাখা সবারই পবিত্র কর্তব্য।...এক্ষেত্রে সবই নির্ভর করছে তোমার উপর। এতগুলো জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে শুধু তোমার একটি জবাবের উপর, হ্যাঁ। অবশ্য আমরা জোরজবরদস্তি কিছুই করব না।

আচ্ছা এবার বলো।

সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে উত্তরের জন্য।

হ্যাঁ, আমি স্ট্রাইক কমিটির মেম্বার।

স্ট্রাইক কমিটিতে ক'জন আছ?

পনেরোজন।

তুমি কি...?

হ্যাঁ, আমি ছিলাম তবে ঐসব এখন বিশ্বাস করি না।

তা-ই নাকি—কেন?

নিজের ধান্ধাতেই ব্যস্ত। ঐসব পোষায় না।

ছেড়ে দিয়েছ?

না, এখনও সম্পূর্ণ ছাড়িনি। দলের খাতায় আমার নাম রয়েছে।

স্ট্রাইক কমিটিতে তোমার দলের কজন আছে?

চারজন—রশিদ, হাসান, আকবর, জুম্মন।

ওদের একটা কারখানা কমিটি আছে না?

হ্যাঁ, রশিদ তার সেক্রেটারি।

তুমি কি কমিটির মেম্বর?

না, তবে আমাকে মাঝে মাঝে কমিটির সভায় ডাকে।

তোমার যেমন ইচ্ছে তেমন বলো, তবে তোমার ছেলেমেয়ের দিকে তাকিয়েই আমরা বলছিলাম...সাহায্য করতে চাই আমরা তোমায়। তার বিনিময়ে তোমার কাছ থেকেও সাহায্য আশা করি।

কথাগুলো শেষ করে মি. মজিদ হাতখানি রাখেন লোকটির কাঁধের উপর সোহাগের ভঙ্গিতে। মি. হাতেম আর এক কদম বাড়িয়ে লোকটির বাজুতে এক

BanglaBook.org

ঝাঁকুনি দিয়ে কপালে অজস্র রেখার কুঞ্চন তুলে জিজ্ঞেস করেন, তোমার বউ, তোমার ছেলেমেয়েদের কথা কি তুমি ভাব না?

লোকটা এদিক-ওদিক তাকায় তেমনি বোকা-বোকা দৃষ্টি মেলে। ওদের কারো দিকে চোখ তুলে চাইতে সাহস হয়তো পায় না, হয়তো ভয় করে। বুকের দুরুদুরু কম্পন বোধ হয় এখন থেমে গিয়েছে। কিন্তু চরম হতাশা অসহায় ভাব ফুটে উঠেছে মুখের প্রতিটি রেখায়। ওদের এক-একটি প্রশ্নে লোকটি চমকে ওঠে, ভ্রূ কুঁচকে মুখ ফিরিয়ে চায় উলটোদিকে। অবাক লাগে তার। এরা তা হলে সবই জানে? এতসব কথা ওরা কেমন করে জানল?...বানিয়ে বলছে?...তা-ইবা কেমন করে হয়? তবে? তবে কী?

তুমি মাইনে কত পাও। হঠাৎ প্রশ্ন করেন মি. হাতেম।

পঞ্চাশ টাকা মাসে।

এই তো দ্যাখো-না! মাত্র পঞ্চাশ টাকা? এতে কি হয়?...তুমি যদি চাও আমরা তোমার ভালো আয়ের বন্দোবস্ত করে দিতে পারি—কোনো অভাব তোমার থাকবে না, বিশেষ কিছুই তোমাকে করতে হবে না...মাঝে মাঝে একটু খবরাখবর। আর যেসব খবর দিলে তোমার ক্ষতি হতে পারে ভাব সেইসব তুমি দেবে না। আমরাও চাইব না।

আর-একবার চমকে ওঠে লোকটি।

ব্যাপারটি একেবারেই গোপন থাকবে—কেউ জানবে না।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিয়ে একটি সিগারেট ধরিয়ে নেন মি. মজিদ। একটি সিগারেট গুঁজে দেন লোকটির হাতে। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছাড়তে ছাড়তে চেয়ে থাকেন লোকটির দিকে। স্থির, প্রশান্ত অর্থপূর্ণ সে-চাহনি। লোকটি অসহায় অস্বস্তিতে গুটিয়ে যায় নিজের মধ্যে। মি. মজিদের চোখ তাকে কী দেখছে এত? মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত নিরীক্ষণ করছে। একবারও কি মি. মজিদ চোখ ফেরাবেন না অন্য দিকে? তা হলে সে আরাম করে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসতে পারত। না, তা হবার জো নেই। মি. মজিদ তাকে দেখছেন, অভিজ্ঞ জহুরি যেমন করে বারবার নেড়েচেড়ে দেখে পরখ করে উলটিয়ে পালটিয়ে কোনটা নকল আর কোনটা আসল হীরে।

নাঃ, একটু হাঁপ ছাড়তেও পারছে না সে, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে নাকি? নিজের নিশ্বাসের শব্দে নিজেই সে চমকে ওঠে। এক মুহূর্তের জন্য মি. মজিদের চোখে চোখ পড়ে যায় লোকটির। অমনি দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয় সে—আতঙ্কে, এক ভয়ংকর হিমেল স্পর্শে কেঁপে ওঠে দেহমন। মি. মজিদের দৃষ্টি স্থির নিষ্পলক—বুঝে নিতে চায়, স্পষ্ট করে দেখে নিতে চায়, যাচাই করে নিতে চায় লোকটির মনের কথা। এ-দৃষ্টি অর্থপূর্ণ, অব্যর্থ শিকারির তীক্ষ্ণ সন্ধানী দৃষ্টি লোকটির হাতে কাঁপুনি ধরিয়ে দেয়।

কী করবে সে? সবকিছুই যেন তালগোল পাকিয়ে গিয়েছে তার মাথায়। কিছুই সে ভাবতে পারছে না। ভয় পেয়েছে সে? বোধশক্তি লোপ পেয়েছে?

BanglaBook.org

হাতের লোমগুলো খাড়া হয়ে গিয়েছে? শরীরের রক্তকণিকার গতি মন্থর হয়ে এসেছে? সে ঘামছে। মি. মজিদ কি এসব বুঝতে পারছেন? তার ভীতিবিহ্বল চাহনি অস্বস্তিকর, ফ্যাকাশে মুখে আতঙ্কের ছায়া—এ সবই কি গোপন থেকে যাচ্ছে মি. মজিদের অন্তর্ভেদী দৃষ্টির সম্মুখে?

মিষ্টি হাসির তরঙ্গ খেলে যায় মি. মজিদের ঠোঁটের উপর, যেন সবই তিনি বোঝেন, কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। চোখদুটি লোকটির মুখের উপর তেমনি স্থির নিবদ্ধ রেখে, কণ্ঠে সহানুভূতির সুর মিশিয়ে বলেন তিনি—অবশ্য Politics তুমি করতে পার, ট্রেড ইউনিয়নে তুমি থাকতে পার। তাতে বরং ভালোই হবে—তোমারও—আমাদেরও। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তুমি পাবে। কোনোপ্রকার বাধ্যবাধকতাই আমরা আরোপ করব না।

উৎসাহ উপচে পড়ে শতধারায় মি. হাতেমের মুখে—

বুঝতে পারছ না? এক বছরের মধ্যেই তুমি হয়ে যাবে কেউকেটা—দেখবে সমস্ত Field-ই তোমার। কত মান কত মর্যাদা! সবই কিন্তু নির্ভর করছে শুধু তোমার মুখের একটি কথার উপর।

অন্তরঙ্গ হতে চেষ্টা করেন মি. হাতেম, আরও কাছে গিয়ে একটি হাত রাখেন লোকটির কাঁধের উপর। প্রত্যাশিত দৃষ্টি তাঁর।

আচ্ছা, গত বুধবার সন্ধ্যার সময় তুমি কোথায় গিয়েছিলে?—ওই জামালপুর এলাকায়?

এক মুহূর্তের জন্য চমকে কেঁপে ওঠে বিজলি তারের ছোঁয়া-খাওয়া কাকের মতো। আধময়লা, ছেঁড়া কোটের পকেটে হাতগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে কোনোরকম সামলে নেয়।

চমকে উঠলে যে? কোন বাড়িতে, কার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলে সে তো আমরা জানি। তোমরা চারজন ছিলে সে মিটিঙে—না?

কুটিল হাসি মি. হাতেমের মুখে।

আশ্চর্য হয়ে যায় লোকটি। সংশয়বিহ্বল মনে সবকিছুই তার ওলটপালট হয়ে যায়। এত কথা এরা জানে? কী করে এসব জানল তারা? নানা সন্দেহ উঁকি মারে তার মনে।

তাকে আরও আশ্চর্যান্বিত করে বলেন মি. হাতেম—তোমারই ছদ্মনাম রহিম—অস্বীকার করতে পার?

বিদ্রূপ ঠিকরে পড়ে মি. হাতেমের কণ্ঠস্বরে।

একটু নড়েচড়ে বসে লোকটি। সহজভাবেই তাকায় তার প্রশ্নকর্তাদের দিকে। নিজেই হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট তুলে নেয় মি. মজিদের পকেট থেকে।

দেখতেই তো পারছ, সবই আমরা জানি। তুমি আর কী লুকোবে!

নাছোড়বান্দা মি. হাতেম। এক ঢোক পানের পিক গিলে গলাটি সাফ করে বেশ নির্লিপ্তভাবেই বলে চলেন—আমাদের সাথে তো আর জিন-পরী নেই।

BanglaBook.org

তোমাদের মধ্যেই আমাদের লোক আছে। তারাই এসব খবর দেয়। তুমি যেসব খবর লুকোবে ভাবছ সেসব হয়তো আগেই আমাদের জানা আছে।

আবার চা আসে। তার সাথে আসে কেক, চপ, ডিম। মি. হাতেম নিজেই খাবারের প্লেট এগিয়ে দেন লোকটির দিকে সযত্নে। চোখের ইশারায় কী যেন কথা হয়ে যায়। মি. হাতেম দলবল নিয়ে বেরিয়ে যান। ঘরে থাকে শুধু মি. মজিদ আর লোকটি।

অনেকগুলো দশ টাকা পাঁচ টাকার নোট, কিছু খুচরো পয়সা আর রুপোর টাকা ছড়িয়ে রাখেন মি. মজিদ টেবিলের উপর, যেন কিসের হিসাব মেলাচ্ছেন। কয়েকটা দশ টাকার নোট তিনি আলাদা করে রাখেন একপাশে। একবার লক্ষ করেন আহাররত লোকটিকে। হঠাৎ পৃথক করে রাখা নোটগুলো গুঁজে দেন লোকটির হাতে। হতচকিত হয়ে যায় লোকটি এক মুহূর্তের জন্য। কড়কড়ে নোটগুলো লেপটে থাকে তার হাতে।

এই কমিটি সভায় কমিটির বাইরের কোনো লোককে তুমি কখনও দেখেছ?

হ্যাঁ, রউফ সাহেব। তিনি শহর কমিটির সেক্রেটারি, তাঁর অনুপস্থিতিতে শহর কমিটির কোনো-একজন উপস্থিত থাকতেন।

ঐ যে খাইবার ফার্মেসিতে কাজ করে সেই রউফ তো?

না, ইনি সংবাদপত্র অফিসে চাকরি করেন।

ওহ্ হো চিনেছি—রানীবাজারে তার বাসা। তার বউটিও তো তোমাদের কাজ করে, না?

হ্যাঁ, তিনি সভ্যা।

তোমার বাড়ির পাশে যে-স্কুলমাস্টারটি থাকে, নাম আশরাফ—সে কি শহর কমিটির মেম্বর?

জানি না—

ভাগ ব্যাটা, মিথ্যে কথা বলছিস কেন?—তুই জানিস না? তার বাসায় তুই এই সেদিনও তো গিয়েছিলি?

হঠাৎ এমনধারা চড়া মেজাজে ভড়কে যায় লোকটি। একটু ঢোক গিলে বিড়বিড় করে বলে, তা হতে পারে বোধ হয়—

বোধ হয় মানে? শালা আবার লুকাচ্ছিস?

আশরাফ শহর কমিটির তরফ থেকে তোদের ফ্যাক্টরি কমিটির মিটিঙে আসেনি? আমি জানি এসেছিল,—ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় লাল হয়ে ওঠে মি. মজিদের মুখ।

মাটির সঙ্গে মিইয়ে গিয়ে উত্তর দেয় লোকটি—তা, দুএকবার মাত্র তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল।

মাস্টারের মামাতো ভাই ফজলু ব্যাটাও তো স্ট্রাইকের একটা পাণ্ডা, না?

হ্যাঁ, সংক্ষিপ্ত উত্তর লোকটির।

BanglaBook.org

পার্শ্ববর্তী গির্জার ঘড়িটি ঢং ঢং করে ঘোষণা করে রাত দশটা বেজে গিয়েছে। ঘরটি তখন জনশূন্য। চারিদিকের অখণ্ড নীরবতার মাঝে শক্তিশালী বিজলি-বাতিগুলোকে ঘিরে ধরেছে পতঙ্গবাহিনী। ভেজানো দরজাটায় সজোরে ধাক্কা মেরে প্রবেশ করেন মি. মজিদ ও মি. হাতেম। গদিআঁটা চেয়ারে দেহটা এলিয়ে দেন মি. মজিদ—ওহ্ বড্ড বেশি খাওয়া হয়ে গিয়েছে। আধজ্বলা সিগারেটটি বৃত্তাকারে বাইরে নিক্ষেপ করে বলেন—যাক, বিকেলটা একেবারে মাটি হয়নি। একটা definite achievement, কী বলেন?

ঘাড় নেড়ে সায় দেন মি. হাতেম—এখন বাকিটাকে কাবু করতে পারলেই হয়।

পাশের দেরাজ থেকে একটা ফাইল টেনে মনোনিবেশ করতে চেষ্টা করেন মি. মজিদ। হঠাৎ বিরক্ত ভয়ে ফাইলটি ঠেলে রাখেন একপাশে। ঝুঁকে পড়ে বলেন মি. হাতেমকে উদ্দেশ করে—এসব ভালো লাগে না আর। বাইশটি বছর কাটিয়ে দিলাম ফাইল ঘেঁটে ঘেঁটে আর মানুষ ঠেঙিয়ে। এখন একটু বিশ্রাম চাই।

সে তো ঠিকই। এই বুড়ো বয়সে শরীর একটু আরাম-আয়েশই চায়।

দরদভরা কণ্ঠ মি. হাতেমের।

সেকথা বলে কী লাভ? আরাম-আয়েশ কি আর কপালে আছে! ভেবেছিলাম পেনশনটা নিয়ে গ্রামের বাড়িতে চলে যাব। বড় ছেলে এদিকের সব বুঝে শুনে সামলাবে। কিন্তু সেও তো মেতেছে পলিটিক্সে। এই তো সেদিন ছমাস জেল খেটে বেরিয়ে এল। কত বোঝালাম, ওরা মা কত কান্নাকাটি করল—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। সেদিন বের করে দিয়েছি বাড়ি থেকে। অবশ্য এতে যে কোনো ফল হবে না তাও বুঝতে পারছি।

গভীর বেদনায় ভারী হয়ে আসে মি. মজিদের গলার আওয়াজ।

সান্ত্বনা দেন মি. হাতেম। অত ভেঙে পড়লে আপনার চলবে কেন? তা ছাড়া তরুণ বয়সে আজকালকার প্রায় সব ছেলেমেয়েই একআধটু পলিটিক্স করে—মানে হুজুকে মাতে, রক্ত গরম থাকে কিনা! কিছুদিন হৈচৈ করে আবার য়েয়সা-কে-তেয়সা। এরকম কত দেখলাম!

এমন সময় দ্বিতীয় লোকটিকে নিয়ে ঘরে ঢোকেন মি. তালুকদার ও আরও কয়েকজন জুনিয়ার অফিসার।

কিছুই যে বলছে না স্যার। একেবারে মুখে ছিপি এঁটে বসে আছে। ব্যর্থতায় মিইয়ে-পড়া সুর মি. তালুকদারের কণ্ঠে।

পিঠকুঁজো লোকটি চেয়ারে বসেই হাতের কাছে টেবিলের উপর ছড়ানো দৈনিক পত্রিকাটি টেনে নেয়। অন্যদের উপস্থিতিকে তেমন গ্রাহ্য না করেই মনোনিবেশ করে সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায়। প্রথম নজরেই ঢোলা পাঞ্জাবির আবরণ ভেদ করে মাংসবিহীন চর্মসার শীর্ণ দেহটি চোখে পড়ে। ভাবতে হয় একবার কেমন করে সে চলাফেরা করে এত শীর্ণ দেহ নিয়ে। তার রক্তবিহীন পাণ্ডুর মুখে ক্লান্তির ছাপ সুগভীর। গালের অস্বাভাবিক উঁচু হাড় দুটির মাঝে হলদেটে

BanglaBook.org

চোখগুলো জ্বলজ্বল করছে কী এক অদৃশ্য আলোকশক্তিতে। সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা কপালের সাথেই হয়তো সামঞ্জস্য রেখে ছোট নাকের ডগাটা চ্যাপটা হয়ে বসে গিয়েছে।

একটু পানি খাব—পত্রিকাটি একপাশে ঠেলে রেখে বলে লোকটি। পানি খেয়ে পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে নেয়। দিয়াশলায়ের জন্য এ-পকেট সে-পকেট হাতড়িয়ে নিরাশ হয়ে টেবিলের উপর রাখা মি. মজিদের দিয়াশলাইটাই হাত বাড়িয়ে তুলে নেয়। বিড়ি জ্বালিয়ে তেরছাভাবে মাথাটা এলিয়ে দেয় চেয়ারের হাতলের উপর—ধোঁয়া ছাড়তে থাকে নির্লিপ্তভাবে যেন পৃথিবীতে এটাই একমাত্র করণীয় কাজ।

কী নাম? মুখে দোক্তা পুরতে পুরতে জিজ্ঞেস করেন মি. মজিদ।

এক ঝাপটায় ক্লান্তির অবসাদ ঠেলে দিয়ে নীতিদীর্ঘ হাই তুলে লোকটি সোজা হয়ে বসে। নাম না জেনেই কি আর ধরেছেন?

ত্যাড়া কথা বলে দেখি?

লোকটির শ্রীহীন পাংশুটে মুখের দিকে একপলক তাকিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বলেন মি. মজিদ।

তুমি কর কী?—দেখুন 'তুমি' বলবেন না। আমাকে 'আপনি' বলেই সম্বোধন করুন—ঝাঁজালো কণ্ঠস্বর লোকটির।

টেবিলের উপর সজোরে থাপ্পড় মেরে তেড়ে আসেন মি. তালুকদার।

Oh no. Don't be Silly—হাত বাড়িয়ে তাঁকে নিবৃত্ত করেন মি. মজিদ।

'বেশ বেশ', যেন খুশি হয়েছেন এমনি খোশ মেজাজে মাথা দুলিয়ে ঠোঁটের কোণে তির্যক হাসির লহর তুলে বলেন মি. মজিদ—আপনি একজন ট্রেড ইউনিয়নিস্ট আর আমি একজন পাবলিক সার্ভেন্ট। আপনার আমার মধ্যে কোনো ব্যক্তিগত ঝগড়া বা বিরোধ নেই, থাকতে পারে না। কী বলেন?

কোনো উত্তর না পেয়ে হয়তো আরও উৎসাহিত হলেন তিনি—But we can be friends, আমি আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারি। আপনিও আমাকে সাহায্য করতে পারেন, যদি আপনি তা ইচ্ছা করেন।

কী আবোলতাবোল বকছেন—চিৎকার করে ওঠে লোকটি।

Hopeless—বিরক্ত সুরে ঝাঁজিয়ে ওঠেন মি. মজিদ। রুপোর তৈরি পানের কৌটাটা হাতে নিয়ে দুআঙুলে তালি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে যান জানালার দিকে। আধ-ভেজানো জানালাটা খুলে দিয়ে আবার এসে বসেন লোকটির প্রায় গা-ঘেঁষে টেবিলের কোনায়। যেন গভীরভাবে অনুতপ্ত এমনি শান্ত স্বরে বলেন—দেখুন আমজাদ সাহেব, আপনি বোধ হয় আমাকে ভুল বুঝেছেন। আমি যা বলতে চেয়েছিলাম—I am eager to help you, সত্যি বলছি আমি আপনাকে সাহায্য করতে পারলে খুশি হব। But...

সোজা চোখে চেয়ে থাকেন মি. মজিদ। নাঃ, লোকটার চোখেমুখে এতটুকুও পরিবর্তনের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। তেমনি নির্লিপ্ত মুখের ভাব। কোনদিকে যে

BanglaBook.org

তাকিয়ে আছে অনুধাবন করেও তা বলা মুশকিল। শুধু নজরে পড়ে প্রবল প্রচেষ্টায় চেপে রাখা দুটি ঠোঁটের কোণে ঈষৎ কুঞ্চন। আগের কথারই জের টেনে বলেন মি. মজিদ—But you must reciprocate—সাহায্যটা সব সময়ই mutual, কী বলেন? খুবই সম্মানজনক প্রস্তাব। নয় কি?

এত সুন্দরভাবে কথাগুলো বলতে পেরেছেন হয়তো সেই আনন্দেই একঝলক মিষ্টি হাসি খেলে যায় তাঁর মুখে। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করেন অপরদিক থেকে অনুকূল ইঙ্গিতের। উত্তর আসে—আপনার কথার একবিন্দুও আমি বুঝতে পারলাম না।

ও! বুঝতে পারলেন না? all right, you will be made to understand very soon.

উত্তেজনা চাপার প্রচেষ্টায় কিছুটা রুক্ষ ঠেকে মি. মজিদের কণ্ঠস্বর।

এই যে এখানে যেসব প্রশ্ন লেখা আছে তার ঠিক ঠিক জবাব আপনার কাছ থেকে চাই।

বিস্ময়ের সঙ্গে কাগজগুলো উলটিয়েপালটিয়ে দ্যাখে লোকটি। মুখে কৌতুকের একটুখানি রেখা দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায়, উত্তর দেয় :

কী, পলিটব্যুরো কাকে বলে, সিন্ডিক্যালিজম ও সোশ্যালিজমের পার্থক্য—এসব প্রশ্নের উত্তর আপনার সাম্যবাদী যে-কোনো পুস্তিকায় পাবেন। বাকি প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে আমি অসমর্থ।

You will have to answer—সোজা ধমক দেন মি. হাতেম।

এক মুহূর্তের জন্য লোকটি অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি মেলে ধরে মি. হাতেমের উপর। আশ্চর্য সহজ কণ্ঠে বলে—দেখুন, ওসব ধমকটমক দিয়ে কোনো ফল হবে না...

What...এবার ফেটে পড়েন মি. হাতেম।—আপনি জানেন, আপনার সাথে আমরা যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করছি। কিন্তু আপনি তার ভুল অর্থ করেছেন...। গত চার বছর আপনি কোথায় কোথায় ছিলেন, কার কার সাথে আপনার যোগাযোগ—এ সবই আমাদের জানতে হবে, আপনাকেও বলতে হবে...you must speak, you will have to speak, you will be compelled to speak.

উত্তেজনায় হাঁপাতে থাকেন মি. হাতেম।

থাক, থাক—চটাচটি করে কী লাভ—এগিয়ে আসেন মি. মজিদ অপেক্ষাকৃত শান্ত উদার দৃষ্টিতে।

আচ্ছা মি. আমজাদ, আপনার যা ইচ্ছে আপনি উত্তর দিন, আমরা কিছুই বলব না...,

আচ্ছা বলুন তো, আপনি এত adamant হলে চলবে কী করে;...আচ্ছা অন্তত একটা ঠিকানা বলুন যেটা একেবারেই unimportant অর্থাৎ আপনার সাথিদের তাতে বিপদের কোনো আশঙ্কা নেই...এমন একটা ঠিকানা...

না।

BanglaBook.org

আপনাদের ছাপাখানা কোথায় জানেন... ।

জানি না ।

সাইক্লো মেশিন?

জানি না ।

আচ্ছা আপনি তো জিলা কমিটির সভ্য?

না ।

এই দেখুন তো, এমন একটা মামুলি প্রশ্নের জবাব দিতেও আপনি নারাজ...তা হলে জিলা কমিটির অন্যান্য সভ্যর নাম তো নিশ্চয়ই জানেন? সে-নামগুলো বলুন দেখি ।

না ।

আশরাফ কি আপনার ছদ্মনাম?

না ।

নাঃ,—বিরক্তভরে কলমের ছিপিটা বন্ধ করে সাদা কাগজগুলো সরিয়ে রাখেন মি. মজিদ—দেখুন আপনি যদি এত অসহযোগী মনোভাব নেন তবে তো আমরা নাচার ।

লোকটি শুধু নিরুত্তরে চেয়ে থাকে সাদা কাগজগুলোর দিকে ।

হঠাৎ একটু ঝুঁকে ঘাড়টা এগিয়ে দেন মি. মজিদ যেন খুবই গোপন অন্তরঙ্গ এমন কিছু বলবেন...দেখুন, আপনি আর-একটু ভেবে দেখুন । শেষ পর্যন্ত সবই হয়তো আপনাকে বলতে হবে...কিন্তু সেটা আপনার পক্ষে খুবই বেদনাদায়ক, আমাদের পক্ষেও বড্ড unpleasant—please be reasonable, এখনও সময় আছে ।

মিনতির সুর মি. মজিদের কথায় ।

তারপর অনেকক্ষণ সবাই চুপচাপ । এতগুলো নিষ্করুণ হিমশীতল দৃষ্টির সামনে লোকটি বসে থাকে নির্লিপ্ত, নির্ভয় । একটি ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা নেবে আসে ঘরের উপর, বিজলিবাতির প্রখর আলোতেও কেমন যেন ধোঁয়াটে মনে হয় আবছায়ার মতো ।

বেশ, আপনি আরও কিছুক্ষণ ভেবে দেখুন—বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে যান মি. মজিদ । শেষ সাবধানবাণীর মতো শোনায় তাঁর কথাগুলো । আবার সব চুপ । একটু নড়েচড়ে বসে লোকটি । পকেট থেকে একটা আধপোড়া বিড়ি বের করে ঠোঁটের কোনায় লাগিয়ে রাখে অনেকক্ষণ । তার অজান্তেই কখন বিড়িটা গড়িয়ে পড়ে হাতের কাছে, চেয়ারের নিচে । সেখানে ছিল একটা খালি সিগারেটের প্যাকেট । অন্যমনস্কভাবে প্যাকেটটি তুলে নেয়, দুমড়ে দুমড়ে চেপে ধরে হাতের মুঠোর মধ্যে—, আবার টেনে টেনে সোজা করে, সলতের মতো করে পাকিয়ে নেয় । তারপর দাঁত দিয়ে হেঁচড়ে টানে একটু একটু করে ছিঁড়তে থাকে ।

হঠাৎ একটা ঘুসি এসে পড়ে তার চিবুকে । ঠোঁটজোড়া রক্ত ছাড়ে ফিনকি দিয়ে, ফোঁটা ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে ময়লা জামাটি বয়ে আর শুকিয়ে যায় তখখুনি ।

BanglaBook.org

তারপর আর-একটা চোখের কোনায়, আর-একটা কানের পাশে, আর-একটা ঠিক নাক আর ঠোঁটের মাঝখানটায়—তারপর আরও...অসংখ্য ঘুসি। রক্তঝরা ঠোঁটের কোণ থেকে ঝুলে পড়ে একপিণ্ড থেঁতলানো মাংস, ছিটকে পড়ে অদূরে। টেবিলে ঠেস দিয়ে কোনোরকমে এলিয়ে-পড়া দেহটিকে সোজা রাখতে চেষ্টা করে লোকটি। মাথার ঝাঁকড়া চুলে টান মেরে আবার বসানো হল তাকে চেয়ারে। কে যেন চেয়ারটাকে পেছন থেকে শক্ত করে ধরে আছে। এবার দুটো ঘুসিই এসে লাগে ঠিক মাথার পিছনে। ঘাড়ের রগগুলো বুঝি ছিঁড়ে যায়। কোঁকড়ানো দেহটি ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। মাথাটি চলে যায় টেবিলের নিচে। পিছন দিকে থেকে শার্টের কলারটি ধরে মি. হাতেম নিজেই মারেন এক হ্যাঁচকা টান। শার্টটি ছিঁড়ে যায় চির চির করে। কিন্তু মাথা থেকে যায় টেবিলের তলাতেই। উত্তেজিত, বিরক্ত মি. হাতেম সজোরে লাথি মারেন চেয়ারের পায়ায়। মুখ থুবড়ে লোকটি পড়ে যায় টেবিলের তলায়।

শা-লা—সব কথাতেই না, না, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি।

এই শালা, ওঠ-ওঠ শালা—হিড়হিড় টানে লোকটির অর্ধচেতন দেহ বেরিয়ে আসে টেবিলের তলা থেকে। থ্যাবড়ানো মুখ টেবিলের ভারী পায়ার ধাক্কা খেয়ে শুধু একটু শব্দ করে, আর কাঠের চেয়ারের হাতলে বেকায়দায় ঘষা লেগে কনুই থেকে হাত পর্যন্ত নেমে আসে এক দলা চামড়া আর কনুইটা দগ দগ করছে টাটকা ঘায়ের মতো। কম্পমান দুটি পায়ের উপর ভর দিয়ে কোনোরকমে দাঁড়াবার প্রাণান্ত চেষ্টা পায় লোকটি। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে বাঁ হাতটা টেনে তুলে আনে, মুখের কাছে চেপে ধরে ঠোঁটের উপর, যেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত তখনও গড়িয়ে পড়ছে।

...থু...একদলা রক্ত, সাথে দুটো ভাঙা দাঁতের ভগ্নাবশেষ।

ব্যাটা বদমায়েশ কাঁহেকা, আবার ন্যাকামি দ্যাখো...বল শালা কোন মাগির বাড়িতে কাটিয়েছিস এ্যাদ্দিন?

শক্ত বুটের লাথিটা এসে লাগে কোমরে। টাল সামলাতে পারে না লোকটি, ছিটকে পড়ে। কপালটি এসে ঠক করে ধাক্কা খায় টেবিলের কোনায়। ভূগর্ভস্থ ফোয়ারার প্রবাহের মতো অকস্মাৎ একঝলক রক্ত বেরিয়ে এসে ছিটিয়ে পড়ে মি. হাতেমের চোখেমুখে। দূর দূর করে মি. হাতেম পিছিয়ে আসেন মুখে রুমাল চেপে। মসৃণ মার্বেল পাথরের ফ্লোরের শীতল কোলে লোকটির অর্ধচেতন দেহটি পড়ে থাকে এবড়োখেবড়ো একটি মাংসপিণ্ডের মতো। নিশ্ছিদ্র নীরবতা ভঙ্গ করে শোনা যায় অস্পষ্ট গোঙানি বহু দূরাগত কোনো আর্তনাদের ক্ষীণ প্রতিধ্বনির মতো।

BanglaBook.org

নেতা

কথাটা বলি-বলি করেও বলতে পারছিল না হাফিজ, প্রতিবারই সংকোচ এসে গলা চিপে ধরে। অথচ বাকি আছে আর মাত্র একটি দিন। এরই মধ্যে যে-করেই হোক একটা ব্যবস্থা তাকে করতেই হবে, নচেৎ...তার সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, জীবনের বিশটি বছরের কত মধুর স্বপ্ন, কত রঙিন আশা সবই একটি ধাক্কায় ভেঙে চৌচির হয়ে যাবে...নাঃ ঐ দিকটা হাফিজ ভাবতেই পারে না. হোস্টেলের দেয়ালগুলো যেন এক প্রচণ্ড ঘূর্ণির ঝাঁকানি খেয়ে ঘুরছে অনবরত, ছাদটা বুঝি এখুনি নেবে আসছে তার মাথার উপর, টেবিলের বইগুলোও যেন নেচে নেচে বিদ্রূপ করছে তাকে। চোখ বুজে আসে হাফিজের...না! আজই রাত্রে কথাটা পাড়তে হবে নুরুলের কাছে। একটা সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের ভাব নিয়ে চেয়ারের হাতল দুটো ধরে হাফিজ অস্বাভাবিক জোরে, ফোঁক ফোঁক করে চেঁচিয়ে ওঠে, নড়বড়ে চেয়ারের হাতলগুলো হাফিজের অহস্য হৃদয়-যাতনার ভার সইতে না পেরে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল।

মফস্বল কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর হোস্টেলঘরের ভাঙা জানালার ফাঁকে তখন ডুবন্ত সূর্যের ফিকে আভা উঁকি মারছে। বিশীর্ণ আলোর রেখা আধছেঁড়া বইয়ের মলাটে। তেল-চিটচিটে বালিশ আর ছেঁড়া ময়লা বিছানার চাদরের গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে যৌবনের প্রারম্ভে কোনো নিঃসহায় যুবতীর করুণ হাসির মতো।

চেয়ার ছেড়ে হাফিজ একটি খাতা তুলে নেয় হাতে। নুরুলের কাছে মুখ ফুটে কথাটা বলা তার পক্ষে অসম্ভব। লিখে দিলে কেমন হয়? পেনসিলটা টেনে নিয়ে খসখস করে লিখে ফেলে কয়েকটি লাইন। মনঃপূত হয় না লাইন কয়টা—চড়চড় টান মেরে কেটে ফ্যালে সবটা আবার লিখতে বসে। অন্ধকার নেবে আসে ঘরময়। দুহাতের মুঠোয় পেনসিলটা রেখে পড়ে যায় হাফিজ চিঠির খসড়াটা। হঠাৎ হ্যাঁচকা টানে পাতাটা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ছুড়ে দেয় জানালার বাইরে। উঁহু, ঐসব কথা লিখে জানানো যায় না। মুখেই বলতে হবে।

BanglaBook.org

মনটা আবার হিম হয়ে আসে তার। এতক্ষণের সকল সংকল্প যেন উবে যায় এক মুহূর্তে। লজ্জা সংকোচ আবার চেপে ধরে তার গলাটা। দ্বিধাদ্বন্দ্বে জর্জরিত মনটা টুকরো টুকরো হয়ে খসে পড়তে চায়। কী করে সে কথাটা পাড়বে নুরুলের কাছে? নুরুল তাকে ফিরিয়ে এনেছে আজরাইলের খপ্পর থেকে, সেই যখন তার টাইফয়েড হল, যখন সে প্রবল জরে বিকারগ্রস্ত সংজ্ঞাহীন, নুরুল এসে তাকে হোস্টেল থেকে নিয়ে গেল নিজের বাড়িতে। জীবন আর মৃত্যুর সাথে টানাটানি চলল পুরো এক মাস ধরে। অবশেষে জয় হল জীবনের, হাফিজ নূতন করে বেঁচে উঠল। কী অসহ্য খাটুনিটা খেটেছে নুরুল, নুরুলের মা আর ছোট ভাইটি। জ্বর ছাড়ার পরই হাফিজ চলে আসতে চেয়েছিল। এক ধমক দিয়ে নুরুল বলেছিল, খবরদার, পাকামি ছাড়। নানা রকমের দামি দামি পথ্য দিয়ে অক্লান্ত সেবা আর শুশ্রূষা দিয়ে হাফিজের দুর্বল ধমনিতে উষ্ণ রক্তের প্রবাহ সঞ্চার করেছিল তারা। নুরুল, নুরুলের বাবা-মার এই ঋণ কি হাফিজ কোনোদিন শুধতে পারবে? কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে তার চিবুক বেয়ে। নুরুলকে সে পেয়েছে অকৃত্রিম সুহৃদ হিসেবে, দুঃখ দৈন্যের দিনে নিঃস্বার্থ বন্ধু হিসেবে। তাই হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা দিয়ে সে নুরুলকে পূজা করে এসেছে কলেজজীবনের প্রায় প্রথম দিন থেকেই।

অন্য কোনো উপায়ও যে নেই, অনেক চিন্তাভাবনা, অনেক হিসেবনিকেশ করে দেখেছে হাফিজ। তবুও পেনসিলটা নিয়ে একটা হিসেবে কষতে লেগে যায়। কিন্তু পেনসিল এগোয় না। আচ্ছা, যদি বসতবাড়িটা বিক্রি করে দেওয়া যায় তবে...? না, না, সে অসম্ভব। তার বুড়ো বাবা সবটুকু জমি বিক্রি করে এ্যদ্দিন তার পড়ার খরচ জুগিয়ে এসেছে। বৃদ্ধ বয়সে কামলা খেটে একরকম উপোস করেই দিন কাটিয়েছে অথর্ব মা আর ছোট বোনটিতে নিয়ে...তবুও ভিটেটা তো এখনও আছে, এখনও মাথার উপর দুটো চালার আশ্রয়ে বেশ রয়েছে। এই আশ্রয়টুকু থেকেও সে তাদের বঞ্চিত করতে চায়? এমন নিষ্ঠুর চিন্তার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিয়ে পেনসিলটা ছুড়ে মারে দেয়ালের গায়ে। হাত দুটো কপালের দুপাশে চেপে ধরে বেরিয়ে আসে রাস্তায় অন্ধকার আকাশের নিচে। এক দুর্নিবার আবেগের তাড়নায় সে এগিয়ে যায় মুনশিপাড়ার দিকে। পাঁচ মিনিটের পায়ে-হাঁটা পথে মুনশিপাড়ার প্রথম বাঁকেই নুরুলদের বাসা। বাবা তার স্থানীয় কোর্টের লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল, উদ্বেগহীন স্বচ্ছন্দ সংসার, পরিবারের সকলেই শিক্ষিত, মার্জিত রুচিসম্পন্ন। এমন একটি পরিবারের সান্নিধ্য পেয়ে কতদিন সে নিজেকে ধন্য, গর্বিত মনে করেছে। এমন একটি পরিবারের সাথে আপনাকে নিবিড়ভাবে জড়িত করে কত মধুর কল্পনায় সে ভেসে বেড়িয়েছে। কল্পনার সূত্রজাল টেনে এমন একটি মধ্যবিত্ত পরিবারের মাঝে নিজের ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করেছে, সুখস্বপ্নে বিভোর হয়েছে।

BanglaBook.org

নুরুলের ঘরটা খালি। সেই সকাল থেকে সে নাকি বাড়ি ফেরেনি। বৈঠকখানার দেয়ালঘড়িতে এগারোটা বাজার শব্দে সচকিত হয়ে সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন সম্ভব অসম্ভব নানা ভাবনার চৈতালি ঘূর্ণি তার মাথায়। মাঝে মাত্র একটি দিন। কাল ভোরবেলার মধ্যেই, দ্বিপ্রহরের পূর্বেই তাকে উপায় উদ্ভাবন করতে হবে। অথচ নুরুল নেই বাসায়। এক টুকরো কাগজে দুটি ছত্র লিখে দিয়ে কোনোরকম টলতে টলতে সে বেরিয়ে আসে ঘরফেরতা প্রমোদক্লান্ত নিম মাতালের মতো।

হতাশার একটি ভূত যেন তাকে গ্রাস করতে আসছে, দ্রুত, অতি দ্রুত। তারই উষ্ণ শ্বাসে যেন অবশ হয়ে আসছে হাত-পাগুলো। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম ভয় পায় হাফিজ। হোস্টেলঘরে ফিরে এসে বাতি জ্বালিয়ে শুয়ে পড়াটা—সবই যেন সেই অদৃশ্য এক ভয়াল ছায়ার ইঙ্গিতে, চেতনা তার অবলুপ্ত, হাত-পা শক্তিহীন। এক দুঃস্বপ্নের ঘোরে সে ডুবে যায়।

প্রবল ঝাঁকানি খেয়ে সে যখন সংবিৎ ফিরে পেল তখন মধ্যকার রাত গড়িয়ে পড়েছে শেষরাত্রির নিঝুমতার দিকে। চোখ রগড়িয়ে কোনোকিছু স্পষ্ট দেখবার আগেই তার কানে বেজে আসছে নুরুলের গলা—ব্যাটারটা কী; আমাকে S. O. S. (এস. ও. এস.) দিয়ে তুই দেখি দিব্যি ঘুমুচ্ছিস?

তুই এলি কখন?

জড়ানো কণ্ঠে প্রশ্নটা করে উঠে বসে হাফিজ।

এই তো এলাম। বাড়ি ফিরেই দেখি তোর জরুরি তাগাদা। এমন কী হয়েছে বল তো?

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় নুরুল।

এত রাত্রে কেন কষ্ট করে এলি?

বাঃ লিখে এসেছিস, যখনই বাসায় ফিরিস আমার সাথে অবশ্যই দেখা করে যাবি, বড় জরুরি প্রয়োজন। এর পরেও বলছিস—কষ্ট করে কে—ন?

মুখ ভেংচিয়ে উত্তর দেয় নুরুল।

সারা বিকেলের ভাবনাগুলো একঝাঁক বিষাক্ত সাপের মতো কিলবিল করে হঠাৎ যেন বিষ ছড়িয়ে যায় হাফিজের সর্বাঙ্গে, মনের রশিটা টেনে ধরে কোনো ভনিতা না করেই শুরু করে—দ্যাখ নুরুল, তোর ঋণ আমি কোনোদিন শোধ দিতে পারব না, মৃত্যুর হাত থেকে আমায় ছিনিয়ে এনেছিস...

বাঁ হাতের তালুটা হাফিজের মুখে চেপে ধরে ডান হাতখানা নেড়ে নেড়ে রোষের সুরে চেঁচিয়ে ওঠে নুরুল—থাম, থাম, আবার ঐসব ন্যাকামি শুরু করেছিস?...কতদিন তোকে বারণ করেছি ঐসব কথা না বলতে—

মুখটা আলগা করে লম্বা শ্বাস টানতে টানতে আত্মপক্ষ সমর্থন করে হাফিজ...কিন্তু ব্যাপারটা...

ব্যাপারটা কী বলে ফেললেই তো পারিস হ্যাঁ।

BanglaBook.org

এতসব আয়োজন, এত বছরের সযত্ন প্রচেষ্টা সবই কি ব্যর্থ যাবে?

করুণ আর্তনাদের মতো শোনায় কথাগুলো।

ঐসব দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে দিয়ে আসল কথাটা শোনাও দেখি? —অসহিষ্ণু কণ্ঠ নুরুলের।

পরীক্ষার ফিস দাখিল করার মেয়াদ ফুরোচ্ছে—কাল বাদ পরশু—আচমকা যেন ধাক্কা দিয়ে কথাগুলো বেরিয়ে আসে হাফিজের মুখ দিয়ে।

টাকার চিন্তায় ঘুম বন্ধ করেছিস না?...ওই ভাবনায় তোকে মরতে হবে না, আমার ফিসের সাথে তোরও ফিস দাখিল করার ব্যবস্থা হয়েছে...

...কিন্তু মাইনে যে বাকি আছে তিন মাসের।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটা পরিষ্কার করেই তবে ফিস দেওয়া হবে—বোকা কোথাকার!

চমক লাগানোর ভঙ্গিতে কথাটা শেষ করেই একটা সিগারেট ধরায় নুরুল, চেয়ারের উপর পা জোড়া বিছিয়ে দিয়ে বসে পড়ে টেবিলের উপর। দেয়ালের উপর পিঠের ভারটা ছেড়ে দিয়ে সোজা তাকায় অর্ধশায়িত হাফিজের মুখের দিকে।

নিমেষের তরে হাফিজের মস্তিষ্কযন্ত্রটা যেন বিকল হয়ে যায়, চিন্তাভাবনার ঊর্ধ্বে কোনো মায়ার রাজ্যে—সে যেন স্বপ্নাবিষ্ট। তার মনে হল হালকা পাখায় ভর দিয়ে সে উড়ে চলেছে নিথর শূন্যে, বিচিত্র বর্ণের, বিচিত্র আভায় উজ্জ্বল আলোকিত স্নিগ্ধ সে-জগৎ। গভীর কৃতজ্ঞতায় কণ্ঠ তার রুদ্ধ হয়ে আসে, চোখ বাষ্পার্দ্র। নুরুলের হাঁটুর উপর দুবাহুর সমস্ত চাপ সঞ্চিত করে বলে ভাঙা-ভাঙা আওয়াজে, ওহ্, তুই কত সুন্দর—এমন করে আমার কথা ভাবিস!

এক লাফে উঠে দাঁড়ায় নুরুল, হাফিজকে চৌকির উপর ঠেলে দিয়ে ধমকে ওঠে, চুপ...এখানে থামলে তুই স্রেফ গোল্লায় যাবি, পরীক্ষা পর্যন্ত তোকে আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে, বি.এ. পরীক্ষাটা তো ছেলেখেলা নয়!

হাফিজ তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করে মুখ খুলতে চায়। কিন্তু নুরুলের উচ্চস্বরের উষ্মায় তার ক্ষীণ আওয়াজ যায় তলিয়ে—বোঁচকাবুঁচকি বেঁধে তৈরি হয়ে থাকবি, কাল সকালে আমি এসে নিয়ে যাব।

এক নিশ্বাসে কথাগুলো শেষ করেই নুরুল খোলা দরজা ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

BanglaBook.org

...দশ বছর পর। মহকুমা হাকিম জনাব আবদুল হাফিজ সাহেব একজন জাঁদরেল অফিসার। তৎপরতা, কর্তব্যপরায়ণতা আর প্রগাঢ় আনুগত্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে জনাব হাফিজ সুনাম কিনেছেন ঊর্ধ্বতন মহলে, শ্রদ্ধা আর সম্মান অর্জন করেছেন অফিসারমহলে, সমবয়সী কর্মচারীদের ঈর্ষা কুড়িয়ে পদোন্নতির ধাপগুলো ডিঙিয়ে চলেছেন অতি সহজে, অতি দ্রুতগতিতে। সুখী সন্তুষ্ট পরিবার গড়ে তুলেছেন হাফিজ সাহেব। শ্বশুরমশায় অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট। মর্যাদার চেয়ে ধন আরও

বেশি করে সংগ্রহ করতে পেরেছেন বলেই সাত-সাতটি মেয়েকে মাছ-ভাতের ব্যবস্থা করে দিতে পেরেছেন অনায়াসে। সুন্দরী না হলেও সুশ্রী, সুরুচিবান শিক্ষিতা স্ত্রী হামিদা, নাদুসনুদুস দুটো ছেলে, কথাবার্তায় যেমনি চটপটে তেমনি স্বাস্থ্যবান, দেখলে ইচ্ছে করে তাকিয়ে থাকতে। পাক করার জন্য রয়েছে কুমিল্লার বাবুর্চি। ইচ্ছে আছে চাকরির পরবর্তী ধাপে ওঠার সাথে সাথেই লক্ষ্ণৌর বাবুর্চি নিয়োগ করবেন। তারপর? তারও পরে হয় দিল্লি নয়তো কাশ্মীরি বাবুর্চির আশাও পোষণ করেন হাফিজ সাহেব। ইস্ত্রি-করা পাজামা শার্ট স্যান্ডেল পরা খানসামা আর তকমা-আঁটা বেয়ারার সতর্ক পদসঞ্চারে গৃহের আভিজাত্য বিকাশমান। বন্ধুবান্ধব শুভাকাঙ্ক্ষীর প্রাচুর্যে আর সাহচর্যে মন তার আনন্দমুখর। শ্বশুরসাহেবের দৌলতে যা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না তাও অর্জিত হয়েছে—পুরানো মডেলের একখানি সেকেন্ডহ্যান্ড সেভ্রোলেট। এককথায় কৈশোর থেকে যৌবন অবধি যে-উন্মদনাকারী স্বপ্নের অবিশ্রান্ত তাড়নায় অশান্ত হৃদয়ের বোঝা টেনে টেনে কেটেছে হাফিজের, সে-স্বপ্ন আজ সাফল্যমণ্ডিত, বাস্তবায়িত। যা ছিল কল্পনার রঙিন ইতিহাস তা বাস্তবজীবনে এমনই হুবহুভাবে প্রতিফলিত দেখে হাফিজ যেমন বিস্মিত হয়েছে তেমনি অসম্ভব শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস জন্মেছে স্বীয় শক্তির উপর। এই প্রবল প্রত্যয় আত্মবিশ্বাসের অধিকারী বলে নিঃসংকোচে হাফিজ গর্ব প্রকাশ করে বন্ধুমহলে। উপরওয়ালারা তার এই আত্মবিশ্বাসকে সমীহ করে, তার যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়। এই কারণেই তিনি বদলি হয়ে এসেছেন নূতন অঞ্চলের ভার নিয়ে। কর্তৃপক্ষীয় মহল এই এলাকার উপর ইদানীং বিশেষ নজর দিয়েছেন, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বপালনের ভার নিয়েই হাফিজ সাহেব এসেছেন। তিনি নিজে সে-সম্পর্কে পুরো মাত্রায় সচেতন। এসেই তিনি সর্বপ্রথমে পরিচিত হয়েছেন স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে। বিশেষ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের স্বীয় সাসভবনে (সরকারি ভবন) দাওয়াত করে ভূরিভোজে আপ্যায়িত করেছেন। ব্যবসায়ীদের সমিতিতে ডিনার খেয়েছেন। যুবসমিতির সভায় বক্তৃতা দিয়েছেন আবেগময়ী ভাষায় উদ্দীপ্ত যৌবনের বন্দনা গেয়ে। গ্রামের মাতব্বরদের শহরে ডেকে পিঠ চাপড়িয়েছেন, মিষ্টি কথা শুনিয়েছেন। সারা এলাকায় সফর করেছেন সরজমিনে দেশবাসীর হাল-হকিকত জানার জন্য—মাত্র বিশেষ দু-একটি জায়গা ছাড়া। সেখানে নাকি কীসব হাঙ্গামা হয়েছে যার জন্য নিম্নতর কর্মচারীরা হুজুরকে অযথা বিপদের ঝুঁকি নিতে বারণ করেছেন।

মনপ্রাণ এক করে বিশ্বস্ত অফিসার হাফিজ সাহেব এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে কর্তব্যপালনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। সকল কাজকর্মের তদারকের সম্পূর্ণ ভার তুলে নেন নিজ হাতে। আহার নিদ্রা হারাম করেন।

দিন যায়, মাস যায়, বছর প্রায় গড়িয়ে আসে। জনাব হাফিজ প্রায় শেষ করে এনেছেন তাঁর কাজ, এখন বাকি রয়েছে শুধু শেষ প্রলেপটুকুর। অকস্মাৎ একটি জরুরি ফাইল এল উপরতলা থেকে। এক দুর্ধর্ষ রাষ্ট্রদ্রোহীর উসকানিতে বিভিন্ন

BanglaBook.org

জায়গার কৃষকরা নাকি খেপে উঠেছে। হাফিজ সাহেবের এলাকার গন্ডগোলের পিছনেও নাকি ঐ ব্যক্তিটিরই ইঙ্গিত রয়েছে। বর্তমানে সেই ব্যক্তিটি খুব সম্ভব হাফিজ সাহেবের অঞ্চলেই আত্মগোপন করে আছে। তারপর জরুরি ফাইলে বর্ণিত হয়েছে লোকটির অতীত কার্যকলাপের বিস্তারিত ফিরিস্তি—দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, গায়ের রং, হাঁটার ধরন, বচনভঙ্গি, দাঁতের গড়ন, মুখের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ইত্যাদি। কাগজগুলো উলটিয়ে-পালটিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য হাফিজ সাহেব ফাইলটি নিম্নতর কর্মচারীর নিকট পাঠাবার মনস্থ করলেন। হঠাৎ নজর ঠেকল ফাইলের শ্রেষপ্রান্তে জেন্টক্লিপ লাগানো একখানি ফটোর উপর এসে। ভূত দেখলে অথবা বহুদিন পূর্বে মৃত কোনো আত্মীয়ের জীবন্ত দেহ চোখের সামনে উপস্থিত হলেও হাফিজ সাহেব এতটা আঁতকে উঠতেন না। মাথাটা দুহাতে চেপে ধরে নির্নিমেষে চেয়ে থাকেন ফাইলের দিকে। বিস্মৃতপ্রায় অতীতের অনেক স্মৃতি, ফেলে-আসা অনেকগুলো দিনের একরাশ কাহিনি (হ্যাঁ, এখন সে শুধু কাহিনিই) বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো ক্ষণিকের জন্য তাঁর চেতনাকে অবশ করে দিল। অন্ধকার গুহানির্গত বনরাজ হঠাৎ চোখধাঁধানো আলোর সামনে পড়ে যেন হতভম্ব। সীমাহীন দুর্ভাবনা আর আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত দিনগুলো ভিসুবিয়াসের বিস্ফোরণের শক্তি নিয়ে এক প্রচণ্ড ধাক্কায় বর্তমানকে উপড়ে ফেলে দিয়ে এসে দাঁড়াল হাফিজ সাহেবের চোখের সামনে। রূপকথার কাহিনিতে পড়া সেই নিষ্ঠুর বিকট দৈত্য বুঝি এগিয়ে আসছে তাকে গ্রাস করতে। দুর্বিসহ হিমপ্রবাহে তাঁর ধমনি বুঝি নিস্তেজ হয়ে এল...কিন্তু সে শুধু মুহূর্তের জন্য। পাজোড়া সম্মুখ দিকে টান মেরে এক ঝাঁকুনিতে দেহটি সোজা করে, হাত দুটো শক্ত মুঠোয় উর্ধ্বমুখে ছুড়ে স্থির হয়ে বসলেন হাফিজ সাহেব। কর্তব্য, হ্যাঁ কর্তব্যের মুখে হাফিজ সাহেব নির্দয় অনমনীয়। পদোন্নতি সুনাম? উঁহুঁ, কর্তব্যপালনের সহযাত্রী হিসেবেই ওসবের কদর আছে সাহেবের নিকট। ঘামে চুপসে-যাওয়া শার্টের কলারটি ঢিলে করে, আস্তিন গুটিয়ে আঁটসাঁট প্যান্টের বকলেসজোড়া একটু ঢিল দিয়ে ফাইলে পুনর্বার মনোনিবেশ করেন তিনি। ঘসঘস কলম চলে অশ্রান্ত বেগে, টাইপরাইটার মেশিনের খটাখট ঘড়ঘড় ঝড়ের মাতন তোলে।

বছর ঘুরে শুরু হয় আবার নয়া সালের পরিক্রমা। হাফিজ সাহেব অবস্থা আয়ত্তে এনেও স্বস্তি পাচ্ছেন না মনে। হাঙ্গামাকারীদের চাঁইগুলোকে পাকড়াও করা এক দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবশেষে তাঁর কষ্টার্জিত সুনামে চুনকালি পড়বে? একটানা সাফল্যের ইতিহাসে ছেদ পড়বে? সার্ভিস বুকে নূতন কোনো চমকপ্রদ দক্ষতার প্রশংসাবাণী সংযোজিত হবে না? এর চেয়েও মর্মান্তিক হবে ব্যর্থতার গ্লানি, যে-গ্লানির বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে সারা জীবন—নূতন বছর শুরুর সাথে সাথেই দ্বিগুণ উদ্যম আর চতুরতর পরিকল্পনা নিয়ে আসন্ন পদোন্নতির তীব্রতর কামনায় উন্মত্ত হয়ে হাফিজ সাহেব রাতের নিদ্রা দিনের বিশ্রাম নির্বাসন দিলেন। এরই ফাঁকে সময় করে একদিন গেলেন পাখি-শিকারে, উপদ্রুত অঞ্চল

BanglaBook.org

থেকে বেশ দূরে বিল-এলাকায়, যে-এলাকার বাসিন্দাদের সুনাম আছে সরকারের অনুগত প্রজা বলে। সঙ্গে রয়েছে খুদে খানসামারা, গণ্যমান্যরা আর দেহরক্ষী পল্টন। বর্ষার প্লাবনোচ্ছ্বসিত নদীর বুকে বাষ্পীয় নৌকায় চড়ে সারাদিন অভিযান চলে। আলোগুলোও ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে একের পর এক মিলিয়ে যায় ছায়ার রাজ্যে। কেবলমাত্র বোটের পিছনের দিককার লণ্ঠনটি অন্ধকারের জগতে জেগে থাকে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মতো। বিকেলে সদ্যজাগা চরের বুকে বিশ্রাম নিয়ে রাত্রে আলোকমালায় সজ্জিত নৌকায় অনুষ্ঠিত হয় রান্না, ভোজন আর পানোৎসবের মেলা। মজলিশ ভাঙে মধ্যরাত্রিতে, ক্লান্ত-শ্রান্ত আখুদের দল পড়ে ঝিমিয়ে, অঘোর ঘুমে কেউ ঢলে পড়ে ডেকে, কেউ চেয়ারে, কেউ কেবিনে। একের পর এক, নৌকা মুখ ফেরায় শহরের দিকে, আগে আগে চলে সাহেবের নৌকা, পেছনের নৌকায় কিছু আসবাপত্র আর পল্টন। শেষরাত্রের অন্ধকার আসে নেবে। ঝিরঝিরে বাতাস আর হালকা ঢেউয়ের তালে দোল খেতে খেতে অচেতন প্রমোদবিহারীর দল এগিয়ে চলে ঘরমুখো। অকস্মাৎ কিসের যেন গোলমালে ঘুম ভেঙে গেল হাফিজ সাহেবের। ধড়ফড় করে জেগে উঠে অভ্যাসবশত শিথানে রাখা পিস্তলটি হাতে তুলে বেরিয়ে এলেন কেবিন থেকে, দেখলেন পল্টনবাহী নৌকাটা বেশ পিছিয়ে পড়েছে, উভয় দিক থেকে হাঁকডাক চলছে, পল্টনওয়ালারা বলছে ইঞ্জিনের গোলমালের কথা, এদিক থেকে তাগাদা যাচ্ছে 'জলদি করো'। ভোর তখন প্রায় হয়ে এসেছে কিন্তু ফিকে অন্ধকারটা লেগে রয়েছে শীতের কুয়াশার মতো। সেই আবছা আঁধারে দেখলেন নৌকার পাশে একটি সাম্পান লাগানো। তাঁর খাস দেহরক্ষী ওসমান সাম্পানওয়ালার ঘাড় ধরে চিৎকার করছে দেশি-বিদেশি অশ্রাব্য ভাষায়। চ্যাচামেচি, হৈহট্টগোল থেকে হাফিজ সাহেব মোটামুটি যা উদ্ধার করতে পারলেন তার অর্থ দাঁড়ায়, এককথায় সাম্পান-আরোহীরা স্মাগলার। শেষরাত্রে কেবিনের দরজায় ওসমান যখন ডিউটি দিচ্ছিল তখন দেখতে পেল তীর ঘেঁষে সাম্পানখানি চলেছে, আস্তে আস্তে। ওসমান হাঁক দেয়, কে যায়? কোনো উত্তর আসে না। ওসমান আবার হাঁকে—কে যায়, তবুও জবাব আসে না। ওসমানের কেমন যেন সন্দেহ হল, আরও জোরে হেঁকে চলল 'থামো'। প্রত্যুত্তরে সাম্পান চলতে শুরু করল দ্বিগুণ জোরে। এবার ওসমান জানিয়ে দিল সাবধানবাণী, যে-ই হও না কেন, সাম্পান ভিড়াও, নচেৎ গুলি করব। কিন্তু সাম্পান তাতেও থামে না। ওসমান তখন বাষ্পীয় নৌকাটাকে কূলের দিকে ঘুরিয়ে সাম্পানওয়ালাকে ধরে ফেলল। গাঢ় নিদ্রার আকস্মিক ব্যাঘাতে হাফিজ সাহেব সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তার উপর এমন অহেতুক ঝামেলায় রীতিমতো রুষ্ট হলেন। ওসমানের অহেতুক উদ্যোগকে তাই প্রশংসা না করে হুকুম দিলেন চড়া মেজাজে—ছইয়ের মধ্যে কে কে আছ বেরিয়ে এসে দাঁড়াও। ইতিমধ্যে সাম্পানটিকে টেনে আটকানো হল বোটের পেছনদিককার একটি খুঁটির সাথে। হাফিজ সাহেবের হাঁক শুনে একটি লোক হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ছইয়ের

BanglaBook.org

ভেতর থেকে। উঁচু লম্বা শক্ত জোয়ান লোক। চলার ভারে সাম্পানটা দোল খেয়ে সামান্য একটু কাত হল বাঁদিকে। মাঝির ঘাড়টা এক হাতের মুঠোয় রেখে ওসমান তখন নৌকার খুঁটিতে বাঁধা এক টুকরো দড়ির জন্য অন্য হাতটা বাড়িয়েছে, ভারী বুটজুতো সাম্পানের সংকীর্ণ মাথায় টাল সামলাতে পারল না। ঝুপ করে ওসমান পড়ে গেল নদীতে। অকস্মাৎ টান খেয়ে বুড়ো মাঝির দুর্বল দেহটিও গড়িয়ে পড়ল পানিতে ওসমানেরই সাথে সাথে। ঠিক তখুনি ছইয়ের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আর-একটি মুখ, হ্যাজাক-লাইটের আলোর রেখা সোজাসুজি এসে পড়ে সে-মুখে, সে-মুখের দুটো চোখে আলোর ঝিলিক খেলে যায় একটুক্ষণের জন্য। পাঁচ হাত দূরে বাষ্পীয় নৌকার ডেকে দণ্ডায়মান হাফিজ সাহেবের হাতের পিস্তল গর্জে উঠল মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে। একঝাঁক বুনো হাঁসের করুণ আর্তনাদে শিউরে উঠল ভোরের হাওয়া, আর-একটি দেহ টুপ করে পড়ে গেল নদীর জলে। ততক্ষণে পল্টনবাহী নৌকা এসে পড়েছে। তীব্র সার্চলাইটের আলোয় আলোকিত নদীর মোহনা।

দুদিন পর রাজধানীর দৈনিকগুলোতে প্রথম পৃষ্ঠায় মোটা শিরোনামায় নিজস্ব সংবাদদাতার খবর বেরুল :

দুর্ধর্ষ সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে পুলিশবাহিনীর সংঘর্ষ—কতিপয় পুলিশ ও সন্ত্রাসবাদী হতাহত।...সম্প্রতি...এলাকায় নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত কতিপয় ব্যক্তির সহিত পুলিশবাহিনীর সংঘর্ষের এক চাঞ্চল্যকর খবর পাওয়া গিয়াছে। প্রকাশ উক্ত এলাকায় নুরুল ইসলাম নামক এক সন্ত্রাসবাদী কিছুদিন যাবৎ সরলপ্রাণ কৃষকদের উত্তেজিত করিতেছিল এবং নিজ দলবল লইয়া নানাপ্রকার নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত ছিল। ঘটনার দিন পূর্বাহ্নেই খবর পাইয়া টহলদারী পুলিশবাহিনী ধাওয়া করিয়া নদীর মধ্যে ঘেরাও করে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সন্ত্রাসবাদিগণ বাধাপ্রদান করিলে পুলিশ গুলি চালাইতে বাধ্য হয়। প্রবল সংঘর্ষের ফলে সন্ত্রাসবাদী দলের নেতা নুরুল ইসলাম নিহত হইয়াছে ও দুইজন কনস্টেবল গুরুতরভাবে জখম হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত নুরুল ইসলামকে ধরার জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করা হইতেছিল এবং কর্তৃপক্ষ তাহার গ্রেপ্তারের জন্য এক হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেন। কিন্তু সে আত্মগোপন করিয়া নাশকতামূলক কার্য চালাইয়া যাইতে থাকে। সকলে মনে করিতেছে এই ঘটনার পর ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের মেরুদণ্ড ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের মনে সম্পূর্ণ আস্থা ফিরিয়া আসিয়াছে। এইজন্য বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী মহকুমা হাকিম জনাব আবদুল হাফিজ।

BanglaBook.org

অপমৃত্যু

লাল মিয়া জায়গাটি এক মুহূর্তের জন্যও পছন্দ করতে পারেনি।

হাকিম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবরা যতই শাস্তি দিয়ে চরিত্রশোধনের ব্যস্থা করুন-না কেন লাল মিয়া বিশ্বাস করে এটা দোজখে হাবিয়া। সমাজনেতারা যতই সদুপদেশ বর্ষণ করুন-না কেন সে মনে করে এই নরকালয়ে তিলে তিলে মানুষকে অধিকতর অপরাধ আর অসৎ কর্মের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বলে, এখানে যে একবার এসেছে তাকে দ্বিতীয় বার আসতেই হবে। না এসে উপায় নেই। লাল মিয়া নিজেই তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

১৯৫৩ সাল। চট্টগ্রাম জেল। ক্রনিক ডিসেন্ট্রি আর এমিবিক হিপাটাইটিস রোগে ভুগছিলাম। খাদ্য ছিল ঝাল ছাড়া শুধু আদার রস দিয়ে তৈরি শিং মাছের ঝোল, কাঁচকলা সেদ্ধ আর দইভাত। আমাদের পাকে ছিল লাল মিয়া। রাজবন্দিদের পাকঘরে পাক হত দুধরনের। একটি জেনারেল অর্থাৎ সাধারণ। আর-একটি ছিল লাইট অর্থাৎ যারা পেটরোগী তাদের জন্য ঝাল মশলা ছাড়া। এই লাইট পাকটা তদারকের ভার ছিল আমার উপর। সেই সূত্রে বাবুর্চি লাল মিয়ার সাথে হৃদ্যতা। সে ছিল বি ক্লাস। মানে জেল-ঘাঘু। ইতিমধ্যে বার-তিনেক খেটে গিয়েছে।

কারাগারের সাথে তার পরিচয়টা হয় এক বিচিত্র কায়দায়। কারাগার নামক যে একটি স্থান রয়েছে সশরীরে আমার পূর্বে সে-তথ্য সম্পর্কে লাল মিয়া জ্ঞাত ছিল না। বস্তুত ঐ শব্দটাই সে শোনেনি। চট্টগ্রামের হালিশহরে তার বাড়ি। এখনকার হালিশহর দেখে তখনকার অবস্থাটা বোঝা যাবে না। তখন হালিশহরে কলকারখানা তো দূরের কথা, কোনো পাকা দালানই ছিল না। লাল মিয়া বছরের চার-পাঁচ মাস নিজের ক্ষেতে আর অন্যের ক্ষেতে দিনমজুরি করে কাটাত। বাকি ছয়-সাত মাস শহরে এসে মোট বয়ে আর রিকশা চালিয়ে পয়সা কামাই করত। ঘরে ছিল বউ শরিফা, যাকে সে নগদ পঞ্চাশ টাকা আর দুপদ রুপোর গয়না দিয়ে

BanglaBook.org

বিয়ে করে এনেছিল ভিন গাঁ থেকে। বাপ ছিল না, মা ছিল না। মিয়াবিবির সংসার। শরিফা তেরো বছরের বালিকা হলেও গিন্নিপনা কম জানত না। জোয়ান বয়সের রোজগারে আর শরিফার যত্ন-আদরে সংসার চলত হালকা হাওয়ায় পাল তোলা নৌকার মতো নিরুদ্বেগ স্বচ্ছন্দতায়।

কিন্তু একদিন লাল মিয়া শহর থেকে ফিরল না। স্টেশনে যে-সর্দারের তাঁবে সে মোট বইত তার সাথে লেনদেনের ব্যাপার নিয়ে মনোমালিন্য চলছিল বেশ কিছুদিন ধরে। শুধু তার সাথেই নয়, অনেক মুটেই হারিশ সর্দারের আচরণে বিক্ষুব্ধ ছিল। বিক্ষোভ জমতে জমতে একদিন ফেটে পড়ে। কথা-কাটাকাটি থেকে মারামারি। বেদম প্রহারে সর্দার জখম হলেও কাবু হয়নি। একদিন সে লাল মিয়াসহ বেরোখা কুলিগুলোকে থানায় পাঠিয়ে মারের প্রতিশোধ নেয়। থানা থেকে জেল। প্রথমে হাজত তারপর কয়েদি। ঠিক কীভাবে বিচার হল, শাস্তি হল অনেক চেষ্টা করেও লাল মিয়া বুঝতে পারেনি। এইটুকু বুঝতে পেরেছিল যে, স্টেশন থেকে ইলেকট্রিকের তার চুরির অভিযোগে তাকে বিচার করে ছয় মাস শাস্তি দেওয়া হয়। কখন কীভাবে চুরি করলে সেটা তার কাছে অজ্ঞাত রহস্যই রয়ে গেল। কিন্তু জেলখানার রহস্যটা উদ্‌ঘাটিত হল তার সমস্ত বেদনা আর কুৎসিত রূপ নিয়ে। হাজতে পরিচয় হল চোর, পকেটমার, ডাকাতদের সাথে যারা অভিজ্ঞ চৌকস। দেখলে, চুরির অভিযোগ শুনে সবাই চোখ উলটিয়ে তাকালে। তারপর দেখলে মাত্র ছয় মাসের সাজার জন্য অভিজাত চোর বা ডাকাত কর্তৃক তার প্রতি অবজ্ঞামিশ্রিত করুণা প্রদর্শন। শুভাকাঙ্ক্ষীরও অভাব হল না। নেহাত নাবালক ভেবে লাল মিয়ার প্রতি অনেকে বেশ সদয় হল। কেমন করে বিড়ি লুকিয়ে রাখতে হয়, পাহারার চোখে ফাঁকি দিয়ে দুজনের খাবার খেয়ে নিতে হয়, বেকায়দায় পড়লে হাত-সাফাই করতে হয়—শুভাকাঙ্ক্ষীরা এমনি সব নানা কৌশল ওকে শিখিয়ে দিলে। কিন্তু যেটা সে আগ্রহ করে শিখলে সে হল তাসের জুয়া। ওতে নেশা আছে, সময় কাটে। তার চেয়েও বড় কথা কিছুক্ষণের জন্য হলেও শরিফার স্মৃতিটা ভুলে থাকা যায়।

কথার মাঝখানে আমি বাধা দিয়ে বললাম—বউকে যখন এতই ভালোবাসতে তখন খুন করে ফের জেল খাটছ কেন? কামলাগিরি করে যা পেতে তাতে তো মিয়া-বিবির সংসার কায়ক্লেশে চালিয়ে দিতে পারতে।

সে-কথাটাই সে বলল গাঁজার কলকেয় টান দেওয়ার মতো লম্বা এক টানে বিড়ির আগুনটাকে একবারে সুতো পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে, চোখ বুজে ধীরে ধীরে, অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে ধোঁয়া ছাড়লে। তারপর আমার কৌতূহলী চোখের দিকে এক পলক নজর বুলিয়ে নিয়ে বলতে শুরু করলে।

"হারিশ সর্দারের দুশমনিতে ছয় মাস যখন জেল খাটলাম তখন শরিফার কোনো চিঠি পাইনি। প্রাণটা ছটফট করত। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের নামে সবুর মানতাম। মনের কষ্ট মনেই লুকিয়ে রাখতাম। ছয় মাস তখন ছয় বছরের মতো মনে হলেও ফুরিয়ে গেল। মেয়াদ শেষে মুক্তি পেলাম। যখন জেলে আসি তখন

BanglaBook.org

আমার সাথে টাকা ছিল তিনটে। আর খুচরো পয়সা ছিল দশ আনা। তিনটে টাকা আমান রেখে দিয়েছিলাম। বেরিয়েই ঐ টাকা দিয়ে শরিফার জন্য গন্ধ সাবান, খশবু তেল, এক গোছা চুড়ি আর এক জোড়া চকচকে সাদা মাকড়ি কিনলাম। সন্ধে হতে বেশি দেরি নেই। জলদি জলদি বাড়ি ফেরার জন্য বাস ধরলাম। বড় রাস্তা থেকে আমার বাড়িটা ছিল আধ ক্রোশখানেক পথ। বাস থেকে নেবে ধানক্ষেত ধরে আড়াআড়ি চলে বাড়ি এলাম। দেখলাম বাড়ি নেই।"

কেন? শরিফা, শরিফা ছিল না?

আমি জিজ্ঞেস না করে থাকতে পারলাম না। কণ্ঠস্বরে বোধ হয় কিছুটা উদ্বেগ আর বিস্ময় ফুটে উঠেছিল। আর তা-ই লক্ষ করে লাল মিয়া সলজ্জ হাসিতে বিষণ্ন মুখটাকে ক্ষণিকের জন্য রক্তিম করে জবাব দিলে—না, সে থাকলে তো ঘরও থাকত।

কেন, কেন? সে গেল কোথায়?

আমার প্রশ্নে রীতিমতো উত্তেজনা ঝরে পড়ে।

লাল মিয়া কিছুমাত্র অভিভূত বা উত্তেজিত না হয়ে কাহিনির বাকি অংশটুকু বলে গেল।

প্রিয়াবিরহে মিলনকাতর দুরুদুরু বক্ষে লাল মিয়া বাড়িতে পা দিয়ে দেখলে শূন্য ভিটে খাঁ-খাঁ করছে। সন্ধ্যার আবছা আলোয় কুল আর পেয়ারা গাছের আড়ালে আঠালো মাটির উলঙ্গ ভিটেটা আলোআঁধারির যে-কুটিল রহস্য সৃষ্টি করে রেখেছে সহসা লাল মিয়া সেদিকে পা বাড়াতে পারলে না। পরিচিতি পেয়ারা গাছটির গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে সে দেখলে বেড়া নেই, চালা নেই। একটা ভাঙা পালাও কোথাও নজরে পড়ে না। শুধু উলঙ্গ আকাশের দিকে চেয়ে রয়েছে ন্যাংটা ভিটেটি কী এক নিগূঢ় বেদনার বোবা দৃষ্টি মেলে।

লাল মিয়ার প্রত্যাশী হিয়ার দুরুদুরু কম্পন তখন থেমে গিয়েছে। এক অজানা ভীতি আর উদ্বেগ শঙ্কায় হৃদয় তার স্বাভাবিক স্পন্দন যেন হারিয়ে ফ্যালে। বেগে প্রবাহিত উষ্ণ রক্ত অকস্মাৎ কোন শীতল প্রবাহের স্পর্শে জমাট বেঁধে হৃদয়ের গোড়ায় এসে থমকে দাঁড়ায়। পা বাড়িয়েও পা তুলতে পারে না লাল মিয়া। এ কী অভিশাপ, এ কী মর্মান্তিক পরিহাস! মাত্র ছয় মাস আগে মুলিবাঁশের বেড়ায় ঘেরা, টিনে-ছাওয়া যে-দোচালা ঘরটি সে রেখে গিয়েছিল সেটি কোথায় কেমন করে অদৃশ্য হল? আর সেই শক্ত মজবুত ঘরের নিরাপদ আশ্রয়ে সে যাকে রেখে গিয়েছিল? সেই শরমে-মোড়া লতাচিক্কণ দেহের গরবিনী বালিকা-বধূটি?

শুক্লপক্ষের চাঁদ ধীরে ধীরে মিটিমিটি চোখে এগিয়ে এসে আলোআঁধারির ঢাকনি তুলে নেয়। কুল পেয়ারার পাতার বর্ম ভেদ করে উলঙ্গ ভিটের উপর পূর্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে। লাল মিয়া স্পষ্ট করেই দেখলে খালি ভিটেয় ছড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি শুকনো পাতা। পেয়ারার গুঁড়ি থেকে হতচেতন দেহটি টেনে তুলে লাল মিয়া এক পা দু-পা এগিয়ে যায়। হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করে সেই শক্ত আঠালো মাটি যে-মাটি ছয় মাস পূর্বেও দুটি যৌবন-রোমাঞ্চিত হিয়া তপ্ত আলিঙ্গনে

BanglaBook.org

আগলিয়ে রাখত। সে-মাটির শীতল স্পর্শে এক তীব্র কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ে লাল মিয়ার সর্ব অঙ্গে। দুহাতে মুখ বুজে সে লুটিয়ে পড়ে শূন্য ভিটের 'পর। শীতল মাটির অনুরাগ-স্পর্শে আর পেয়ারা পাতার মর্মর তানে লাল মিয়া লতাচিক্কণ বউটিকে খুঁজে পেতে চায়। খুঁজে পেতে চায় অনেক দিনের পিছনে রেখে আসা মিলনমধুর রাত্রিগুলিকে। পরিত্যক্ত ভিটের হিমেল গায়ে মুখ বুলিয়ে কিসের স্পর্শ সে পেতে চায়? মাটিতে কান পেতে কোন পরিচিত কণ্ঠস্বর সে শুনতে চায়? একটি হুতোম প্যাঁচার কর্কশ কণ্ঠ তার অনুভূতিকে যেন ব্যঙ্গ করে দূরে মিলিয়ে যায়।

শহর থেকে আনা তোহফার পুঁটলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে উদ্‌ভ্রান্ত পদক্ষেপে লাল মিয়া পশ্চিমের মাঠে নেবে পড়ে। ভিন গাঁয়ে পৌঁছাতে তার কতটুকু সময়ই-বা লেগেছে! কিন্তু ততক্ষণে নিশুতি রাত্রির ঘুম নেবে এসেছে গ্রামে। বাড়িটাতে কোনো জনমানুষ আছে বোঝার উপায় নেই। ছোট শালার নাম ধরে ডাক দেয় লাল মিয়া। প্রথমে আস্তে আস্তে। তারপর জোরে জোরে। ভেতর থেকে এতটুকু সাড়া আসে না। আরও জোরে হাঁক ছাড়ে। তাতেও কোনো ফল না পেয়ে লাল মিয়া সমস্ত সন্ধ্যারাত্রির ক্রোধ ছুড়ে মারে দরজার গায়ে। দরমার দরজা তার অস্থির পদাঘাতে বেঁকে বেঁকে ভাঙা কান্নার কাতর শব্দ তুলে কোনোরকমে হুড়কার সাথে লেগে থাকে। ক্রুদ্ধ পদাঘাত ও ততোধিক হিংস্র আওয়াজে গৃহবাসীর ঘুম না ভেঙে পারে না। ভেতর থেকে এতক্ষণে সাড়া আসে—কে, কে? ভয় আর আতঙ্কমেশানো কণ্ঠস্বর। পরিচিত কণ্ঠস্বরে লাল মিয়া বোধ হয় খানিক সংবিৎ ফিরে পায়। যেন লজ্জিত হয়েছে এমনিভাবে গলাটাকে যতদূর সম্ভব মোলায়েম করে বলে—বাপজান, আমি লাল মিয়া। দরজা খুলেন। মুহূর্তমাত্র নীরবতা। এত অল্পক্ষণের যে, খুব সতর্কভাবে লক্ষ না করলে সেই মুহূর্ত সময়ের ব্যবধানটুকু নজরে পড়ে না। হয়তোবা মুহূর্তের ব্যবধানও নয়। তার চেয়ে কম সময়ের ব্যবধানে ঘরের কণ্ঠস্বর ঝাঁজিয়ে উঠে একরাশ অবিশ্বাস্য কথা নিক্ষেপ করে নিশীথ রাত্রির অবাঞ্ছিত আগন্তুকের উদ্দেশে। ব্যাটা, কোন লাল মিয়া তুমি এসেছ এত রাত্রে গৃহস্থবাড়ির ঘুম ভাঙাতে। তোমাকে চিনি না। জলদি জলদি সরে পড়ো।

স্তম্ভিত লাল মিয়া নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলে না। শরিফার বাপ, তার শ্বশুরের গলা থেকে এ কী অসম্ভব কথা শুনছে সে! কয়েক মিনিট স্তব্ধ বিমূঢ় লাল মিয়া অবস্থাটা ভেবে নেবার চেষ্টা করলে। ঘরের চারিদিকে, পুব কোণের মরিচক্ষেত, দক্ষিণের রসুইঘর—একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিলে। না, তার ভুল হয়নি। এটিই তার শ্বশুরবাড়ি। এখান থেকেই সে ঘোমটা-টানা শরমে-মরা শরিফাকে একদিন হাত ধরে ছাতার আড়াল করে ছোট ছোট পায়ে নিয়ে গিয়েছিল।

এবার লাল মিয়ার স্বামিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার পালা। কণ্ঠস্বরে যতটা সম্ভব জোর লাগিয়ে সে বলে—দরজাটা খুলুন। দেখলেই আমায় চিনতে পারবেন।

ভিতর থেকে ত্বরিত জবাব এল—আমরা চোরকে চিনি না।

জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশটা হঠাৎ নিকষ কালো অন্ধকারে ডুবে গেল। অসংখ্য হাতুড়ির নির্মম আঘাতে লাল মিয়ার মাথাটা ভেঙে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে বুঝি ঝরে ঝরে

BanglaBook.org

পড়ে সে-অন্ধকারে। এক অভূতপূর্ব যাতনায় শরীরের হাড়গুলো গলে গলে মিশে যায় বিচূর্ণ খুলির সাথে। অন্ধকার গ্রাস করে লাল মিয়ার সমস্ত সত্তাকে। কিন্তু শুধু মুহূর্তের জন্য। মুহূর্ত পরেই লাল মিয়া অনুভব করে দরমার খসখসে দরজা, দরজার অমসৃণ বেড়া।

'চোরকে চিনি না'—অনুভব করে কথাটার নিষ্ঠুর অর্থ। আর শিরায় শিরায় হিংস্র রক্তের অনল স্রোত। গর্জে ওঠে চট্টগ্রামের বেপরোয়া জেরবাদীর কণ্ঠ "শরিফা কই?"

ঘর এবার নিরুত্তর। প্রচণ্ড পদাঘাতে দরজা-বেড়া কাঁপিয়ে আবার গর্জে ওঠে লাল মিয়া, "আমার ঘর কই?"

এবার শুনতে তার ভ্রম হয় না। পরিষ্কার অকুণ্ঠিত মেয়েলি কণ্ঠ চোরের ঘর তো জেলখানা। শরিফার গলা চিনতে তার ভুল হবে কেন? আদিম হিংস্রতার বর্বর হুংকারে গভীর রাত্রির স্তব্ধ প্রহর চমকে ওঠে। উন্মাদ আঘাতে বাঁশের পালা ভেঙে পড়ে। ভাঙা দরজা দূরে নিক্ষেপ করে লাল মিয়া ঢুকে পড়ে শ্বশুরগৃহে। ভীত ত্রস্ত বাসিন্দারা অন্ধকারেই এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে, ধাক্কা খেয়ে, নখের খামচা খেয়ে আশ্রয় নেয় মাচার নিচে। ভাঙা পালা বাঁশটি হাতে তুলে নিয়ে লাল মিয়া হুংকার ছাড়ে 'এ্যাঁ, আমি চোর? আর তোমরা সাধু!"

নিমেষের জন্য। সেই নিমেষেই উদ্যত বাঁশ হাত থেকে খসে পড়ে লাল মিয়ার। একটি পরিচিত ছোঁয়া, দূর থেকে ছিটকে এসে তার হাতটি অবশ করে দেয়। বাঁশটি ধরে রাখার মতো শক্তি সে হারিয়ে ফেললে। কিন্তু সেই পরিচিত ছোঁয়াটিকে এমনকি পরিচিত গন্ধটিও সে ধরে রাখে। অবশ হাত আর-একটি বাহুর উত্তপ্ত পরশে হারিয়ে যায়। শরিফার কাঁধে শক্ত ঝাঁকুনি মেরে অপেক্ষাকৃত সংযত গলায় বলে লাল মিয়া—চল শরিফা, চল তোর সোয়ামির ঘরে।

সে-নিশ্চল দেহটি কঠিন হয়ে আসে। কঠিন জবাব—আমি চোরের ঘর করি না।

তড়িতাহত লাল মিয়ার দেহ ছিটকে বেরিয়ে আসে দরজার বাইরে। তার জেরবাদী হিংস্রতা, তার স্বামিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংকল্প স্রোতের মুখে ছোট একটি বুদ্বুদের মতো উবে যায়। ডুবে যাওয়া চাঁদের বিরহে বিষণ্ণকাতর শেষরাত্রির কুহেলিকায় লাল মিয়া হারিয়ে যায়।

তবু একটি ক্ষীণ আশা ছিল। আশা ছিল হয়তো শরিফার ভুল ভাঙবে, সে অনুতপ্ত হবে। তার মহব্বতের দাম দেবার জন্য শরিফা নিশ্চয় মনে-মনে প্রস্তুত। কিন্তু বাপের শাসানিতে পারছে না। আর সে যে চোর এবং সেটা যদি মুখের উপর শরিফা বলেই ফ্যালে তবে এমন অন্যায় কী করেছে? সে চুরির অপরাধে জেল খেটে এসেছে এটা তো আর মিথ্যা নয়। হতে পারে তার চুরিটাই সত্য না। কিন্তু সে-খোঁজ আর কে নিতে যাচ্ছে! এমনিধারা ভাবতে ভাবতে সকালের মতটা লাল মিয়া পালটে ফ্যালে। না, সে এখনই শহরে যাবে না। শরিফাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টাটা আর-একবার করতে হবে।

BanglaBook.org

শেষরাত্রির আশ্রয় মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসতেই মুখোমুখি পড়লে ইমাম সাহেবের। আঁতকে উঠে দু-পা পিছু হটে ইমাম সাহেব ভ্রূ-তোলা কপালের উপর বাঁ হাতটি রেখে বলেন—এ্যাঁ, লালু...লালু চোরা তুই এখানে!

একটু যেন থতমত খেয়ে যায় লাল মিয়া ওরফে লালু। আমতা আমতা করে বলে—এই যাচ্ছিলাম ও-গাঁয়ে। মসজিদে কিছুক্ষণের জন্য মুসাফির হলাম।

তুই কখন এলি? সারা রাত মসজিদে ছিলি? শুয়ে ছিলি মসজিদে?

খোৎবা পড়ার মতো আবৃত্তির ঢঙে তাড়াতাড়ি এতগুলো কথা জিজ্ঞেস করেন ইমাম সাহেব।

কোথাও কোনো অপরাধ হয়েছে মনে করে কাঁচুমাচু করে জবাব দেয় এই শেষ রাত্রি।

তওবা, তওবা, চুরি করে খোদার ঘরে ঢুকলি? বের হ, বের হ এখুনি।

এবার আর অপ্রস্তুত হওয়ার কোনো অবকাশ থাকে না। লাল মিয়া বুঝতে পারে চুরির দায়ে সাজা খাটার খবরটা রটে গিয়েছে। সে এখন লালু বা লাল মিয়া নয়। এখন সে লালু চোর। খোদার ঘরেও সে এখন অবাঞ্ছিত, গোনাহ্‌গার। ধাঁ করে ইমাম সাহেবের পাশ কাটিয়ে লালু বেরিয়ে আসে। কোনাকুনি আলের রাস্তা ধরে এগিয়ে যায়।

শরিফাদের বাড়ির পথে ছোট্ট একটি বাজার পড়ে। বাজারটি সপ্তাহে দুদিন মেলে। কিন্তু যুদ্ধের সময় যে-চায়ের দোকান চালু হয়েছিলে সেটা এখনও রোজই খোলা থাকে। গাঁয়ের দু-চারজন মাতব্বর, দূরদেশের কোনো পথিক আর টাউটদের আড্ডায় সকাল-বিকেল সরগরম থাকে। দোকানটির সামনে বসেই লালুর মনে পড়ল সেই কাল দুপুরে জেলের দুটি ভাত মুখে পুরে এসেছিল, উত্তেজনার বশে এতক্ষণ খিদেটা টের পায়নি। পরিচিত দোকানদারের দিকে একগাল হাসি উড়িয়ে দিয়ে চা-বিস্কুটের ফরমায়েশ দেয় সে। টুলের উপর বসে পুরানো অভ্যাস মোতাবেক নিজেই খোলা বয়াম থেকে একটা বিস্কুট টেনে কামড় বসায়। কিন্তু অর্ধপথেই কামড়টা বন্ধ রেখে হাতটা নামিয়ে নিতে হয় তাকে। অনেকগুলো কঠিন দৃষ্টির মুখে অসোয়াস্তিতে তার চোখটা আপনিই উলটো দিকে ঘুরে যায়।

> পণ্ডিত হয়ে ফিরেছেন মশায়
> সুখে থাকতে ভূতে কিলায় কিনা।
> আর কি গ্রামে থাকা যাইব?

বর্ষার তীক্ষ্ণ বাণের মতো কথাগুলো বিদ্ধ করে লাল মিয়াকে। লোকগুলোর চোখে-চোখে নিষ্ঠুর অবিশ্বাস, উপহাস, ঠোঁটে-ঠোঁটে বিদ্রূপের চাপা হাসি। হালিশহর তাকে বিশ্বাস করে না, শরিফা তাকে ঘৃণা করে। খোদার ঘরে তার ঠাঁই নেই। সে চোর, সে জেলখাটা দাগি। এখানে তার স্থান নেই। একটি আধআনির সাথে বিস্কুটটা সজোরে টেবিলের উপর ছুড়ে মেরে নূতন গামছার পুঁটলিটা কাঁধে ফেলে কারো দিকে একবারও না চেয়ে লাল মিয়া রওনা দেয় বিপরীত মুখে। এ-

BanglaBook.org

অমানুষের রাজ্য ছেড়ে সে এখুনি পালাবে। এখুনি সে চলে যাবে বিশ্বাসঘাতিনী শরিফার পরিবেশের বাইরে অনেক দূরে। সে লালু চোর। কিসের তার পরোয়া!

এ-পর্যন্ত বলে লাল মিয়া অনেকক্ষণ ধরে টেনে টেনে একটি নিশ্বাস নেয়। এমন দীর্ঘশ্বাস আমি কোনোদিন দেখিনি। তাতে যেন একটি বঞ্চিত জীবনের সমস্ত অকথিত বেদনা, সমস্ত অতৃপ্ত কামনা আগুনের হল্কার আকারে কথা হয়ে বেরিয়ে আসে। এমনি দীর্ঘশ্বাসের সাথে চোখের জল স্বাভাবিক। সেই স্বাভাবিক নিয়মের বুকে তুড়ি মেরে লালু নীরব। ভীতিজনকভাবেই নীরব। এতটুকু পানি নেই তার চোখে। এক অব্যক্ত বিষাদ ছড়িয়ে থাকে তার মুখে সন্ধ্যাকাশের সূর্যঢাকা কালো মেঘের মতো।

রাত জেগে জেগে তার কাহিনি শুনি। কয়েকবারই শুনেছি। প্রতিবারই মনে হয়েছে প্রথমবার শুনছি। রাতের সাথে সাথে কাহিনিও গড়িয়ে চলে। তার রক্তের সাথে মিশে রয়েছে ঘটনাগুলো। অসংখ্য রজনীর বোবা কান্নার সাথে জড়িত স্মৃতি থেকে উন্মোচিত কাহিনি। তার মধ্যে যেমন মিথ্যা নেই, ফাঁকি নেই, তেমনি তার বর্ণনার মধ্যে পাই একটি দূর অতিক্রান্ত বসন্ত আর অকালে ঝরে পড়া সে-বসন্তের দীর্ঘশ্বাস।

প্রকৃতির অকৃপণ সৌন্দর্যভাণ্ডার চট্টল শহরের উঁচুনিচু টিলায় উন্মুক্ত, উচ্চতম টিলার লৌহবেষ্টনীর মধ্যেও সে-সৌন্দর্যদেবতা উদার মহান। পুবে ছোট্ট ছোট্ট নীল পাহাড়ের হাতছানি, দক্ষিণে কর্ণফুলীর মুখে বঙ্গোপসাগরের উদাস বিস্তার। সাগরসিক্ত বাতাসের ঢেউ লৌহকপাটের মধ্যেও খ্যাপা নৃত্যে আত্মহারা। চট্টলনন্দন লাল মিয়া সে-হাওয়ার স্পর্শে আনমনা। গুনগুন করে একটি মাইজভাণ্ডারি গজলের কলি। ব্যথাকাতর হৃদয়ের করুণ আকুতি। তারপর?

স্কাইলাইটের উজ্জ্বল আলোয় কী যেন খুঁজছিল সে। আমার প্রশ্নে হঠাৎ চমকে উঠে মুখ তোলে।

এ-তল্লাটের ডাকসাইটে ডাকাত লালু সর্দার এবার তার জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাহিনিগুলোর বর্ণনা দেয়। ওমুক জায়গায় গেলাম। বাড়ির লোকজনদের মুখ বেঁধে দূরে ফেলে রেখে অত টাকা নগদ আর অত ভরি সোনার অলংকার নিয়ে এলাম ইত্যাদি ইত্যাদি। অত্যন্ত সাদামাটা কথায় কোনো রং না চড়িয়ে যেন হাটবাজার করার মতোই স্বাভাবিক ব্যাপার—এমনিভাবে লালু ডাকাত একটির পর একটি জীবনের পাতা খুলে দেয়। সে-কাহিনির মধ্যে অভাবনীয় কিছু নেই। একটি অধঃপতিত ডাকাতের দুষ্কর্মের লজ্জাকর ফিরিস্তি। দেহের লোমকূপগুলোও ঘৃণায় রি রি করে ওঠে। উদ্বেগের সাথে লক্ষ করলুম মানসিক বৈকল্য ঝানু অপরাধীদের পশুর পর্যায়ে নিয়ে আসে, লাল মিয়া তা থেকে মুক্ত নয়। ডাকাতি বা রাহাজানির কাহিনিগুলো (কতগুলো সত্যি সত্যি লোমহর্ষক আর হৃদয়বিদারক) বলতে বলতে লাল মিয়া অচেতনভাবেই প্রকাশ করে ফ্যালে নোংরা অপরাধী মনের অভিযান-প্রবণতা আর বনোদিয়ানার একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত। যে-কোনো ক্লাস

BanglaBook.org

অপরাধী এই বিকৃত মানসিকতার শিকার। অপরাধটাকেই তারা বিশেষ করে কারাগারে যশ ও কৃতিত্বের গাথায় সমৃদ্ধ করে। ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রকাশ করে। কে কত বড় ডাকাত তা নগণ্য চোরদের সম্মুখে বহুগুণ বাড়িয়ে বলে বাহাদুরি নেয়। কিন্তু এই বিকৃত মানসিকতার সম্পূর্ণ বিরোধী একটি সুস্থ মনোভাবসম্পন্ন লাল মিয়াকে দুর্বোধ্য করে তোলে। সর্দার ও ডাকাত হিসাবে সে যতই দুঃসাহসী আর নিষ্ঠুর হোক-না কেন, লালু ডাকাত দুর্বলচেতা। সে জেল-ভীতু। সে গৃহকাতর। কত সময় তাকে দেখেছি আনমনা আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে। অনেক দুপুরে লক্ষ করেছি বিশ্রামের পরিবর্তে লালু নির্নিমেষে চেয়ে রয়েছে কারাগারের উচ্চ প্রাচীরের অনুশাসন ডিঙিয়ে যে-সুউচ্চ দেওদার বৃক্ষ উঁকি দিচ্ছে, ঈষৎ হাওয়ায় দোলায়মান সেই দেওদারশীর্ষের পানে। তখন হয়তো সে ভেসে বেড়ায় অনেক দূরের সমুদ্রে। অনেক স্মৃতির প্রাচীর ডিঙিয়ে হয়তো সে চলে যায় কোনো নববধূর ত্রস্ত লঘু পদসঞ্চারে রোমাঞ্চিত গৃহআঙিনায়। আমার বহু বিনিদ্র রাত্রি লাল মিয়ার নীরব সাথিত্বে মুখর হয়ে উঠত। গভীর রাত্রি পর্যন্ত কোনো অপাঠ্য বই আঁকড়ে থেকে যখন প্রাণপণে ঘুমকে ডাকছি তখন লাল মিয়া অনেকক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে পাশে এসে বসেছে। অনিদ্রাজনিত স্বাস্থ্যের যে অবনতি হচ্ছে সে-সম্পর্কে আমাকে অবহিত করার চেষ্টা করেছে। এভাবে সে আলাপ জমিয়ে নিজেরই দুর্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে। শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে কতবার লক্ষ করেছি সে লোহার দরজার মোটা মোটা শিকগুলো দুহাতে চেপে ধরেছে। দেহের সমস্ত শক্তি দিয়ে যেন লৌহকপাটটিকে পিষে পিষে অণুপরমাণুর সাথে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দিচ্ছে। সেই অসম্ভব শক্তিপ্রয়োগের দরুন তার হাতে বুকের ক্ষতচিহ্নগুলো নজরে পড়েছে দিনের বেলায়। চাবুকের কাটার মতো লাল নীল ডোরা হাতে বুকে।

কারাগার নরক। এখানে মানুষকে পাগল করে, নিঃশেষ করে জীবন্মৃত ছেড়ে দেয়। এটা কোনো ঝানু অপরাধীর কথা নয়। এটা এক সুস্থ স্বাভাবিক মানুষ্যত্ববোধসম্পন্ন কারাবাসীর কথা। কথাটা লাল মিয়ার। হাজার কাজের মধ্যেও শ্রোতা পেলেই সে গল্প বলত, শ্রোতার সর্বপ্রকার বিরক্তি সহ্য করেই। বলার বিষয় একটি—বাইরের দুনিয়া কত সুন্দর, জেলখানা দোজখ। জেলে শাস্তিভয়, রক্তচক্ষুর উৎপীড়ন, বাইরে আনন্দ, সৌন্দর্য, শরিফার মতো লজ্জাবনতা লতাচিক্কণ বধূ। দীর্ঘ কারাবাসে অভ্যস্ত কোনো অপরাধী এমন করে বাইরের কথা বলে না, কারাগারকে তারা এমন করে ঘৃণা করে না। কিন্তু লালু ডাকাত কারাগারকে ঘৃণা করে। সে গৃহপাগল। বাইরের পৃথিবীর উন্মুক্ত প্রান্তর আর দিগন্তছড়ানো আকাশের নিচে উদ্দাম হাওয়ার মাতন তাকে হাতছানি দেয়। ডবল মুরিঙের পরিত্যক্ত গুদামে নৈশ অভিসার আলপথ ধরে অন্ধকারে চোখ বুজে গৃহ-প্রত্যাবর্তনের স্মৃতিটা মনের মধ্যে বড় সজাগ। এত বছর জেলে ভিন্ন জীবন, ভিন্ন আচার, নানা ভাষাভাষীর ভিন্ন পরিবেশে থেকেও লালু সর্দার এক মুহূর্তের জন্যও

BanglaBook.org

ভুলতে পারে না সদরঘাটের ধুলামলিন ঘিঞ্জি রাস্তার পেছনে বস্তি আস্তানার কথা। এটা কি দুর্ধর্ষ ডাকাত সর্দারের মানবীয় দুর্বলতা? অথবা রক্তমাংসে মজ্জাগত ডাকাতির নেশাই তাকে হাতছানি দেয়? কোনটা সত্য? অনেকদিন এ-প্রশ্ন মনে জেগেছে। জেলজীবনে আমি দ্বিতীয় কোনো ঝানু অপরাধী দেখিনি যে বাইরের পৃথিবীর জন্য এত পাগল। আকাশ তাকে এত উন্মনা করে তোলে! বরঞ্চ দীর্ঘ দিনের অপরাধপ্রবণ মন কারাগারকে শুধু মেনে নেয় না, তার প্রতি একপ্রকার বিকৃত মমতা অনুভব করে পুলক লাভ করে। একাধিক অপরাধীকে দেখে এই অভিজ্ঞতাই সঞ্চয় করেছি। তাই লালু ডাকাতের ঘরের নেশা আমায় বিস্মিত করেছিল সেদিন।

লালু চোর কীভাবে ধাপে ধাপে লালু ডাকাত, লালু সর্দারের মর্যাদা কুড়িয়ে মারাত্মক অপরাধীতে পরিণত হয়েছিল সে-কাহিনির বর্ণনা এখানে অবান্তর। লতাচিক্কণ বালিকাটির প্রত্যাখ্যান-বেদনা আর চোর পদবির গ্লানি ভুলতে গিয়ে লাল মিয়া কী সর্বনাশা নেশায় মেতেছিল সে-বিবরণও অবান্তর। শরিফাকে সে আবার সাধতে গিয়েছিল কি না, শূন্য ভিটেয় আবার ঘর তুলতে চয়েছিল কি না সে-কাহিনি অজ্ঞাত।

আমার চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে সে-দিনটি। দীর্ঘমেয়াদি কয়েদিদের দণ্ড মাঝে মাঝে পুনর্বিবেচনা করার জন্য কারাসমূহের ইন্সপেক্টর জেনারেলের নেতৃত্বে একটি বিশেষ বোর্ড রয়েছে। সেই বোর্ডের সুপারিশক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে একদিন লাল মিয়া মুক্তি পেয়ে গেল। সম্পূর্ণ অভাবনীয় এই মুক্তি-আদেশে সেদিন লাল মিয়া বিস্ময়, আনন্দে হতবাক হয়েছিল। নির্ধারিত মেয়াদের দুবছরে পূর্বে এমন হঠাৎ মুক্তি যে-কোনো কয়েদিকেই অভিভূত করত। কিন্তু লাল মিয়ার বিস্ময়পুলক বিস্ফারিত বক্ষে অবিশ্বাস সংশয় আনন্দের আলোছায়া, আনন্দানুভূতিতে থরো থরো কম্পমান হাত-পা তার ভীরু পদসঞ্চারণ সেদিন এক মধুর পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। বুকে বুক মিলিয়ে লাল মিয়াকে বিদায় দিয়েছিলাম। জয়ের উল্লাসে দ্রুত পদবিক্ষেপে, অনির্বচনীয় সুখানুভূতিতে প্রদীপ্ত হাসি ছড়িয়ে লাল মিয়া দৃষ্টির বাইরে অদৃশ্য হয়েছিল। শেষবারের মতো সে নরক থেকে বিদায় নিল।

কিছুদিন পর চট্টগ্রাম জেলে থাকতে থাকতেই লাল মিয়ার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে হতবাক হয়েছিলাম। দুঃখ বেদনায় হতবাক হইনি। লাল মিয়াকে বুঝতে পারিনি বলেই আত্মধিক্কারে বাক্‌রুদ্ধ হয়েছিলাম।

বিস্মিত গ্রামবাসীরা কোনো-এক সকালে তারই পরিত্যক্ত ভিটের সামনে সেই কুল গাছটির ডালে লাল মিয়ার ঝুলন্ত মৃতদেহটি আবিষ্কার করেছিল। কোন ছায়াঢাকা ভাঙা কুটিরের ছবি চোখে মেখে অথবা কোন স্পর্শভীরু লজ্জাবনতা নববধূর স্বপ্নসায়রে ডুব দিয়ে লাল মিয়া বিদায় নিল সে-জটিলতার সন্ধানে কেউ অগ্রসর হয়নি। সবাই জেনে রাখলে লালু ডাকাত আত্মহত্যা করেছে।

BanglaBook.org

যক্ষপুরী

বন্দির রাত্রি। কিছুতেই যেন ফুরোতে চায় না। প্রহরগুলো ভারী পাথরের মতো চেপে থাকে বুকের উপর। গেরস্তবাড়িতে যেমন করে হাঁস-মুরগিগুলোকে বেলা ডুবতে-না-ডুবতেই খোঁয়াড়ে পুরে দেয় তেমনি করে সেই বিকেল সাড়ে পাঁচটাতেই আমাদের ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে গারদের মধ্যে।

সময় ভক্ষণ করার সম্ভাব্য সকল উপকরণই মওজুদ। ক্যারাম-তাস-দাবা, বই পড়া, আড্ডা মারা সবই চলে। তবু মাঝে মাঝে মনে হয় সময় বড় আস্তে চলে। মনে হয় রাত্রিগুলো নিষ্করুণ দীর্ঘ।

জেলের ঘড়িতে ঢং ঢং করে নয়টা বেজে গেল। এরই মধ্যে মনে হয় নিশুতি-রাত্রির প্রেত নেমে এসেছে এই জতুগৃহে। কুয়াশাঢাকা চাঁদের আলো যেন মৃতের উপর কাফনের চাদর বিছিয়ে দিয়েছে। জানালার ফাঁক দিয়ে উঁচু বটগাছটির যে-ছায়া দেখা যায় হঠাৎ মানুষ বলে ভ্রম হয়। অদূরে তীব্র সার্চলাইটের আলোকে কেন্দ্র করে সহস্র পতঙ্গের মৃত্যুতাণ্ডব চলছে। আমার জানালার সামনে সেই সার্চলাইটের তীর্যক রশ্মি কুয়াশাচ্ছন্ন ফিকে জ্যোৎস্না, বটের ছায়া, সরু রাস্তাটির লাল সুরকি, সবুজ ঘাসের নাতিদীর্ঘ চত্বর সব মিলিয়ে আলোছায়ার এক মায়াবী পরিবেশ। আলো রয়েছে, চাঁদ রয়েছে, ঘর রয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মানুষ। সেই মানুষকে পাহারা দেওয়ার জন্য রয়েছে সেপাই সান্ত্রি। তবুও মনে হয় এ যেন ভূতুড়ে রাজ্য। সারাক্ষণ এক মরণযজ্ঞ চলছে। কী ভয়াল শক্তি সারাক্ষণ প্রাণকে টিপে টিপে মারছে, জীবনীশক্তি পলে পলে শুষে নিচ্ছে, মানুষের আত্মাকে পীড়ন করছে—তাই এত আয়োজন। এত আলো, চাঁদ, জ্যোৎস্নার কাফন।

যক্ষপুরীর ঘণ্টা বাজে। রাত্রি এগারোটা। স্টিমরোলারের মতো আমাকে পিষে পিষে জেলখানার রাত্রি এগিয়ে চলেছে। সাড়ে ছয় বছর পূর্বের আর-একটি রাত্রির কথা মনে পড়ল। ১৯৫২ সালের জুলাই মাস। মুসলিম লীগের জালেমশাহি যুগ। বন্দিশালাগুলো ভর্তি। আট নম্বর ডিগ্রি অর্থাৎ সেলে আটক আছি। তার আগে

BanglaBook.org

ছিলাম ছয় সেলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। ছয় সেল থেকে আট সেলে স্থানান্তরিত হওয়ার কাহিনিটি রীতিমতো উপভোগ্য। গোটা সেলটার মধ্যে রাজনৈতিক কর্মী মাত্র দুজন। বাকি সবাই বদ্ধ পাগল। একে তো অন্যান্য রাজনৈতিক বন্দির থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায় মনমেজাজ খারাপ। খেলবার ব্যবস্থা নেই, বেড়াবার বন্দোবস্ত নেই, সেলের দেয়ালের মধ্যেই কুঠুরিগুলোর সামনে তিন হাত চওড়া দশ হাত লম্বা একটুখানি সিমেন্টের চত্বর। সেই চত্বর থেকে একফালি আকাশ ছাড়া আর কিছুই দেখবার জো নেই। চব্বিশ ঘণ্টা ঘরের মধ্যে আটক থেকে মন যায় হাঁপিয়ে, একটু বাতাস, একটুখানি আলোর জন্য সে কী আকুতি! লাল ইটের দেয়ালে আঘাত খেয়ে চোখ আসে ফিরে। একটি সবুজ পাতা অথবা সেলের বাইরের সবুজ ঘাসের উপর একবার দৃষ্টিটুকু বুলিয়ে আনার জন্য গেট-পাহারার প্রতি কত আকুল আবেদন করতাম, সে-আবেদন ব্যর্থ হত।

এর উপর ছিল পাগলগুলোর নিত্যনৈমিত্তিক অত্যাচার। খেতে বসেছি চট করে দৌড়ে এসে তরকারির বাটিটা নিয়ে চলে গেল। বসে আছি হঠাৎ দিগম্বর হয়ে নাচতে শুরু করল। কুঠুরির বাইরে গিয়েছি, ফিরে এসে দেখলাম সেই ফাঁকে সমস্ত বিছানাপত্র ডুবিয়ে রেখেছে চৌবাচ্চার মধ্যে। এমনি হাজারো ধরনের উৎপাত প্রতিদিনই লেগে থাকত।

বিভিন্ন পাগলের বিভিন্ন ধরনের উৎপাত চলত। একজনের নাম ছিল গোলাম হোসেন। তার এই হাসি এই কান্না। হাসিকান্নার মাঝে সারাক্ষণ হিন্দি সিনেমার গান চলত উচ্চস্বরে।

আর-একজনের নাম ভুলে গেছি। তার বৈশিষ্ট্য ছিল শুধু হাসি। কখনও মিহি কণ্ঠে, কখনও উচ্চস্বরে, কখনওবা নিঃশব্দে।

তৃতীয় পাগল ছিলেন জনৈক মাদ্রাজি সাধু। সাধু বলছি তার গৈরিক বসনের জন্য। ইনি ছিলেন চিরমৌন। বোমা মারলেও তাঁর মুখ দিয়ে কদাচিত কথা বের হত না।

তিন পাগলের স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও পাগলামি আর উৎপাতের ক্ষেত্রে তাদের জাত ধর্ম ছিল এক। একসাথেই তারা মারামারি করত। একসাথেই আমাদের উপর হামলা করত।

সেলের নিঃসঙ্গতা আর পাগলের উৎপাতে অচিরেই আমাদের মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। আমরা অন্যান্য রাজবন্দির সাথে ওয়ার্ডে থাকতে চাইলুম। কর্তৃপক্ষ গররাজি। দয়দরবারে বিফল হয়ে রাজবন্দিদের একমাত্র অস্ত্র অনশনের নোটিশ দিলুম। নোটিশ দিয়ে দুজনে খাবার বন্ধ করে দিলুম।

সারাদিন না-খেয়ে রইলুম। কারাপালদের কারো টিকিটি দেখলুম না। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় জমাদার এসে খবর দিল আমাদের দাবি মঞ্জুর। বিছানাপত্র বেঁধে আমরা অন্যান্য রাজবন্দির সাথে মিলিত হবার জন্য মহাফুর্তিতে ইয়ার্ডের দিকে রওনা হলুম। কিন্তু গিয়ে পৌঁছালুম আট নম্বর সেলে। সেখানে অতিরিক্ত কারাপাল আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বললেন, এই ব্যবস্থাটি মাত্র এক

BanglaBook.org

সপ্তাহের জন্য হয়েছে। তার পরই আমাদের ইয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হবে। ইতিমধ্যে বেড়াবার অধিকারটুকু তারা আমাদের দেবেন। আট সেলের বাইরে আমরা সকালে আধা ঘণ্টা এবং বিকেলে আধা ঘণ্টা বেড়াতে পারব। সেদিনকার ঐ নিষ্ঠুর কৌতুকে একচোট হেসে নিয়েছিলুম।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের বিভীষিকা হল আট সেল। ফাঁসির ডিগ্রি, ফাঁসির দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিদের এখানে রাখা হয়। সেলের সংলগ্ন ফাঁসির মঞ্চ। জেলখানার অধিবাসীরা এই ডিগ্রিটিকে ভীতির দৃষ্টিতে দ্যাখে। পুরানো কয়েদিরা নূতন কয়েদিদের মনে ভীতির সঞ্চার করার জন্য এই ডিগ্রির কথা বলে। জমাদার-সিপাহি কয়েদিদের সন্ত্রস্ত করার জন্য এই ডিগ্রির নাম করে শাসায়। এই ডিগ্রিকে কেন্দ্র করে নানা সম্ভব অসম্ভব গল্প প্রচলিত আছে। জেলে ঢুকলেই পুরানো কয়েদিদের মুখে ঐসব গল্প শুনতে হয়। এই ডিগ্রিতে যারা যায় তারা নাকি আর জ্যান্ত ফিরে আসে না এই ধারণাটা নূতন কয়েদিদের মনে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়।

ইয়ার্ডে না যেতে পারলেও অনশনের ঠেলায় কারাকর্তৃপক্ষের নেকনজর পেলুম। সেই নেকনজরের ফলে মৃত্যুগুহাটি দেখে নেবার সুযোগ পাওয়া গেল। বেশ একটু রোমাঞ্চ অনুভব করলুম।

লক্ষ করলুম সেলটির আশেপাশে কোনো আবাসগৃহ নেই। পেছনে দেওয়াল। সামনে কাঠের কারখানা। ডান পাশে ফাঁসির মঞ্চ। বাঁ-পাশে গুদাম। সামনের কারখানাঘরটির ছাদ ছাড়িয়ে একটি উঁচু বটগাছ। সেই গাছের ডালে-ডালে কাক, শকুন, আরও বিভিন্ন ধরনের পাখির বাসা।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার। আমরা কয়েকজন ছাড়া আশেপাশে জনমানুষের সাড়া নেই। কিন্তু কাক শকুনের কোলাহলে বটবৃক্ষটি সজাগ। ফাঁসির মঞ্চটি এক নজর জরিপ করে দরজার ভিতরে আসছি এমন সময় আমাদের বুড়ো ফালতু সুবু মিয়া চোখের ইঙ্গিতে আমাকে থামিয়ে দিলে। হাতের উপর একটুখানি চাপ দিয়ে খুব নিচু কণ্ঠে অন্তরঙ্গ হয়ে বললে, "একটু সাবধানে থাকবেন সাহেব। রাত্রে জিন প্রেত আসে।" তারপর 'সুরা ইয়াসিনে'র প্রথম দুটি লাইন আবৃত্তি করে বললে, "যখনই ভয় আসবে মনে তখুনি এই কলেমাটা পড়বেন।" সুবু মিয়ার ভীতসন্ত্রস্ত চোখমুখ দেখে মায়া হল। সাহস দিয়ে বললুম, "ওসব বাজে কথা, কুসংস্কার।" সে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করে হাত মুখ নাড়তে নাড়তে জবাব দিল, "বলেন কী সাহেব! অমন কথা মুখেও আনবেন না।"

তার সাথে তর্ক বৃথা। আলোচনাটার ইতি টেনে বললাম, "আচ্ছা ঠিক আছে। আসুক-না জিন প্রেত তখন দেখা যাবে।" সুবু মিয়া হাল ছেড়ে দিয়ে সুরা ইয়াসিন পড়তে পড়তে চলে গেল খাবার ভাগ করতে।

সেলের মধ্যে ঢুকে সত্যি গাটা ছমছম করে উঠল। মনে হল বহুদিনের পরিত্যক্ত কোনো পোড়োবাড়িতে এসে পড়েছি। জানালাবিহীন কুঠুরিগুলো কবরের মতোই ক্ষুদ্র আর ভয়াল। আমার মতো বেঁটে লোককেও ঘরের মধ্যে ঢুকতে হল মাথা ঝুঁকিয়ে। নিচু ছাদটির দিকে তাকালে মনে হয় যে, কোন সময় বুঝি হুমড়ি

BanglaBook.org

খেয়ে পড়বে গায়ের উপর। কুঠুরিতে গিয়ে যখন দেখলুম ঘরে বসে এক টুকুরো আকাশ দেখারও কোনো উপায় নেই, তখন কান্না পেল। এই মৃত্যুগুহায় কেমন করে দিন কাটাব? কতদিন এই কবরে জীবন্মৃত পড়ে থাকতে হবে? দুঃসাহসের শরণাপন্ন হলুম। যখনই দুর্যোগের মুখে পড়েছি তখুনি দেখেছি মনের এই দুঃসাহসী সত্তাটি আমার সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। এই সত্তাটি সহজাত কি না জানি না। স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবনে এর অস্তিত্ব অনুভব করি না। কিন্তু অন্ধকার দুর্যোগে আশা দীপের মতো হঠাৎ জ্বলে ওঠে। এই সত্তার কোনো আকারিক রূপ বা ব্যাকরণ সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়। মনের এই বিশেষ অবস্থায় সুতীব্র ঘৃণা আর দুঃসাহস মিলিয়ে বিপদকে তুচ্ছ করতে শেখায়, দেহে শক্তির ছন্দ জাগায়। সেই শক্তিদেবতার আরাধনা করতে করতে জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নিচ্ছিলুম। হঠাৎ গোলাম হোসেনের হাউমাউ কান্নায় বেরিয়ে আসতে হল। দেখলুম গোলাম হোসেন তার সেলের সামনে হাত-পা ছুড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর উঁচু রবে বিলাপ করছে—হাম নেহি যায়গা, হাম নেহি যায়গা।

যারা পাগল তারা যে কখনও ভয় পেতে পারে এটা আমার জানা ছিল না। আমাদের তিন পাগল আজ সত্যি ভয় পেয়েছে। যে-মুখগুলো হরদম ত্রিভুবনের শ্রাদ্ধ করে চলত বিকেল থেকে তাদের মুখে টুঁশব্দটি নেই। নীরব পাগলটি কম্বলমুড়ি দিয়েছে।

অনেক কষ্টে গোলাম হোসেনকে শান্ত করে তার বিলাপের হেতুটি জানা গেল। সে সেলে ঢুকে বিছানাপত্র গোছাচ্ছিল। বাতি তখনও জ্বলেনি। কুঠুরির মধ্যে আবছা অন্ধকার। হঠাৎ সে লক্ষ করলে তার পেছনে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। আস্তে আস্তে লোকটা এগিয়ে এল। গোলাম হোসেন কাঁধের উপর তার তপ্ত নিশ্বাস অনুভব করলে। ভয়ে কাঠ গোলাম হোসেন ধপ করে বসে পড়লে। দেখলে একটি মিশকালো মরদেহ ধীরে ধীরে ছাদসমান উঁচু হয়ে তার কাঁধে হাত রাখলে। গোলাম হোসেন কিছু বলতে যাবে এমন সময় মরদেহ বিকট এক ফালি দাঁত বের করে হি হি করে হেসে উঠল। সেই হাসির ধাক্কায় গোলাম হোসেন ছিটকে বাইরে এসে পড়েছে। এখন সে বায়না ধরেছে ঘরে যাবে না। সে আমার ঘরে শোবে।

চোখ রাঙিয়ে কপট রাগ দেখিয়ে বললাম—ব্যাটা দিব্বি গল্প বানিয়ে বলছে, আবার এদিকে পাগল সেজেছে। চোপ রাও।

প্রত্যুত্তরে গোলাম হোসেন আমার পায়ের উপর আছড়ে পড়লে—নেহি বাবুজি, হাম সাচ বোলতা, ক্যরা ঘরমে ফাঁসিকা ভূত আয়া থা। হামকো মার ডালেগা। মার ডালেগা।

আমার ঘরে তাকে নিয়ে যাব এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে পাজোড়া ছাড়িয়ে নিলুম। দেখলুম গোলাম হোসেনের রক্তহীন মুখে মৃত্যুভয়। মৃত্যুকে পাগলও ভয় করে।

জমাদার সিপাহির সাহায্যে গোলাম হোসেনকে ঘরে ঢুকিয়ে তালা বন্ধ করে দেওয়া হল।

BanglaBook.org

আমরাও যে যার কুঠুরিতে ঢুকে পড়লুম। সংক্ষিপ্ত খানাপিনা সেরে বিছানায় হেলান দিয়ে জিন পরীর প্রতীক্ষা করতে লাগলুম। ছোট্ট দরজা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাসের হালকা ঢেউ ক্বচিৎ এসে ছড়িয়ে পড়ছে কুঠুরির মধ্যে। বাইরে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-চারটি তারা। অখণ্ড নীরবতার মাঝে বটপাতার খসখস, পাখির ঝাপটা, গুদামের টিনে আঘাত-খাওয়া বাতাসের ভাঙা কান্না যেন অন্ধকার রাত্রিকে প্রাণের সন্ধান দিচ্ছে। গোলাম হোসেনের চিৎকার বন্ধ। বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। একটা বই টেনে মন লাগাতে চেষ্টা করলুম। সারা দিনের উপোস আর মানসিক শ্রান্তিতে শরীর ভেঙে এল। বেশক্ষিণ বইয়ে মনোযোগ দিতে পারলুম না। ঘুমঘোর চোখে মশারিটা ফেলতে যাব এমন সময় দমকা হাওয়ার টানে টেবিলের আয়নাটা পড়ে চুরমার হয়ে গেল। আর-এক দমকায় বইপুস্তকগুলো ছড়িয়ে পড়ল মেঝেয়, মশারির দড়িটা গেল ছিঁড়ে। প্রচণ্ড বেগে বাতাস বইতে লেগেছে। লৌহকপাট খটখট করে নড়ে উঠল। বিছানাপত্র তছনছ হয়ে গেল। বটের ডালে পাখিকুলের সুখনিদ্রা ভেঙে গেল। বাসাগুলো ছিটকে পড়ল গুদামের ছাদে আমাদের সেলের দরজায়। আশ্রয়হীন পাখিদের আর্তচিৎকারে, বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে আট ডিগ্রির আবহাওয়াকে আরও ভয়াল করে তুলল।

সাথে সাথেই শুরু হল গোলাম হোসেনের চিৎকার। সে কী কানফাটা চিৎকার! সিপাহি সাহেব ইধার আও। হাম মর জাতা, হামকো বাঁচাও। ঝড় উঠল। ঝড়বৃষ্টির তুমুল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল। সাথে সাথেই নামলে বৃষ্টি।

দুটি দমকাতেই ভিজে চুপসে গেলুম। এক-একটি ঝাপটা আসে আর সবকিছু ভিজিয়ে দিয়ে যায়। মেঝেটি ভিজে গেল। বিছানাপত্র, বইপুস্তক সবই ভিজে একাকার। এরই মধ্যে বাতিটি গেল নিবে। তারস্বরে সিপাহি সাহেব, জমাদার সাহেব সকল সাহেবেরই আরাধান করলাম। কিন্তু ঝড়ের তাণ্ডবের মুখে আমার সেই চিৎকার ভেসে গেল। সিপাহি জমাদার কারো সাড়া নেই। পাশের সেল থেকে জ্ঞানবাবু চিৎকার করে বারবার কী যেন বলছিল। পানির ঝাপটা থেকে কান দুটোকে রক্ষা করার জন্য দুহাত চেপে ধরলুম। চোখ বুজে লৌহকপাটের শিকের উপর মুখ রেখে জ্ঞানবাবুর কথাগুলো শুনতে চেষ্টা করলুম। অনেকক্ষণ চেষ্টা করে তাঁর ক্ষীণ আওয়াজের অর্থটি বুঝাতে পেরে নিজের বোকামিতে লজ্জা পেলুম। তাড়াতাড়ি খাট থেকে গদিটি নামিয়ে নিলুম। দেখলুম নারিকেল ছোবড়ার আধ হাত পুরু গদিটির উপরিভাগ সম্পূর্ণ ভিজে। নিচের ভাগ পর্যন্ত পানি এখনও পৌঁছাতে পারেনি। সেই গদিটি সেলের দরজার উপর লম্বালম্বি খাড়া করে দিয়ে বৃষ্টির ঝাপটা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে লাগলুম। এই সামান্য বুদ্ধিটুকু কেন যে এতক্ষণ পর্যন্ত মাথায় খেলল না ভেবে অবাক হলুম। কিন্তু অচিরেই নিশ্চিন্ত আরামের স্বপ্নটি গেল ভেঙে—বাতাসের ধাক্কায় গদিটি ধপ করে মাথার উপর এসে পড়ল। প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়ে গদিটি আবার দরজার উপর খাড়া করে দিয়ে একটি অতিরিক্ত ব্যবস্থা নিলুম। পিঠ দিয়ে গদিটি দরজার শিকের উপর চেপে ঠায়

BanglaBook.org

দাঁড়িয়ে রইলুম। ফলটা বিশেষ উপভোগ্য হল না। ঝোড়ো হাওয়ার দমকে দমকে গদিটির সাথে সাথে আমি পেন্ডুলামের মতো সামনে-পিছনে কসরত করতে লাগলুম। বৃষ্টির দাপট থেকেও রেহাই পেলুম না। দরজার তুলনায় গদির প্রস্থটি ছোট হওয়ায় একটু ফাঁক হয়ে থেকে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে বর্শার ফলার মতো বৃষ্টি এসে ক্ষতবিক্ষত করছিল শরীরের বাঁদিকটা। বাম কান আর বাম বাহুটির সমস্ত চেতনা লুপ্ত হল। ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা যখন অসম্ভব হয়ে উঠল তখন মাথায় আর-একটি নূতন বুদ্ধি খেলে গেল। লোহার খাটিয়াটি তুলে গদির উপর চেপে দিয়ে ভিজে মেঝের উপরই ক্লান্ত দেহটি ছড়িয়ে দিলুম। রাত্রি বারোটার সময় ঝড়ের প্রকোপ কমল। বৃষ্টিও আরও ঘণ্টাখানেক চলে থেমে গেল।

হাঁকডাক করে এবার সিপাহিজিকে পাওয়া গেল। তার কাছ থেকে আগুন নিয়ে একটি বিড়ি ধরালাম। পরপর তিন-চারটি বিড়ি টেনে ঠাণ্ডা দেহটিকে একটু চাঙ্গা করে সেই গভীর রাত্রে বিধ্বস্ত ঘরটি পুনঃসংস্কারে লেগে গেলুম। চামড়ার সুটকেসটি পানি খেয়ে ফুলে উঠেছিল। কিন্তু ভিতরের কাপড়গুলো শুকনোই ছিল। কাপড় বদলিয়ে খাট গদি যথাস্থানে ফিরিয়ে আনলুম। ঘুমের চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলুম একটি কম্বলও শুকনো নেই। সব চাদরই ভিজে। অগত্যা ঘুমকে বিদায় জানিয়ে দরজার সামনের জায়গাটুকু মুছে নিয়ে বসে বসেই রাত্রিজাগরণের ব্যবস্থা করলুম। বাইরের প্রকৃতি শান্ত ছেলের মতো নিস্তব্ধ। কে বলবে একটু আগে এত বড় ঝড়ের তাণ্ডব বয়ে গিয়েছে। বটের ডাল থেকে কখনও কখনও এক-আধ ফোঁটা বৃষ্টির পানি গুদামের টিনের ছাদের উপর টপ করে পড়ে রাত্রির মৌন ভঙ্গ করছে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে বৃষ্টি আসে ফিরে। আকাশের তারাগুলো প্রথম রাত্রির তুলনায় উজ্জ্বলতর। সেই অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে সেদিন একটি কথাই বারবার মনে হয়েছিল, কয়েদখানার নিঃসঙ্গ সেলজীবন অপেক্ষা অধিকতর পীড়াদায়ক আর কিছুই হতে পারে না। বন্ধু-সাথিতে সমগ্র জেলখানাটিই ভর্তি। অথচ এই দুর্যোগের রাত্রিতে কেউ কাউকে দেখতে পারছে না। একটি প্রয়োজনের হাত নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধুকে এগিয় দিতে পারছে না। এর চেয়ে নিষ্ঠুরতম নির্যাতন আর যে কিছু হতে পারে তা ভাবা যায় না। বন্দিজীবনের ভয়ংকর অভিশাপ এই সেলজীবন।

সেই ঝোড়ো রাত্রির সাথে আজকের রাত্রির কোনো তুলনা হয় না। এই শীতের রাত্রে কম্বল গায়ে দিয়ে হারিকেন সামনে রেখে লিখছি। লেখার ফাঁকে ফাঁকে খোলা জানালা দিয়ে বাইরের আলোকিত পৃথিবীর ছবি প্রতিচ্ছবিগুলো মুখ তুলে দেখছি। আজ কেন সেই অন্ধকার দুর্যোগ রাত্রির কথা মনে পড়ল? দুই রাত্রির মধ্যে কোনো সাদৃশ্য রয়েছে কি? হয়তো আছে।

যক্ষপুরীর ঘণ্টা বাজে। এক দুই তিন চার। বন্দিশিবিরের একটি রাত্রি খসে পড়ল। আর-একটি প্রভাত নেবে এল।

BanglaBook.org

রূপান্তর

প্রতিভা তার ছিল, এখনও আছে। সে তা-ই মনে করে। যে-শৌর্য, দৃঢ়তা আর মনের তেজ তার ছিল এবং এখনও আছে এমন আর কয়টি বাঙালি যুবকের আছে? মনে পড়ে তার অনেকদিন আগেকার সেই ছোটবেলার একটি ঘটনা, তখন সে একটুখানি, মাত্র প্রথম শ্রেণীর ছাত্র। কী বার ছিল সেটা মনে পড়ছে না। তবে সেই বিশেষ দিনটির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল ছাত্র মাস্টার সবাই মিলে প্রায় দুমাস ধরে। বিভাগীয় স্কুল ইন্সপেক্টার স্কুল পরিদর্শন করতে আসবেন কিনা? ওস্তাদরা তটস্থ, ছাত্ররা ভয়সংকুল। এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে ইন্সপেক্টার সাহেব যখন ক্লাসে ঢুকছিলেন তখন তার কোমল বুকখানা কাঁপছিল দুরুদুরু। ইন্সপেক্টার সাহেব ঢুকেই এক দুরূহ প্রশ্ন করে বসলেন—সমীরণ শব্দের বানান ও মানে বলতে হবে। বত্রিশ জন ছাত্রই যখন বিফল হল তখন এল তার পালা। গলা সাফ করে সে মানে বলল—বায়ু আর বানান করল দন্ত্য স, ম দীর্ঘই, র, মুর্ধন্য-ন—সমীকরণ। ইন্সপেক্টার সাহেব সহাস্যে তার পিঠ চাপড়ে বলে উঠলেন 'শাবাশ!' খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মাস্টার সাহেবের মুখ, আর অবাক বিস্ময়ে চেয়ে ছিল ক্লাসের সহপাঠীরা। গর্বে ফুলে উঠেছিল তার বুক। ক্লাসে সে বরাবরই প্রথম হত। কী খেলাধুলা, কী বিতর্কে সে ছিল ক্লাসের ঈর্ষার পাত্র। সপ্তম মানে উঠে সে আবার একআধটু লেখাজোখাও শুরু করে। স্কুল ম্যাগাজিনে যখন তার প্রথম কবিতা ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করে সে-দিনটি কিছুতেই ভোলার নয়। সে এক অপূর্ব রোমাঞ্চ! অদ্ভুত পরিতৃপ্তি আর অবাক বিস্ময় নিয়ে সে চেয়ে ছিল সুন্দরভাবে সাজানো ছাপার অক্ষরগুলোর দিকে। ঐ অক্ষর কয়টির মধ্যে সে দেখতে পায় প্রতিভার আলোকে উদ্ভাসিত অনাগত ভবিষ্যতের হাতছানি।

মোমবাতি আছে, মোমবাতি? চার পয়সার মোমবাতি দেখি! চমকে ওঠে করিম, চোট পড়ে তার চিন্তার সূত্রে, খদ্দের বিদায় দিয়ে গজগজ করতে থাকে

BanglaBook.org

নিজের উপরই বিরক্তিবশত। কী লাভ পুরানো দিন আর ধসে-পড়া স্বপ্নের কথা ভেবে!

অর্থহীন চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যই টেনে নেয় ছেঁড়া গেঞ্জিটা টুলের তলা থেকে। চকলেটের বয়ামগুলো সাফ করতে লেগে যায়। তকতকে ঝকঝকে বয়মাগুলো। তবুও আরও পরিষ্কার থাকা চাই—ওতেই পরম তৃপ্তি। সারাদিন টুলের উপর বসে বসে রাস্তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কাজই-বা আর কী? দোকানটাই-বা তার কত বড়?

তার উপর আজকাল খদ্দের তো একরকম নেই বললেই চলে। যা-ও দু-চারজন আছে তাদেরও বেশির ভাগ দামদস্তুর করেই খালাস। লোকেরই-বা দোষ দেওয়া যায় কেমন করে? ট্যাঁকে পয়সা থাকলে তো তারা জিনিস কিনবে! হঠাৎ তার নজরে পড়ে রাস্তার উলটোদিকে কতগুলো ছোকরা পোস্টার লাগাচ্ছে "ভাইসব—পূর্ববঙ্গের কারাগারে আজও ৪০০ দেশপ্রেমিক বিনাবিচারে আটক, এই বীর সন্তানদের তিলে তিলে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার আমার সকলের। অদ্যকার বন্দিমুক্তি সভায় দলে দলে যোগ দিন।" হাতে আঠার টিন, বগলে গাদাগাদা কাগজপত্র, একজনের হাতে আবার একটা চোঙা—ছেলেগুলো তার দোকানের দিকেই এগিয়ে আসে। দোকানের পাশে ফাঁকা জায়াগাটুকুতে পোস্টার লাগাতে শুরু করে।

না না, এখানে ওসব লাগাবেন না—প্রতিবাদ করে করিম। ডোন্ট কেয়ার ছোকরাগুলো তার কথা কানেই তোলে না। পুলিশে খবর দেব বলছি, বলতে বলতে টুল ছেড়ে করিম দোড়গোড়ায় আসে। ততক্ষণে ছোকরাগুলো পোস্টার সেঁটে দিয়ে দিব্বি সটকে পড়েছে। চৌমাথায় গিয়ে চোঙাওয়ালা ছেলেটা বক্তৃতা শুরু করেছে। গলা কাঁপিয়ে "বন্ধুগণ...আমাদের প্রিয় নেতাদের বন্দিশালা থেকে মুক্ত করতেই হবে—এ-শপথ আজ পূর্ববঙ্গের সাড়ে চার কোটি লোকের মুখে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছে—" আচমকা তীরের মতো করে ছোড়া এক টুকরো ছাপা কাগজ এসে পড়ে ঠিক তার গলার কাছে। কৌতূহলী হয়ে দ্যাখে...আজাদির সৈনিকদের মুক্তির দাবিতে এগিয়ে আসুন...৪০০ রাজবন্দি। বিরক্ত হয়ে সে ছুড়ে ফেলে দেয় ইশতেহারটি। কী মনে করে আবার কুড়িয়ে নেয়, ভাঁজ করে রেখে দেয় বুকপকেটে।

...ম্যাট্রিক সে পাশ করেছিল প্রথম বিভাগে বৃত্তি নিয়ে, তারপর তরুণ মন, বুকে বল আর চোখে আগামীর উজ্জ্বল স্বপ্ন নিয়ে সে এল ইসলামিয়া কলেজে পড়তে। বর্ধমানের অজপাড়াগাঁ ছেড়ে সেই প্রথম তার কলকাতায় আসা, কলেজে ঢুকেই সে হয়ে উঠল সবার প্রিয়। কী অধ্যাপকদের খাসকামরা, কী সিনিয়র ছাত্রদের আড্ডায়, কী সাহিত্য—আসরে সর্বত্র তার অবাধ গতি।

ঠিক সেই সময় এল কায়েদে আজমের আহ্বান—পাকিস্তান হাসেলের জন্য প্রত্যক মুসলমানকে জানমাল কোরবানের আহ্বান। এক বছরের জন্য

BanglaBook.org

ছাত্রসমাজকে পড়াশোনা পরিত্যাগের আহ্বান। ঢেউ এসে লাগল ছাত্রদের বুকে। সেই ঢেউ ভাসিয়ে নিল করিমকে। তার মুখে ফুটল বক্তৃতার তুবড়ি, কলম চলল অবিশ্রান্ত বেগে। প্রকাশিত হল তার অগ্নিগর্ভ রচনা—ছাত্রসমাজের ঐতিহাসিক কর্তব্য। পাকিস্তান ও আমরা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশের কারসাজি, এমনি আরও কত কী এক বছরের মধ্যে—সে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তুলল মুসলিম লীগ মহলে বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে। নেতাদের মহলে তার সদা-নিমন্ত্রণ। ছাত্রদের সে প্রিয় করিম ভাই। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক চটপট ছাপিয়ে দেন তার বিবৃতি মোটা শিরোনামায়—ছাত্রনেতা আবদুল করিমের দৃপ্ত ঘোষণা, এমনি সময় একদিন সে কলেজ ছেড়ে দিল। শপথ করল আজাদি হাসিল না হওয়া পর্যন্ত আর পড়াশোনা নেই। এই তার অভিষ্ট পথ, এ-পথেই তার প্রতিভার সম্যক স্ফুরণ, আত্মত্যাগ আর দেশসেবার উচ্চাদর্শের মধ্যেই তার জীবনের বিকাশ—স্থির সিদ্ধান্ত করে ফেলল করিম। সেদিন থেকে তার কবিতা লেখাও শেষ হয়। আজ এসব কথা ভাবতে অবশ্য তেমন উৎসাহ সে পায় না। বরঞ্চ কেমন যেন এক গ্লানিকর তিক্ততায় মন হাঁপিয়ে ওঠে। তার পরের ঘটনাগুলো ঘটেছে বিদ্যুৎগতিতে। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা, পিতার মৃত্যু, ভিটামাটি ছেড়ে বিচিত্র মায়ার হাত ধরে তার পাকিস্তানে আগমন। তার জীবনে সেলের মতো বিঁধে আছে ঘটনাগুলো। এতকিছুর জন্য সে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কত অস্বাভাবিক কত অযৌক্তিক মনে হয় তার ঐসব দিনের উন্মাদ ঘটনাবলি।

কী হে? বেচা-বিক্রি কেমন? জিজ্ঞেস করে পাশের তামা-পিতলের দোকান থেকে মুখ বাড়িয়ে মকবুল। আ...র কেমন, বেচাকেনা কোথায়? টেনে টেনে উত্তর দেয় করিম। অনাবিল চিন্তাস্রোতে বাধা পেয়ে সে বিরক্ত হয়, ঝাঁজিয়ে ওঠে—শালার দেশটাও উচ্ছন্নে যেতে বসেছে। মকবুল তার কথা শুনে হাসে—যা বলেছ, একেবারে খাঁটি কথা।

২৫/৩০ বছরের একটি ভিখারিনি ছেলে-কোলে তার তকতকে ঝকঝকে কাচের বয়ামের উপর হাত রেখে করুণ সুরে নিবেদন করে—কাল থেকে উপোস আছি বাবা, দুটো পয়সা দাও বাবা।

ভাগ ভাগ, আবার হাত রেখেছে কোথায় দ্যাখো!—নে নে, হাত সরা, হাত সরা। খেঁকিয়ে ওঠে করিম। ভিখারিনি হামেশাই এসব কথা শুনতে অভ্যস্ত। তাই তেমনি মিনতিভরা চোখ তুলে তাকিয়ে থাকে নীরবে। একটা আধআনি ছুড়ে দেয় করিম—যা যা, ফের আসবি তো ঝাঁটার বাড়ি খাবি।

সন্ধ্যা মাত্র এসেছে। হারিকেনটি জ্বালিয়ে দোকানের সামনেটায় টাঙিয়ে হিসাব করতে বসেছে করিম। এমন সময় এসে ঢোকেন মির্জা সাহেব। সেই পুরানো প্রশ্ন, কী ঠিক করলেন, করিম সাহেব? করিমেরও তেমনি বাঁধাধরা উত্তর—সবাই মিলে যা ঠিক করে আমিও তা-ই করব।

BanglaBook.org

একথা রোজই শুনছি। কিন্ত সবাই মিলে আপনারা কী ঠিক করলেন সেটা অন্তত বলুন।

মির্জা সাহেবের কিছু পিছেই এসেছিল মিউজিক্যাল মার্টের আসগর, পেপার ডিপোর খালেদ, আরও তিন-চারজন। খালেদ এগিয়ে এসে বলে—রিফিউজি মার্কেটের সবাই মিলে আমরা ঠিক করেছি পালটা ব্যবস্থা না করে দিলে এখান থেকে সরছি না।

পালটা ব্যবস্থাটা কী, শুনি।

ঝাঁজের সুরে জিজ্ঞেস করেন মির্জা সাহেব।

ইতিমধ্যেই এসে জুটেছে 'পূর্ব-পাক অ্যালুমিনিয়াম স্টোর্সে'র মকবুল। সে-ই এগিয়ে এসে উত্তর দেয়, পালটা ব্যবস্থা খুব সোজা। ঐ যে মতিঝিলের পাশে নূতন রাস্তা হচ্ছে সেখানে আমাদের জায়গা করে দিন—আমরা দোকানপাট সেখানে সরিয়ে নিচ্ছি, এতে লোকসান নাহয় আমাদের কিছু হল।

কিন্তু সে-ব্যবস্থা আমি কী করে করি! আমি যে এতগুলো টাকা দিয়ে জায়গাটা কিনলাম সে কি পানিতে ফেলার জন্য? আপনারা সরকারের কাছে যান না কেন?

এবার চড়া সুর মির্জা সাহেবের।

ঐ জায়গাটাও তো আপনার।

কে যেন চেঁচিয়ে বলে ওঠে। মির্জা সাহেবের চড়া গলা আর কথা-কাটাকাটি শুনে রিফিউজি মার্কেটের আরও অনেকেই এতক্ষণ এসে জুটেছে। রীতিমতো ভিড় জমেছে আর জটলা পেকে উঠেছে।

দেখুন সরকারের কাছে আমরা গিয়েছি, আরও যাব...আরে সরকার ভি তো ওসাই হ্যায়...ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে।

আরে ভাই থামো, একজনকেই বলতে দাও।—আর-একজন তাকে থামায়।

মবকুল বলে চলে, ভাই, সরকারের সাথে ফয়সালা আমাদের নিশ্চয়ই করতে হবে। কিন্তু...একটু থেমে ঢোক গিলে নেয় মকবুল।

...বাপদাদার ভিটা ছেড়ে সর্বস্ব খুইয়ে আমরা সহায়সম্বলহীন অবস্থায় এখানে এসেছি বাস্তুহারা হয়ে। হাজার হাজার মাইল দূর থেকে আমরা এসেছি এখানে বসবাস করতে। আর এই প্রায় ৫০০ মিলে, সবার শেষ সম্বলটুকু দিয়ে আমরা দোকানগুলো গড়ে তুলেছি। নিজের হাতেই মাটি কেটে বড় বড় পুকুর ভরাট করেছি, নিজেদের গতর খাটিয়ে খড়ের ঘরগুলো গড়েছি। আর এই দোকানগুলোই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা, এ থেকেই দুবেলা দুমুঠো অন্ন আমাদের জোটাতে হয়। কাজেই আপনি হুট করে উঠে যাও বললেই আমরা উঠতে পারি না।

রীতিমতো বক্তৃতার মতো শোনায় মকবুলের কথাগুলো।

এতগুলো কথা বলে সে প্রায় হাঁপিয়ে ওঠে। কপালের ঘাম মুছে সে তাকায় সবার দিকে সমর্থনের আশায়। সকলেই নীরব। সে জানে ৫০০ বাস্তুহারা

BanglaBook.org

পরিবারের অন্তরের কথার প্রতিধ্বনিই সে করেছে। গত তিন বছর ধরেই সে কদমতলি রিফিউজি Shop owners & Hawkers association-এর সেক্রেটারি। প্রতিটি পরিবারের নিদারুণ আর্থিক দুর্গতির খবর সে রাখে।

কী বল, তোমাদের মত কী?

তেমনি চড়া স্বরেই আবার জিজ্ঞেস করেন মির্জা সাহেব।

সেক্রেটারি সাহেব যা বলেছেন—একসঙ্গে অনেকগুলো গলাই প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

মির্জা সাহেব একটু বেকায়দায় পড়ে যান বইকি, কিন্তু ঘাবড়ানোটা তাঁর স্বভাববিরোধী। মানুষ চরিয়েই তো তাঁর জীবন কেটেছে। লোকচরিত্রের জটিলতম দিকগুলোর সাথেও তাঁর পরিচয় বহুদিনের। একটু সবুর করে তিনি ধমকে ওঠেন—ও, তোমরা বুঝি সব জোট পাকিয়েছ? ছাড়বে না জায়গা? আচ্ছা তবে দেখি আমি কী করতে পারি!

এক পা দুপা করে ভিড় ঠেলে বের হবার চেষ্টা করেন মির্জা সাহেব আর তাঁর শেষ বাণ কতটুকু মর্মস্থলে গিয়ে বিঁধেছে তাও এদিক-ওদিক তাকিয়ে আঁচ করবার প্রয়াস পান। লোকগুলো বেজায় নাছোড়বান্দা, যেন একটা হেস্তনেস্ত এখুনি করে ফেলবে। ফাজিল গোছের একটা ছোকরা ইয়ারের কাঁধে হাত রেখে টিপ্পনী কাটে, ব্যাটার রোয়াব দেখেছিস? অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠরা শান্ত, আখেরি সম্বল রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। শেষ কথা জানিয়ে দেয় মকবুল—আমাদের ৫০০ পরিবারের বাঁচা-মরা নির্ভর করছে এই দোকানগুলোর উপর। আপনি আর-একটু ভেবে দেখুন মির্জা সাহেব।

করিম সবই দ্যাখে, সবই শোনে। বিধবা মায়ের শেষ সম্বল আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কী অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দিয়ে সে গড়ে তুলেছে তার পাক বুক সিন্ডিকেট ও জেনারেল স্টোরস। এই দোকানটিকে কেন্দ্র করেই সে স্বপ্ন রচনা করে, আশা রাখে ছিন্নমূল বিপর্যস্ত জীবন আবার দানা বাঁধবে। রিফিউজি মার্কেটের সবকিছুকেই ঘিরে রয়েছে অমনি কত মায়ের অশ্রুজল, কত নুয়ে-পড়া বৃদ্ধের আশা-ভরসা, তারই মতো কত আদর্শদীপ্ত যুবকের ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও বিশ্বাস। প্রথমে সবাই শুরু করেছিল শুধু চটের ছাউনি আর গুটিকয় কেরোসিন কাঠের বাক্স দিয়ে। অনেকের আবার তাও ছিল না—শুধু জমিনের উপরে শতচ্ছিন্ন এক টুকরো চট বিছিয়ে সাজিয়ে রাখত গুটিকয় কৌটোভরা পণ্য। দুপয়সা, চার পয়সা যা রোজগার হয় তা-ই সই। তারপর চার বছরের তিল তিল প্রচেষ্টায় কেউবা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে নিয়েছে নিজ নিজ জায়গাটুকু, কেউবা লাগিয়েছে টিনের ছাউনি, কেউবা চট আর কেরোসিন কাঠগুলোকে সস্তা লাল নীল রঙে ভদ্রস্থ করেছে মাত্র। বিচিত্র ঢঙের ছড়া আর বিচিত্র অঙ্গভঙ্গি করে খদ্দের ভেড়াবার চেষ্টায় প্রাণান্ত। বছরখানেক হল মির্জা সাহেব জায়গাটি লিজ নিয়েছেন আর সেই থেকে শুরু হয়েছে উৎখাতের নানা ষড়যন্ত্র। একরোখা, গোঁয়ার মকবুলই প্রথম

BanglaBook.org

রুখে দাঁড়ায় আর তার দেখাদেখি অন্যেরাও। মকবুল কতবার বলেছে, এসো ভাই করিম, অ্যাসোসিয়েশনের কাজে আমায় একটু সাহায্য করো। করিম মোটেই আমল দেয়নি তাকে। প্রথমত এতে করিম এতটুকুও উৎসাহ পায় না। দ্বিতীয়ত সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে কেমন ন্যক্কারজনক মনে হয়, এসব করে ফয়দা কী? সে পালটা প্রশ্ন করত মকবুলকে। মকবুল বলত, চরম দুর্যোগ অবশ্যম্ভাবী জেনেও নীরবে আত্মসমর্পণ করা পৌরুষের কাজ নয়। কিন্তু মুখে যা-ই বলুক-না কেন, মনে-মনে করিম জানে মকবুলদের ঐকান্তিক দৃঢ়তার জন্যই তার ও সবার দোকানগুলো এখনও টিকে আছে আর তাই মকবুলের জন্য তার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা।

ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হয়ে করিম বিধবা মায়ের হাত ধরে যেদিন পাকিস্তানে এল সেদিনের মর্মন্তুদ ঘটনাগুলো তাকে বিহ্বল করলেও সে বিশ্বাস রেখেছিল ভবিষ্যতের উপর। স্বর্ণোজ্জ্বল ভোরের আগমনের পূর্বে রাত্রির অন্ধকারের মতোই তার মনে হয়েছে সেই দিনগুলোকে। তাই সে নূতন উৎসাহে নূতন আশায় বুকে বেঁধে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে। দেশ-বিদেশের জাতীয় পুনর্গঠনের অভিজ্ঞতা মন্থন করে মহামনীষীদের আতিথ্যে মহামূল্য রচনার পাহাড় ঘেঁটে ঘেঁটে সে রচনা করল পাকিস্তানের জাতীয় উন্নতির জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা। জলবিদ্যুৎ, খনিজ পদার্থের সন্ধান, কুটির শিল্প, পাকিস্তানের নয়া সংস্কৃতি—সব বিষয়েই তার চিন্তা, ছোটবড় নানা পরিকল্পনা সে তৈরি করে ফেলল। দেশজ প্রতিভার সৃষ্টি হেকিমি বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাও তার পরিকল্পনা থেকে বাদ পড়ল না। পাকভূমিতে অবতরণ করেই সে পরিকল্পনার ঝুড়ি নিয়ে ধরনা দিল পুরানো পরিচিত নূতন মন্ত্রীদের বৈঠকখানায়। কেউ বললেন 'শাবাশ', কেউ হেসে পিঠ চাপড়িয়ে উৎসাহ দিলেন, কেউবা উৎসাহের আতিশয্যে দশ-বিশ টাকা ছুড়ে ফেলে বললেন, যাও, ছাপিয়ে নাও, ওগুলো পাকিস্তানে নবযুগের অমর বাণী। ধীরে ধীরে ভাটা পড়ল আতিশয্যে, রইল শুধু মৌখিক সহানুভূতি, আমরা আর কী করতে পারি বলো? জান তো আমাদের হাত-পা বাঁধা। অবশেষে মন্ত্রীদের দরজা বন্ধ হল তার সামনে। কিন্তু দমবার পাত্র করিম নয়। একটা কিছু চমৎকার এমন কিছু চোখ-ঝলসানো কাজ সে করবেই, যা শুধু অপরকে তাক লাগিয়ে দেবে না, সাথে সাথে সমাজকল্যাণের শতমুখী পথ করবে উন্মুক্ত। তাই স্থির করল পরিকল্পনাগুলোকে সে কার্যকর করবে সমাজকর্মীদের সহায়তায়, তখনই জন্ম নিল ইসলামিক রেনেসাঁস সোসাইটি আর পাক বুক সিন্ডিকেট। ওপার থেকে বেচাবিক্রি করে যা-কিছু করিমের সঞ্চিত ছিল বন্ধুবান্ধব, হিতৈষীদের স্বল্প স্বল্প পুঁজি নিয়ে যাত্রা শুরু করল পাক বুক সিন্ডিকেট। করিমের পরিকল্পনা আর সমাজগঠনমূলক রচনাগুলো ছাপা হবে, বিলি হবে দেশময়। শুধু তা-ই নয়, দেশবিদেশের প্রত্যেক মনীষীর প্রসিদ্ধ লেখা স্থান পাবে পাক বুক সিন্ডিকেটের এই প্রচেষ্টায়, দেশের আনাচে-কানাচে ছড়ানো পল্লিকবিদের রচনা পুঁথিসাহিত্য সংগৃহীত হবে, তুলে দেওয়া হবে সেই অতীত প্রতিভার কীর্তিকলাপ আজকের নবীন পাঠকদের হাতে। এইভাবে

BanglaBook.org

পুনরুদ্ধার হবে অতীত ঐতিহ্যের, সূচনা হবে ভবিষ্যৎ জয়যাত্রার। এই উদ্দেশ্য নিয়ে জাঁকজমক আর আড়ম্বরের মধ্যে একদিন পাক বুক সিন্ডিকেটের উদ্বোধন হল, মন্ত্রী উপমন্ত্রীরা আমন্ত্রিত হয়ে সারগর্ভ ভাষণ দিলেন—জাতীয় পুনর্গঠনের এই ঐতিহাসিক নজির উদ্বোধিত করুক সারা দেশকে, প্রথিতযশা নেতৃবৃন্দ পাঠালেন বাণী—সফল হোক এই সাধু-প্রচেষ্টা। পাক বুক সিন্ডিকেটের এই প্রচেষ্টার প্রধান স্তম্ভ হবে ইসলামিক রেনেসাঁস সোসাইটির ত্যাগী কর্মীরা। তারাই দেশময় ছড়িয়ে দেবে নবজীবনের বাণী, তারাই হবে নবসৃষ্টির স্রষ্টা, আদর্শ সৈনিক, জাতীয় পুনর্গঠনের দিশারি।

বন্ধু মকবুল বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন, হুঁশিয়ার লোক, কথায় ঠেস দিয়ে সে বলে, মন্ত্রীদের সেলাম ঠুকে আর মগজ থেকে পরিকল্পনার ফোয়ারা ছাড়লে জাতীয় পুনর্গঠন হবে না। করিম উঠল খেঁকিয়ে, তবে কি ঐ রিফিউজিগুলোকে নিয়ে হৈ হৈ করলেই জাতি গড়ে উঠবে? মকবুল হেসে উত্তর দিত—আজ মূর্খ দেশবাসীকে সংগঠিত করতে হবে, অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে শিখতে হবে—এটাই প্রাথমিক ধাপ...অসহিষ্ণু করিম তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে, কিন্তু আদর্শ? ঘোড়ার আগে গাড়ি জুড়লেই তো চলবে না। তেরোশো বছর আগের সে-মহান আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েছি বলেই তো আজ আমাদের এত দুর্দশা! সেই আদর্শ পনরুজ্জীবিত করতে হবে, দিতে হবে ভবিষ্যৎ পথের ইঙ্গিত। এটাই তো পথিকৃতের কাজ—এই কাজই আমার।

কিন্তু মকবুল নাছোড়বান্দা। একরকম জবরদস্তি করেই পাক বুক সিন্ডিকেটের ছোট্ট একটি কোনায় এনে ভর্তি করল সামান্য কিছু মনোহারী জিনিসপত্র, বলল, তোমার ঐসব বইয়ের কাটতি হবে ছাই। মনোহারী জিনিসগুলো ঠিক ঠিক বিক্রি করবে, তবু চারটি পয়সা হাতে আসবে।

পয়গম্বরি চালে কথাগুলো বলেছিল বটে মকবুল, ছয় মাস যেতে-না-যেতেই তার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে-অক্ষরে সত্য হতে দেখল করিম। বইগুলোর চাহিদা নেই বাজারে, কোনো একটি বইও কাটতি হল না। কিছু কমপ্লিমেন্টারি কপি ছাড়া বাকি সব যেমনকার তেমনিই সাজানো রইল থরে থরে ডিপুর মধ্যে। ওদিকে তাগিদের পর তাগিদ আসতে থাকে ছাপাখানা থেকে বাকি টাকার ফর্দ নিয়ে। এত আয়োজন, এত পরিশ্রম, এত সযত্ন প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হতে পারে করিম কল্পনায়ও কোনোদিন ভাবতে পারেনি। ধীরে ধীরে করিমের অজান্তেই একটি দুটি করে মনোহারী জিনিস বাড়তে লাগল, স্থান করে নিল বুকশেলফে। বইগুলো গিয়ে স্তূপাকার হল এককোণে। মকবুল বলল বইগুলো বিলিয়ে দাও—মনোহারী জিনিস বাড়াও। কিন্তু তা হবার নয়। তার জীবনের অজস্র স্বপ্ন আশা উদ্যম বইগুলোর সাথে জড়িত, বুকের নিচে সে আগলিয়ে রাখবেই, পোকায় কাটুক, ধুলোয় ঢাকা পড়ুক, আপনিই তারা বিলীন হয়ে যাক তবু এই অমূল্য সম্পদের অবজ্ঞা সে সইতে পারবে না। ইতিমধ্যে একদিন সে নূতন একটি সাইনবোর্ড টাঙায় দোকানের

BanglaBook.org

সামনে—পাক বুক সিন্ডিকেট অ্যান্ড ভ্যারাইটি স্টোরস। ঠাট্টা করে বলে মকবুল, তার চেয়ে সম্ভ্রান্ত মুদির দোকান বললেই মানানসই হয়।

সেদিন ছিল রেনেসাঁস সোসাইটির রবিবাসরীয় অধিবেশন; আলোচ্য বিষয় ছিল কোনো-এক খ্যাতনামা ইসলামি চিন্তাবিদের প্রবন্ধ, ইসলাম ও আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা—সুবিস্তারিত প্রবন্ধ আলোচনা, তর্কবিতর্কও চলল অনেকক্ষণ—সকাল ৭টা থেকে শুরু করে প্রায় ১২টা পর্যন্ত। সভাশেষে পুরানো বন্ধু আহমদ এসে পাকড়াও করে করিমকে। স্মিত হাস্যে করিম জিজ্ঞেস করে, অনেক দিন পর তোমাকে বৈঠকে দেখলাম।

হ্যাঁ ভাই, একটু ব্যস্ত ছিলাম, লাহোরে গিয়ে কিছুদিন আটকা পড়েছিলাম কিনা...অভিযোগ খণ্ডনের চেষ্টা করে বন্ধু।

যাক, তোমার সাথে অনেক কথা আছে, চলো, আমার বাসায় চলো, ওখানেই দুপুরের খাওয়াটা সেরে নিতে পারবে। কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করেই, একরকম টেনে নিয়ে করিমকে সে তুলে নিল নিজের ক্যাডিলাক গাড়িতে। গ্রীষ্মের অগ্নিক্ষরা দুপুরে জনবিরল রাস্তার উপর দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে উড়ে চলে ক্যাডিলাক। শুধু করিম কেন, আহমেদ সবার কাছেই এক বিস্ময়কর রহস্য। ব্যবসায় করে সে, কিন্তু কী ব্যবসায় কেউ জানে না, কাউকে সে বলেও না, নেহাত জিজ্ঞেস করলে উদাসীনভাবে জবাব দেয়, flying business। কেউ-কেউ বলে, পারমিটের দালালি আর জুট বোর্ডের ঠিকাদারি করে সে নাকি এখন কোটিপতি না হলেও লাখপতি। অন্যরা লবণ কেলেঙ্কারির সাথেও তার নাম জড়িয়ে বলে, সে নাকি কোনো-এক আগাখানির সাথে ভিড়ে দুআনার লবণ ষোলো টাকায় বিক্রি করে মুনাফার পাহাড় ফেঁদেছে। এমনি ধরনের নানা গুজব রটেছে তাকে কেন্দ্র করে। তবুও সে অনুদ্ঘাটিত রহস্য করিমের কাছে, অনেকের কাছে। করিমের সাথে আহমদের বন্ধুত্ব কলেজজীবন থেকে। দেশবিভাগের পর হামেশাই করিম তাকে দেখত একটা পোর্টফলিও ব্যাগ নিয়ে পইপই করে ঘুরছে—দেখত কখনও মন্ত্রীদের বৈঠকখানায়, কখনও নারায়ণগঞ্জের স্টিমারঘাটে, কখনও-বা ঘিঞ্জি গলিতে গ্যাস লাইটের নিচে দাঁড়িয়ে কারো কাঁধে হাত রেখে গল্প করে চলেছে অনর্গল। ঠিকানা তার তখনও ছিল না। কখনও-বা করিমের বাসাতেই আড্ডা গেড়ে কাটিয়ে দিল তিন মাস। তারপর আবার উধাও হল কোথায়, ছয় মাস পাত্তাই নেই। কোথায় কোথায় এত ঘুরে বেড়াও, জিজ্ঞেস করত করিম। সেও হেসে উত্তর দিত, পেটের ধান্দার হে, পেটের ধান্দায়। কখন কেমনভাবে যে আহমেদ আলিবাবার গুপ্তধন প্রাপ্তির মতো অজস্র টাকার মালিক হয়ে বসল সে-কাহিনি করিমের কিছুই জানা নেই। শুধু মনে পড়ে এক রবিবারের ভোরবেলায় সে জিপ হাঁকিয়ে এসে হাজির করিমের বাসায়। চল তোকে আমার বাসা চিনিয়ে দিই—বলে তাকে নিয়ে গিয়েছিল একটি সুদৃশ্য ফ্ল্যাটবাড়িতে। তারপর তিন বছর কেটে গিয়েছে। পরিবর্তন হয়েছে অনেক। আহমেদের জিপের জায়গায় স্থান

BanglaBook.org

নিয়েছে ক্যাডিলাক, ফ্ল্যাট ছেড়ে এসেছে রমনায় আধুনিকতম ডিজাইনে তৈরি নিজস্ব বাসভবনে। ইদানীং সে একআধটু রাজনীতি ও সংস্কৃতিচর্চায় মন দিয়েছে। তাই চেম্বার অভ কমার্স থেকে শুরু করে, ইসলামিক রেনেসাঁস সোসাইটি, ক্রিসেন্ট থিয়েটার, দরজি সমিতি সর্বত্র তার আনাগোনা। নানা সভাসমিতিতে তার আমন্ত্রণ পড়ে সভাপতিত্বের জন্য। খানার টেবিলে বসে হরেকরকমের চেনা-অচেনা খাদ্যসামগ্রীর সদ্ব্যবহারের সাথে সাথে কথাবার্তা হল নানা ধরনের। আহমেদ জানাল যে, তার অর্থের আর প্রয়োজন নেই। এখন অর্থ দিয়ে সে কিছু গঠনমূলক কাজ করতে চায় যাতে দেশের ও দশের কল্যাণ হতে পারে। ইতিমধ্যেই সে অনেক কিছুই করেছে যা হয়তো করিমের জানা নেই। কথায়-কথায় তার সফল কর্মের প্রমাণস্বরূপ পুরানো পত্রিকার একটা কাটিং সে ঠেলে দেয় করিমের সামনে; বলে, দ্যাখো কী চমৎকার একটা কাজ করেছি। করিম চোখ বুলিয়ে যায় বিশেষ সংবাদদাতার খবরটির উপর—আন্তর্জাতিক ইসলামি ক্ষৌরকার ফেডারেশন, ইজিপ্টের সেলুন সমিতির সভাপতি পাকিস্তান ক্ষৌরকার ফেডারেশনের সভাপতি জনাব আহমেদের নিকট প্রেরিত এক অভিনন্দনপত্রে পাকিস্তানি ক্ষৌরকারদের অভিনন্দন জানাইয়াছেন এবং একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি ক্ষৌরকার ফেডারেশন গঠনের জন্য পাকিস্তান ক্ষৌরকার ফেডারেশনের সভাপতি যে-প্রস্তাব করিয়াছেন তাহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি পত্রে আরও বলিয়াছেন যে ক্ষৌরকারদের ইসলামি ক্ষৌরকার্য training দেওয়ার ব্যবস্থা করা উচিত এবং ক্ষৌরকার্যের ইসলামি নীতি ও ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা করার জন্য একটি আন্তর্জাতিক মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা উচিত। প্রকাশ প্রস্তাবিত ইসলামি ক্ষৌরকার ফেডারেশন গঠনের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে জনাব আহমেদ শীঘ্রই মুসলিম দেশগুলি সফরে বাহির হইবেন।—একটি শুষ্ক হাসির রেখা ফুটেই আবার মিলিয়ে যায় করিমের ঠোঁটের কোণে।

খুব যে হাসছ? জানো ইতিমধ্যেই আমাদের ষাট/সত্তর হাজার টাকা collection হয়ে গিয়েছে? বলে আহমেদ। বেশ তো ভালোই তো। সংক্ষিপ্ত উত্তর করিমের। খাওয়ার ফাঁকে একসময় মন্তব্য করে বসে আহমেদ, তুই তো মরীচিকার পিছনেই ঘুরে মরলি। এরকম একটা-কিছু করলেই তো পারতিস। এরকমটি শোনার জন্য করিম প্রস্তুত ছিল না, হয়তো আহমেদও ঠিক এই কথাটি বলতে চায়নি। উভয়ের কাছেই কথা কয়টি কেমন যেন অশোভন ঠেকে। একবার চোখ তুলেই করিম দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় অন্যদিকে। সেই দৃষ্টিতে বেদনামিশ্রিত শ্লেষের তীব্র জ্বালা। অপ্রস্তুত আহমেদ এ-প্রসঙ্গ সে-প্রসঙ্গ তুলে আবার আলাপ পাড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু আলাপ আর জমে না।

ভূরিভোজনের জন্য বন্ধুকে ধন্যবাদ দিয়ে করিম যখন রাস্তায় এসে দাঁড়ায় তখন বেলা গড়িয়েছে অনেক দূর। সারাটি দিন অপচয় হয়েছে—নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে করিম এগোয় কদমতলির রাস্তা ধরে। পিচঢালা রাস্তার উপর ছড়ানো

BanglaBook.org

পড়ন্ত রোদের তির্যক রশ্মিগুলোর দিকে তাকিয়ে পথ চলতে চলতে আজকের দিনটির কথাই মনে পড়ে তার বারবার, সকাল থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাই—সাহিত্যসভা, আহমেদের সাথে সাক্ষাৎ এমনকি ভূরিভোজনটিও কেমন যেন কৃত্রিম আর অবাস্তব মনে হয়। মনের অজান্তেই আহমেদের সাথে নিজের ভাগ্যের তুলনামূলক বিচার করতে বসে। তার চেয়ে আহমেদের সামাজিক গুণাবলির আর মানসিক প্রতিভা বেশি আর তাই আজ আহমেদের এমন চোখ-ঝলসানো সাফল্য। মন এ-যুক্তিতে সায় দেয় না কিছুতেই। তবে...? তবে কি আহমেদের সাফল্যে ঈর্ষাবোধ করছে সে? না, সে জানে অত নিচু মন তার নয়। কিন্তু নিজের ব্যর্থতা, অর্ধউপবাসী মায়ের নীরব যাতনা—এ সবই তো সত্য; সে অস্বীকার করবে কেমন করে? আহমেদের তকতকে ঝকঝকে হালকা চকলেট রঙের ক্যাডিলাকটার ছবিই আবার ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। আহমেদের সাথে নিজের অবস্থাটা তুলনা না করে সে পারছে না।

অনেকগুলো আওয়াজ, অনেক মানুষের কোলাহলে সে চমকে ওঠে। দ্যাখে কদমতলির মোড়ে যেন একটি ভিড় জমেছে। দ্রুত পা চালিয়ে গলিটা অতিক্রম করে সে দাঁড়াল ফাঁকা জায়গাটায় যেখান থেকে শুরু হয়েছে কদমতলির রিফিউজি মার্কেটের দক্ষিণ সীমা। এবার স্পষ্টই নজরে পড়ল অসংখ্য খাকি পোশাকের ভিড়, অদূরে অপেক্ষমাণ গুটিকয় পুলিশ ভ্যান। তাদেরই ঘিরে রয়েছে একদল মানুষ—প্রায় সবাই মনে হচ্ছে চেনা—কদমতলি কলোনির বাসিন্দা। মাঝে মাঝে আওয়াজ উঠছে—পুলিশি জুলুম বন্ধ করো। ডান দিকে এগিয়ে যেতেই দেখা গেল রাস্তায় ছড়িয়ে আছে অজস্র ভাঙা বোতল, ভাঙা টিন, এ্যাবড়ানো থ্যাবড়ানো সাইনবোর্ড, সাবান, চকলেট আর লজেন্সের ছেঁড়া প্যাকেট। কতগুলো বাচ্চা আর বাস্তুহারা বুড়ি সেগুলো কুড়িয়ে নিচ্ছে চটের থলেয়। রাস্তার পাশে ফেরিওয়ালার বাক্সভরা দোকানের একটিও নজরে পড়ে না—বাক্সগুলো দেখা যায় এখানে-ওখানে পড়ে আছে। ছোট্ট দোকানগুলোর উপর যে এক প্রলয়ংকর অভিযান চলেছে তার স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। কেরোসিন টিনের ভেড়া টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে আছে একপাশে মুখ গুঁজে, কিছুই দেখবার অবসর পায় না করিম। কোনো-এক অশুভ সংকেতে দুরুদুরু করে তার বুক।

ভিড়ের মধ্য থেকে হঠাৎ বেরিয়ে আসে হাসান।

এই যে করিম ভাই, আপনি এতক্ষণে?—তীব্র ভর্ৎসনা তার চোখে।

কী, ব্যাপারটা কী হয়েছে বল-না!

কী আবার, যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল তা-ই। শালা মির্জা কতগুলো গুন্ডা নিয়ে এসে হাজির বেলা দশটার সময়। ব্যাটারা তৈরি হয়েই এসেছিল গোলমাল করতে। লেগে গেল মারপিট। গুন্ডারা গেল মার্কেট ভাঙতে, আমরা বাধা দিলুম। তারপর এল পুলিশ—এক নিশ্বাসে বলে ফ্যালে হাসান। তারপর? তারপর অনেক

BanglaBook.org

কিছু। সব পরে শুনবেন। এখন চলুন একটু থানায় যেতে হবে। মকবুল ভাই, রমজান ভাই, গুলিসহ পঞ্চাশজনকে ধরে নিয়ে গেছে পুলিশ।

কেন? বোকার মতো প্রশ্ন করে করিম।

একরকম টানতে টানতেই তাকে নিয়ে চলে হাসান।

থানা কোর্ট, কোর্ট থানায় হাঁটাহাঁটি করেও মকবুলদের জামিন না পেয়ে করিম যখন বাসায় ফিরল তখন রাত বারোটা বেজে গিয়েছে। বাসায় ঢুকতেই মা বলেন, আফসোস করে কোনো ফায়দা হবে না—এর একটা বিহিত করা চাই।

নে, পেঁয়াজ দিয়ে চটকিয়ে, ভাত কয়টি খেয়ে নে তো! মা এক থালে ভাত, একটি কাঁচা লঙ্কা আর দুটো পেঁয়াজ এনে সামনে রাখেন। এত উত্তেজনার মধ্যে তাঁর খেয়ালই ছিল না যে আজ বাড়িতে চাল ডাল কিছুই ছিল না। বিকেলে দোকান থেকে সবজি চাল ডাল আনবে এটাই বরাবরকার নিয়ম চলে আসছে। আর মনে থাকলেই-বা কী হত? দোকান যে খোলাই হয়নি, বিক্রি তো দূরের কথা!

নাঃ, আমি খেয়ে এসেছি, তুমি খেয়ে নাও—থালটির দিকে তাকিয়ে কেমন যেন অন্যমনস্কভাবে বলে করিম।

কিন্তু মা ছাড়বেন না। অবশেষে রফা হল দুজনেই খাবে ভাগাভাগি করে।

সূর্য তখনও ওঠেনি। পুব আকাশ সবেমাত্র ফরসা হয়েছে। ঘুম ভাঙতেই তড়াক করে লাফিয়ে দাঁড়ায় করিম, অনেক কাজ আজ, যেভাবেই হোক মকবুলকে জামিনে খালাস করে আনতে হবে। সে না এলে কোনোকিছুতেই এগুনো যাবে না। দশটার সময় কদমতলির সমস্ত বাসিন্দার সভা হবে সেখানেও তাকে থাকতে হবে। ওদিকে কাল রাত্রেই গুন্ডামি সম্পর্কে থানায় ডায়েরি করা হয়েছে। আজই যাতে থানা অফিসার তদন্তে আসেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। দোকানপাটগুলো মেরামত করে আজই খুলতে হবে। তা না হলে মির্জাদের দুঃসাহস বাড়বে। ওহ্, কত কাজ!

দ্রুত পা চালিয়ে দেয় করিম কদমতলি রিফিউজি মার্কেটের দিকে। ভোরের মিষ্টি হাওয়া উড়িয়ে নিয়ে যায় রাত্রির যতসব দুশ্চিন্তা। বড় রাস্তার বাঁকে এসেই তার চোখে পড়ল দূরে পশ্চিম কোণে লেলিহান আগুনের আভা, আর একটু এগিয়ে গেলে স্পষ্টই দেখা গেল আকাশমুখী লেলিহান অগ্নিশিখা। কদমতলির দিকেই তো? হঠাৎ তার বুকটা মোচড় দিয় উঠল। তবে কি...? চলার বেগ বাড়িয়ে দেয় সে। দুটো দমকল ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে তার পাশ দিয়েই ছিটকে বেরিয়ে গেল। কোথাও আগুন লেগেছে ঠিকই। আরও জোরে পা চালিয়ে দেয় করিম। আরও কিছুদূর এগিয়ে সবই স্পষ্ট দেখতে পায় সে। রিফিউজি মার্কেট দাউদাউ করে জ্বলছে। আশেপাশে নীরব দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে আছে কদমতলি কলোনির সম্বিৎহারা বাসিন্দারা। যারা এখনও শেষ সম্বলের মায়া ছাড়তে পারেনি তাদেরই কেউ-কেউ দুঃসাহসে ভর করে লড়াই করছে আগুনের সাথে, মালমাত্তা সরাচ্ছে

BanglaBook.org

বড় রাস্তার উপর। নিশ্বাস বন্ধ করে একদৌড়ে সে এসে হাজির হয় তারই দোকানটির পাশে। সেখানে জমেছে একগাদা ছাই। কাঠের পার্টিশানটি এখনও জ্বলছে আর ধোঁয়া ছাড়ছে অজস্র, আর একপাশে পাক বক সিন্ডিকেট অ্যান্ড জেনারেল স্টোর্সের সাক্ষ্য বহন করে এখনও একপাশে ঝুলছে টিনের সাইনবোর্ডটি তেরছাভাবে। পুব দিগন্তে যখন সূর্য উঠল তখন রিফিউজি মার্কেটের ভস্মস্তূপের মধ্যেও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকটি লোহার শিক।

এক বছর পর। সরকারি শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় পড়ায় কদমতলি রিফিউজি কলোনি সরে গিয়েছে সাত মাইল পশ্চিমে শহরতলির শেষ প্রান্তে। মির্জা সাহেবের কল্যাণে রিফিউজি মার্কেটের ভস্মস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে সুদৃশ্য সুসজ্জিত সিটি মার্টের কংক্রিটে ঢালাই সুন্দর সুন্দর ইমারতগুলি। ইমারতগুলি লাল, নীল, গোলাপি রঙের বিজলিবাতি আর নিয়ন লাইটের আলোয় ঝলমল। শহর উন্নয়নের এই মহতী প্রচেষ্টার উদ্বোধনও হয় যথাসময়ে। সেদিন জাঁকজমক আর সাদর অ্যাপায়নের কোনো ত্রুটি মির্জা সাহেব করেননি। প্রথম সারির নাগরিক মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণ স্বয়ং উপস্থিত থেকে যথানিয়মে জাতীয় তরক্কির এই সুমহান প্রচেষ্টাকে মোবারকবাদ দেন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মৃত্যু-এক

আমার নাম আনিস।

আমার বন্ধুর নাম অনিল।

আমরা একই ক্লাসে পড়ি। একই ঘরে থাকি, আমরা একসঙ্গে কলেজে যাই। একসঙ্গে ফিরে আসি।

একদিন আমরা কলেজে গিয়ে দেখি তালা। বাড়ি ফিরে এলাম। সেখানেও তালা। যেখানে আমরা খেতে যেতাম সেখানে গেলাম। সেখানেও তালা।

যে-পার্কে আমরা বেড়াতে যেতাম, সেখানে গেলাম।

গিয়ে দেখি গোটা পার্কটা মৃতদেহের স্তূপে ঠাসা।

দৃশ্যটা ভয়াল। আমরা ভয় পেলাম এবং ফিরে আসার জন্য পা বাড়ালাম।

অকস্মাৎ আমরা দেখলাম স্তূপীকৃত মৃতদেহের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কতগুলো মানুষ। ওদের মুখগুলো দেখলে মনে হয় ওরা মরা মানুষ। কিন্তু লাল হিংস্র চোখগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় ওরা জ্যান্ত। ওদের হাতে ঝাল সড়কি তলোয়ার। ওরা আমার বন্ধুটিকে ধরল এবং মেরে ফেলল। সেই হিংস্র চোখগুলোকে তীক্ষ্ণ করে ওরা আমাকে দেখল। তারপর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল। ওদের ভেতর থেকে একজন লোক সামনে এগিয়ে এল এবং বলল, যাক ও, ওকে মেরো না; ও তো আমাদের লোক।

কোরবান শেখ হাঁটছে তো হাঁটছেই। পথ যেন শেষ হতে চায় না। হাঁটা ছাড়া কোনো উপায় নেই কোরবান শেখের। কোরবান শেখ শুনেছে উত্তরে এক শহর আছে, সেখানে গেলে দানাপানি পাওয়া যায়। তাই উত্তর দিকটা নিশানা করে হেঁটে চলেছে। দিন যায়, রাত আসে—তবু শহর আসে না। দিনের বেলায় কোরবান হাঁটে, রাতের বেলায় পথের পাশে কোনো গাছতলায় কিংবা কোনো গেরস্তবাড়ির দাওয়ায় ঘুমিয়ে নেয়।

BanglaBook.org

একমুঠো ছোলা আর পুকুরের পানি এই খেয়ে আর হেঁটে হেঁটে কোরবানের শরীরটা বুঝি ভেঙেই যায়। এক রাতে ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরি হয়ে যায় ওর। ঘুম ভেঙে কোরবান দ্যাখে একটা উঁচু টিলামতন জায়গা তারই ঢালুতে একটা তেঁতুল গাছের নিচেই ওর রাত কেটেছে। তেঁতুল গাছের নিচে অনেক তেঁতুল ছড়ানো। গামছার খুঁটে রাখা ছোলাটা খেয়েই কোরবান কিছু তেঁতুল কুড়িয়ে নিল। এমন সময় কোরবান দেখল দু-তিনটে মোটরগাড়ি এসে তারই সামনে থামল। গাড়ি থেকে নেমে এল কয়েকজন সুদর্শন পুরুষ। তাদেরই ভেতর থেকে একজন কোরবানকে জিজ্ঞেস করে—এই, এখানে মাটি পাওয়া যায়? প্রশ্নটা শুনে কোরবান তো অবাক। চারিদিকে এত মাটি আর লোকটা বলে কিনা মাটি পাওয়া যায়? কোরবান যে-টিলার ঢালুতে দাঁড়িয়ে ছিল সেটাই দেখিয়ে বলল, কত মাটি! মাটির কি অভাব আছে? তার কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক। পাশে দাঁড়ানো সাথিকে বললেন—এই ব্যাটার সাথেই ফাইনাল করুন। রাস্তার পাশে উঁচু জায়গা, আপনার কন্ট্রাক্টারেরও সুবিধে। ক্যারিং কস্টও কম পড়বে। এখান থেকে শহর দেড় মাইল, আমাদের ডেরাটা দুমাইলের কিছু উপর হবে।

এই ব্যাটা কত নিবি বল। ভেবে বল। কোরবানের ভাবনাচিন্তার ব্যাপারই নেই। গোটা ব্যাপারটাই ওর কাছে আজগুবি মনে হচ্ছে। তাই জিবের ডগায় যা এল তা-ই বলে ফেলল ও। ও চেঁচিয়ে বলল—দশ হাজার।

ড্যাম চিপ। ইঞ্জিনিয়ারের গলাটা শুনতে পেল কোরবান।

তা-ই সই। দশ হাজারই দেব তোমায়। এই নাও দুহাজার অ্যাডভান্স। বাকি আট হাজারের মধ্যে চার হাজার কাল পাবে। সাত দিন পর আর চার হাজার পাবে।

ব্যাপারটা না বুঝলেও কোরবান শেখ হাত পেতে টাকাগুলো নিল এবং বাকি কথাগুলোর সাথে ঘাড় নেড়ে একমত হল।

লোকটা একটা সাদা কাগজে কী যেন লিখল। একপাশে স্ট্যাম্প লাগাল। তারপর কাগজটা কোরবানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল—সই করুন। কোরবান সই করে দিল এবং স্বর্গীয় পিতার শোকর গুজার করল এই কারণে যে বাপজান লেখাপড়া শেখাতে না পারলেও নাম সইটা শিখিয়ে দিয়ে গেছেন কোরবানকে।

দুপুরের মধ্যেই হুলস্থূল কাণ্ড শুরু হয়ে গেল টিলাটাকে ঘিরে। গণ্ডা গণ্ডা মানুষ—ওভারশিয়র, ইঞ্জিনিয়ার, কনট্রাক্টার, কয়েক ডজন ট্রাক, মাটি কাটার যন্ত্র আর লরি জিপে দক্ষযজ্ঞ বেধে গেল। তেঁতুল গাছটার তলা থেকে কোরবান নড়েচড়ে না। সেখান থেকে কোরবান দেখে ডজনে ডজনে ট্রাক আসে, মাটি নিয়ে আবার ছুটে যায়। তিন-চার দিনের মধ্যে অর্ধেক টিলা সাফ।

তেঁতুল গাছের তলা ছেড়ে কোরবান নড়ে না, ওর ধারণা এই তেঁতুল গাছটা লক্ষ্মী। যতবার ওদিকে মাটি কাটতে যায় কোরবান জোড় হাত করে বলে, দোহাই সাহেব, এ-জায়গাটুকু ছোঁবেন না।

BanglaBook.org

ব্যাপার কী! ইঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়র সবাই বসে গেল কনফারেন্সে। ব্যাপার নিশ্চয়ই কিছু আছে।

দেখছে জায়গাটা অতি প্রাচীন। মোগল পাঠানদের একসময় ছাউনি ছিল এখানে। বলা যায় না হয়তো ওই তেঁতুলতলাতেই লুকিয়ে আছে কোনো মোগল সেনাপতির হীরা জহরত। মাটি যখন কাটছিই আমরা এই মুহূর্তে চলো ওই তেঁতুলতলাটাই কাটতে শুরু করি।

সবাই সারা দিল ইঞ্জিনিয়ারের কথায়।

কিন্তু কোরবান শেখ নাছোড়বান্দা।

অবশেষে রফা হল দুহাজার টাকা। নগদ টাকাটা গুনে নিতে নিতে কোরবান শেখ ভাবে সাহেবগুলো ওই তেঁতুল গাছটার মাঝে কী পেল? সাহেবগুলো কি পাগল?

তেঁতুল গাছটা হারিয়ে কোরবান শেখের সত্যি লোকসান হল। রাস্তায় কোনো ফাঁকা জায়গা নেই, লরি ট্রাকে ভর্তি। কোনোটাতে মাটি বোঝাই হচ্ছে, কোনোটি বোঝাই হবার অপেক্ষায়। আশেপাশে কোনো গাছপালাও নেই যার নিচে গিয়ে আশ্রয় নেয়া যায়।

ঘুরতে ঘুরতে একটা ট্রাক পেল কোরবান। ট্রাকটাতে লোহার রড, কাঠ, দড়ি এটা-সেটা অনেক কিছু। তারই একপাশে উঠে শুয়ে পড়ল কোরবান।

ঘুমিয়ে পড়েছিল কোরবান। ঘুম ভাঙল লোকজনের চিৎকার শুনে। ট্রাকে রাখা মালপত্রগুলোর আড়াল থেকে একবার মাথাটা তুলে কোরবান শেখের চক্ষু স্থির। পুলিশে ছেয়ে গেছে চারিদিক।

ছি ছি ছি, আপনাদের মতো শিক্ষিত লোক এভাবে চিটেড হলেন? কিন্তু আমার তো কোনো উপায় নেই। সরকারের জমি থেকে সরকারের বিনা অনুমতিতে আপনারা মাটি কেটেছেন এটা অপরাধ। এ-অপরাধে আপনাদের গ্রেপ্তার করতে আমি বাধ্য। কোরবান শেখ কথাগুলো শুনল। ভয়ে রক্তগুলো ওর হিম হল, সারা গায়ে কাঁপুনি ধরল। কিন্তু কোরবান শেখ কী করতে পারত? ভদ্রলোকরা টাকাগুলো ওকে দিল বলেই তো সে নিল।

ও কি না করতে পারত?

যাহোক এখন সেই লোকটাকে তো একবার বার করুন।

কোরবান শেখ জানে ওকে খোঁজা হচ্ছে এবং খুঁজে পেলে ওর হাড্ডি একটাও আস্ত থাকবে না। কিন্তু ট্রাকের ড্রাইভারটা হুঁশিয়ার। ওর অ্যাসিসটেন্টকে ডেকে বলল—আবে হ্যান্ডেল মার।

পুলিশ ফুলিশের ঝামেলা আমার না-পছন্দ।

ট্রাকটা ছুটে চলল, কোরবান শেখ হাঁপ ছাড়ল।

ট্রাকটা শহরের কিনারে এসে আর এগুতে পারল না।

BanglaBook.org

উলটো দিকের লোকেরা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। চারিদিকে আগুন আর আগুন। বিকট চিৎকার, হল্লা। ড্রাইভার দেখে ফেলবার আগেই ট্রাক থেকে এক লাফে নেবে পড়ল কোরবান শেখ। মিশে গেল জনতার ভিড়ে।

কোরবান শেখ দেখল এক উন্মাদ কাণ্ড। উন্মাদের মতো চিৎকার করতে করতে লোকগুলো ছুটে চলেছে। ওদের হাতে দা, কুড়োল, সড়কি, বল্লম আর জ্বলন। সামনে যে পড়ছে তাকেই ওরা খুন করছে আর যা পাচ্ছে তাতেই আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে। আর যে-লোকগুলোকে ওরা তাড়া করে চলেছে তাদের যেন কিছুই করার নেই, প্রাণভয়ে ছুটে চলা ছাড়া। বাড়ি থেকে, রাস্তা থেকে যে যেখানে আছে প্রাণভয়ে ছুটছে ওরা।

জনতার মধ্য থেকে একজন একটা তলোয়ার এনে কোরবান শেখের হাতে তুলে দিল। তারপর ওর তিনমণি দেহটার উপর এক চক্কর চোখ ঘুরিয়ে বলল—নিন, আপনিই আমাদের পরিচালনা করুন। তলোয়ারটাকে বার দুই শূন্যে ঘুরিয়ে ইয়া আলি বলে কোরবান শেখ কয়েকটা লাফ মারল। তারপর সবার সামনে গিয়ে সবার চেয়ে দ্রুতবেগে ছুটে চলল। কিছুদূর এগিয়ে কোরবান শেখ দেখল সেই বিশাল জনতা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছে। চিৎকার প্রায় থেমে গেছে। ব্যাপারটা কী সেটা দেখার জন্য পেছনে তাকাতেই কোরবান শেখ লক্ষ করল বাড়িঘর ছেড়ে যে-লোকগুলো পালাচ্ছে কিংবা বাড়ির মধ্যে বসে খুন হয়েছে সেই পরিত্যক্ত বাড়িগুলোতে ওরই মিছিলের লোকগুলো ঢুকে পড়ছে। রাস্তার মাঝখানে একটা ন্যাংটা মেয়েমানুষের লাশ পড়ে আছে। ওর বুকের চামড়া চুঁইয়ে এবং নাভির নিচ থেকে এখনও রক্ত ঝরছে। লাশটার গায়ে তলোয়ারটা হেলান দিয়ে রাখল কোরবান শেখ। তারই পাশে বসে একটু জিরিয়ে নিল। জিরিয়ে নেবার অবসরে আগাগোড়া ব্যাপারটা একটু ভেবে নিতে চেষ্টা করল কেরবান শেখ। কিন্তু ভেবে কোনো কিনারা পেল না। যতই ভাবে কোরবান শেখ ততই তালগোল পাকিয়ে যায়। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল কোরবান শেখের। সারা জীবন লাঙল ঠেলার জিল্লতি থেকে বাঁচানো যায় কি না সেই মানসে কোরবান শেখকে ওর বাবা নিয়ে গেছিলেন মক্তবের মৌলবিসাহেবের কাছে। মৌলবিসাহেব দিন দুয়েক আলিফ বে তে সের ব্যর্থ তালিম দিয়ে ওকে ফেরত পাঠিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন—তোমার মগজটা বালুতে ঠাসা। ওখানে কিছু গজাবে না। তার চেয়ে বাপজানের কাছ থেকে লাঙল ঠেলার কায়দাটা শিখে নাও, কাজে আসবে।

মৌলবিসাহেব বোধ হয় ঠিকই বলেছিলেন। আজ প্রচণ্ড কোশেশ করেও মাথাটাকে একটু খেলাতে পারল না কোরবান শেখ।

পেটটা চিঁ চিঁ করে উঠল।

কোরবান শেখ টের পেল খিদে পেয়েছে। গাঁটে বাঁধা টাকাগুলোর উপর হাত বুলাল। কিন্তু খাবার কোথায়? দোকানপাট বেশি তো নেই এ-অঞ্চলে। যে-দু-চারটা দোকান ছিল সেগুলো লুটপাট করে সারা।

BanglaBook.org

রাস্তার পাশেই একটা বড়গোছের দোতলা বাড়ি। ফটকটা খোলা। তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল কোরবান শেখ। বাড়ির চত্বরটা দেখে মনে হল আগেই এখানে দক্ষযজ্ঞ হয়ে গেছে। ভাঙা আসবাবপত্র, ভাঙা কাচ আর এলোমেলো জিনিসপত্র ছড়ানো চত্বরময়। একটা কাঠের টেবিলে কেউ বুঝি আগুন ধরিয়েছিল। কিন্তু আগুনটা বেশি দূর এগোয়নি। একটা পায়া থেকে কিছু-কিছু ধোঁয়া এখনও বেরুচ্ছে। যারা বাড়ির বাসিন্দা তারা যে ঊর্ধ্বশ্বাসে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছে সেটা সহজেই বোঝা যায়। চত্বরের ডান পাশে দুব্বা। দুব্বার উপর ছোট ছেলের এক জোড়া লাল জুতো, তারই পাশে সেই সাইজের একটা মোজা। কোরবান শেখের মাথায় যেমন বালু, হৃদয়টা তেমিন ফাঁপা। তবু কোরবান শেখের চোখ ওই এক জোড়া লাল জুতোর উপর অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইল।

উপরে নিচে ঘরগুলো ঘুরেফিরে দেখল কোরবান শেখ। বাড়ির মালিকরা যে বেশ পয়সাওয়ালা ছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রত্যেকটি ঘর দামি আসবাবপত্রে সাজানো। একটা ঘরে এসে কোরবান শেখ দেখল টেবিলের উপর প্রচুর খাবার সাজানো। কয়েকটা শালুনের বাটি উলটানো। সুরুয়ায় ছোপ ছোপ করছে টেবিলের কাপড়টা। পালাবার আগে লোকগুলো হয়তো খেতে বসেছিল, কিন্তু খেতে পারেনি। কোরবান শেখ পেট ভরে খেল। তারপর পুরু আর নরম গদি-আঁটা একটি পালঙ্কে শুয়ে কিঞ্চিৎ দিবানিদ্রার মনস্থ করল। যবে একটু নাক ডাকতে শুরু করেছে কোরবান শেখ, এমন সময় রাস্তা থেকে ভেসে এল সেই চিৎকারটা। ধড়ফড় করে উঠতে গিয়ে কোরবান শেখ শুনতে পেল টং করে কোথায় যেন কী বেজে উঠল। নিশ্চিত হবার জন্য কোরবান শেখ খাটের উপর ধড়াস করে বসল, তড়াক করে উঠল। হ্যাঁ, সেই টং আওয়াজটা খাটের তলা থেকেই আসছে।

পটাপট গদিগুলো সরিয়ে ফেলল কোরবান শেখ। একটার পর একটা। তারপর আর-একটা। অনেকগুলো গদি। গদিগুলো সরিয়ে কোরবান দেখল যেটাকে পালঙ্ক মনে হয়েছিল আসলে সেটা একটা সিন্দুক। গদিগুলো সিন্দুকের উপরেই সাজানো। সিন্দুকের ডালায় একটা ফাঁক দেখা দিয়েছে। সেই ফাঁক থেকেই টুং আওয়াজটা বেরিয়েছে। ডালাটার ফাঁকে আঙুল রেখে একটু চাপ দিতেই সিন্দুকটা খুলে গেল। কোরবান শেখের চোখজোড়া ঝলসে গেল। এত সোনা কোরবান শেখ কখনও দেখেনি। হীরা মানিক জহরত এসব পরীর গল্পে ছোটবেলায় শুনেছে, কোনোদিন স্বচক্ষে দেখবে কল্পনা করেনি। চোখ ভরে কোরবান শেখ দেখল। দেখল কত বিচিত্র অলংকার, আর একপাশে নোটের গাদা। কোরবান শেখ সারাদিন গুনেও বোধ হয় শেষ করতে পারবে না। একবার সোনার তালগুলো, পুরানো দিনের মোহরগুলো স্পর্শ করল। দেরি করার সময় নেই। যা করবার এক্ষুনি করে ফেলতে হবে। বাইরের চিৎকারটা অনেক কাছে এসে পড়েছে, কোরবান শেখের মনে হল বাড়ির ভেতরেই ঢুকে পড়েছে বুঝিবা।

BanglaBook.org

তাড়াতাড়ি গদিগুলো চাপা দিল কোরবান শেখ। তলোয়ারটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এল।

কোরবান শেখ দেখল কিছুক্ষণ আগের সেই লোকগুলো যারা ওর হাতে তলোয়ার তুলে দিয়েছিল আর শত্রুকে ধাওয়া করছিল সেই লোকগুলো এখন নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে। ওরা যেসব গালিগালাজ করছে এবং মুখ-খিস্তি করছে কোরবান শেখ এসব শব্দ আগে কখনও শোনেনি। কোরবান শেখ হিম হয়ে দেখল এরই মধ্যে রাস্তায় কয়েকটা মুণ্ড গড়াগড়ি খাচ্ছে।

কোরবান শেখকে দেখে ওদের ঝগড়ার চিৎকারটা থামল না, কিছু কমল। কোরবান শেখ জীবনে কখনও বক্তৃতা দেয়নি। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে ওর মুখ দিয়ে বক্তৃতা বেরিয়ে গেল।

ভাইসব। আপনাদের ইমান, আপনাদের একতা, আপনাদের শৃঙ্খলার কথা স্মরণ করুন। কী বিরাট সংগ্রাম আপনারা করেছেন, কী অপরিসীম ত্যাগ আপনারা করেছেন। সেই গৌরব ভুলে গিয়ে আজ আপনারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করছেন? এর চেয়ে লজ্জার কথা আর কী হতে পারে?

কোরবান শেখের হৃদয়-নিংড়ানো আবেদন বুঝি ওদের মর্মলোক স্পর্শ করে। মরা মুণ্ডগুলোকে পদাঘাতে একপাশে সরিয়ে ওরা কোরবান শেখকে ঘিরে বসে পাড়ে। কোরবান শেখ থামতেই ওরা চেঁচিয়ে ওঠে, বলুন বলুন। আবার বলুন।

বন্ধুগণ! আমি বলি সকলের লজ্জা, সকলের অপমান আমার একার কাঁধে তুলে দিন। আমি তা বহন করব। আমি জানি আল্লাহ্‌তালা আমার মতো গুনাহগার বান্দাকে ক্ষমা করে দেবেন।

তথাস্তু তথাস্তু। ওরা সবাই একমত হল এবং কোরবান শেখকে সালিশ হিসেবে মেনে নিল। সালিশ করতে বসে কোরবান শেখ দেখল গোলমালটা শুরু হয়েছে ভাগের ব্যাপার নিয়ে। যে-বাড়িগুলো ওরা দখল করেছে তার সংখ্যা কম, প্রত্যাশী লোকের সংখ্যা বেশি। চোখ বুজে একটু ভাবল কোরবান শেখ। চট করে একটা সমাধানও এসে গেল মাথায়। বাবরি চুলের মাথাটাকে সজোরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, পেয়েছি। হ্যাঁ পেয়েছি। যারা কোনো বাড়ি পাওনি তারা সবাই আমার এই বাড়িটা নিয়ে নাও। এতবড় বাড়ি দিয়ে আমি কী করব? দক্ষিণের কোণে একটা ঘর আর পালঙ্ক আছে। ওই ঘর আর চৌকিটা পেলেই আমার চলে যাবে। মারহারা মারহাবা! এমন স্বার্থত্যাগ কেউ কখনও দেখেছে! সমবেত জনতা উল্লাসধ্বনি করে উঠল। প্রচণ্ড করতালিতে তারা কোরবান শেখকে অভিনন্দন জানাল। তারপর এই অপূর্ব স্বার্থত্যাগের পুরস্কার হিসেবে ওরা কোরবান শেখকে নেতা নির্বাচন করল।

কিন্তু কোরবান শেখ নেতা হতে চায়নি। কোরবান শেখ হাততালিও চায়নি। কোরবান শেখ চেয়েছে খাটের মতো দেখতে সেই সিন্দুকটা, যেখানে রয়েছে তাল

BanglaBook.org

তাল সোনা, হীরা মানিক জহরত, পুরানো দিনের আশরাফি, মোহর আর একগাদা নোটের টাকা।

গভীর রাত। যারা এসে উঠেছিল এ-বাড়িতে তারা ঘুমে অচেতন। গোটা পাড়া নিস্তব্ধ। বোঝবার উপায় নেই দিনের বেলায় এত বড় হত্যা আর লুটের যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়েছিল এ-পাড়ায়। সিন্দুকের জিনিসগুলো একটা তোশকের ভেতর পুরে বেঁধে নিল কোরবান শেখ। তারপর যেন কোনো মুসাফির তার বিছানাপত্র নিয়ে পথ চলেছে, তেমনিভাবে বিছানাটা কাঁধে নিয়ে রাস্তায় পড়ল। কিন্তু কোরবান শেখ দুপার বেশি এগুতে পারল না। দুজন সঙ্গিনধারী পুলিশ এসে দুপাশ থেকে ঘিরে ধরল কোরবান শেখকে। বলল—তোমাকে গ্রেপ্তার করা হল। এই অবস্থায় বুদ্ধি হারালে চলবে না। ভয় পেলে চলবে না। অকুতোভয়ে কোরবান শেখ পুলিশদের এবং পুলিশদের বাপ এবং পুলিশদের দাদা সবাইকে খালিস বাংলা এবং উর্দু ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করে দিল এবং জানিয়ে দিল—এসব অত্যাচার সহ্য করা হবে না। দেখা গেল দুজন নয়, এবার ঝাঁকে ঝাঁকে পুলিশ আসছে। গোটা পাড়াটাই দখল করে নিল। কোরবান শেখের চিৎকারে এবং পুলিশদের বুটের আওয়াজে পাড়ার ঘুম ভেঙে গেল। ওরা বেরিয়ে এল। ওজস্বিনী ভাষায় কোরবান শেখ ওদের আহ্বান জানাল সম্মুখ-সংগ্রামের। লাঠি পড়ে গায়ে, পড়ে মাথায়। কোরবান শেখ ব্যথা পায় না। কোরবান শেখ সেই তোশকটাকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। ওর আত্মরক্ষার কৌশল দেখে পুলিশও অবাক হয়ে যায়।

প্রায় শেষরাত পর্যন্ত সংঘর্ষ চলল। অবশেষে আত্মরক্ষার্থে কয়েক রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে এবং ডজন দুই নরনারীকে ভূতলশায়ী করে পুলিশ পশ্চাদপসরণ করল।

কোরবান শেখ নয়—সারা পাড়া বিজয়উল্লাসে মত্ত হল। কোরবান শেখকে মাথায় নিয়ে ওরা মিছিলে বেরুল। বিশাল মিছিল। সারা মহল্লা প্রদক্ষিণ করে কোরবান শেখকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দিয়ে শেষ হল মিছিল।

তোশকের পোঁটলাটাকে বালিশ করে সেই সিন্দুকের উপরই শুয়ে পড়ল কোরবান। কিন্তু ঘুম আসে না। এত সংগ্রাম এত ক্লান্তির পরও ঘুম আসে না কোরবান শেখের। কোরবান শেখের দুশ্চিন্তা এই হীরা মানিক জহরত, এতগুলো নোটের টাকা সে কোথায় রাখবে।

এমন সময় পা টিপে দুজন লোক ঢুকল ওর ঘরে। লোকগুলোর চেহারা আর পোশাকের দিকে তাকালেই বোঝা যায় ওরা খানদানি শেঠজি। কোরবান শেখ উঠে বসল। ওরা নিজেদের পরিচয় দিল। একজনের নাম হামেল আর একজনের নাম কামেল। ওরা ব্যবসায়ী। সরাসরি ব্যবসার কথাই পাড়ল।

দেখুন কোরবান সাহেব, আপনি মস্তবড় লিডার। কিন্তু আপনার অনেক দুশ্চিন্তা। আমরা এই দুশ্চিন্তা থেকে আপনাকে মুক্ত করতে চাই। সেজন্যই এত রাত্রে আপনাকে তকলিব দিতে এলাম।

BanglaBook.org

বলুন। বলুন। যেন একটি আশার আলো দেখল কোরবান আলি। দেখুন আমরা সম্পত্তি বিনিময় করতে আগ্রহী। আপনি যদি অমত না করেন তবে আপনার এই মহল্লার সাথে আমাদের শহরটার বিনিময় করতে চাই।

শহর। কোথায়?

এই যে দেখুন-না! আসুন জানালার কাছে। ওই যে দেখছেন নদীর ওপারে আলো-ঝলমল নগরী। কোরবান শেখ দেখল। এক মিনিট চোখ বুজে ভাবল। কী ভাবল সে নিজেই জানে না। কিন্তু কথাটা বেরিয়ে এল ওর মুখ দিয়ে—তথাস্তু। আমি রাজি। তবে...সে আমরা বুঝতে পেরেছি। আপনার অস্থাবর সম্পত্তি অর্থাৎ নগদ টাকা, হীরা মাণিক্য এসবের কথা ভাবছেন তো? সেসব পার করিয়ে দেবার দায়িত্ব আমাদের। পুলিশ কাস্টমদের সাথে সে-বন্দোবস্ত আমাদের আছে। আপনাকে কিচ্ছু ভাবতে হবে না। এতেও আশ্বস্ত হতে পারে না কোরবান শেখ। ওর সামনে ভেসে ওঠে সেই মিছিল।

কিন্তু ওই লোকগুলো টের পেলে তো আমাকে জ্যান্ত পুঁতে মারবে। আগে কী ছিল সেটা বাদ যাক। এখন তো ওরাই সবকিছুর মালিক। ওদের অমতে—কী যে বলেন স্যার! এত বড় লিডার আপনি! আপনি এসব বোঝেন না? ওরা কারা? কতগুলো লোক ছাড়া তো কিছু নয়! আপনি যদি একবার লিখে দেন আমাদের তখন আমরা দেখে নেব ওদের। দুদিনেই দেখবেন যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফিরে গেছে বাপধনরা। তা ছাড়া আপনাকে ওরা পাবে কোথায়? আপনি তো তার আগেই পগার পার। ওরা হাসল চোখ নাচিয়ে যেমন করে হাসে মেয়ের দালালরা। সহসা কোরবান শেখের বুদ্ধিটা সাফ হয়ে গেল। ও টের পেল জানলা দিয়ে দেখা সেই উজ্জ্বল আলোকমালা দারুণ আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে ওর মনে। ও সঙ্গে সঙ্গে কাগজ কলম নিয়ে বসল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই বিনিময়চুক্তিটি স্বাক্ষর হয়ে গেল।

হামেল কামেল বাজে কথা বলেনি। রাতের অন্ধকারে পুলিশ কাস্টমের চোখ এড়িয়ে মণিমাণিক্যসমেত কোরবান শেখকে নদীর ওপারে পৌঁছিয়ে দিল।

কোরবান শেখ যখন শহরে পৌঁছাল দিগন্তে তখন ভোরের প্রথম আলোর ছটা। স্নিগ্ধ শীতল হাওয়া ওকে বুকে জড়িয়ে সম্ভাষণ জানাল।

শহরে ঢোকার পথটা ছোট্ট একটা পাহাড়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে নেবে গেছে। পাহাড়ের উপর থেকে কোরবান শেখ দুচোখ ভরে শহরটাকে দেখল। ওর চোখ জুড়াল। ওর মন জুড়াল। এত বড় আর সুন্দর শহরটার মালিক সে স্বয়ং। ভাবতেই কোরবান শেখের সমস্ত শরীর জুড়ে আনন্দের শিহরন বয়ে গেল।

কিন্তু শহরে ঢুকে কোরবান শেখ ফাঁপরে পড়ল। শহর-কোতায়ালের দফতরে গিয়ে সে চুক্তিটা দেখাল। শহর-কোতয়াল ওকে হেসে বিদায় দিল। আরও যেসব বড় বড় দফতর ওর চোখে পড়ল সেসব দফতরে ঢুকল। ওরাও হাসল এবং ওকে বিদায় দিল। রাস্তার লোকজনকে ধরে ব্যাপারটা বোঝাতে চেষ্টা করল। তারাও

BanglaBook.org

হাসল এবং যে যার কাজে চলে গেল। কোরবান শেখ বুঝতে পারে না লোকগুলো এত হাসে কেন? কোরবান শেখ এটাও বুঝতে পারে না লোকগুলো ওর কথায় এতটুকু কর্ণপাত করে না কেন?

কোরবান শেখ ভাবতে বসল। ভাবতে ভাবতে একটা উপায়ও পেয়ে গেল। কোরবান শেখ ঠিক করল কয়েক হাজার লাঠিয়াল যোগাড় করবে। কোরবান শেখ নিজ গ্রামে দেখেছে যার যত লাঠিয়াল তার তত দাপট। কোরবান শেখের দূর-সম্পর্কের এক চাচা শুধু লাঠিয়ালদের জোরে গ্রামে-গ্রামে জমি দখল করেছে। যাদের জমি তাদের কোনো লাঠিয়াল ছিল না। তারা জমি রাখতে পারেনি। থানা-কাছারি করেও কোনো ফল হয়নি। তেমনি লাঠিয়াল দিয়েই শহরটাকে দখল নিতে হবে। লাঠিয়াল ছাড়া ওই ব্যাটাদের গা-ঘিনঘিন-করা হাসির অন্য কোনো জবাব নেই।

কিন্তু এ এক আজব শহর! এখানে লাঠিয়াল পাওয়া যায় না। টাকাপয়সার লোভ দেখাল। সোনা মানিকের লোভ দেখাল। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হল না। কেউ লাঠিয়াল হতে রাজি নয়। তাই বলে কোরবান শেখ হাল ছাড়বে নাকি! হাল ছাড়লে চলবে কেন? লাঠিয়ালের সন্ধানে এ-রাস্তা সে-রাস্তা ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে এমন এক জায়গায় এসে পড়ল যেখানে নূতন রাস্তা হচ্ছে। রাস্তার পাশে একটা পুকুর। সেই পুকুরের কিনার ধরে অনেক মজুর কাজ করছে।

এই মিঞারা তোমরা কার কাজ কর? —বেশ হেঁকে জিজ্ঞেস করল কোরবান শেখ।

লোকগুলো হাসল। হেসে জবাব দিল। কার আবার কাজ করব? নিজের কাজ করি।

আহা কোনো কোম্পানি বা কোনো লোকের কাজ তো বটে।

না বাবা এসব আমাদের কাজ।

আহা, আমাদের তো বুঝলাম। তোমাদের এই আমাদের ভদ্রলোকটা কে, তা-ই তো জানতে চাইছি।

মজুরগুলো এবার দল বেঁধে হাসল এবং কিছুটা বিরক্তির সাথে বলল—যাও তো বাপু। কাজের সময় গোলমাল কোরো না।

কোরবান শেখ বেজাহান। ওর লাঠিয়াল না হলে চলবে না। ও এবার মরিয়া হবে বলল—শোনো মিঞারা, তোমরা আমার চাকরি করো। অনেক টাকা দেব। সোনা চাও তো সোনা দেব। লোকগুলো এবার হি হি করে হাসল। বলল—না বাপু, তোমার চাকরি আমরা করব কেন? আমরা আমাদের নিজেদের চাকরি করি।

ব্যাটা বজ্জাত মনে হচ্ছে। ওকে শহরের বাইরে রেখে এসো। কে-একজন বলল।

না, মাথায় ঘোল ঢেলে গাধায় চড়িয়ে শহর ঘুরিয়ে আনো। আর-একজন বলল।

BanglaBook.org

না বাবা, অত ঘোরাবার সময় নেই। ঢের কাজ পড়ে আছে। তৃতীয় জন কথায় ইতি টেনে কাজে মন দিল। কিন্তু ওরা কাজে মন দিলে কী হবে! কোরবান শেখ নাছোড়বান্দা। ও বলল—আহা তোমরা বুঝছ না ব্যাপারটা। এই কাজে যা পাও তার দ্বিগুণ দেব। রাজি? লোকগুলো আবার হাসল।

ভাই, দ্বিগুণ দিয়ে আমরা কী করব? আমরা যা পাচ্ছি তাতেই চলে যাচ্ছে।

আ ম'ল কী যে বলে! কোরবান আলির মনে হল ও বুঝি কোনো উলটো রাজার দেশে এসে পড়েছে।

কোরবান শেখ বেপরোয়া। ওর লাঠিয়াল চাই।

দ্যাখো, সোজা কথা বলছি। রাজি হও তো সই—নইলে জোর করে তোমাদের আমি লাঠিয়াল বানাব।

একজন মজুর এবার খেপেই গেল। বলল—এ-ব্যাটার জ্বালায় দেখি কাজ করা যাবে না। মজুরটা এগিয়ে এল। কোরবান শেখকে ওর পোঁটলাপুঁটলিসমেত পাঁজাকোলা করে তুলে নিল। তারপর ধাঁ করে সোজা ছুড়ে দিল পুকুরে।

শান্ত পানিতে সাঁতার শিখেছিল কোরবান শেখ। কিন্তু এঁদো পুকুরে যেখানে পানির চাইতে কাদা বেশি সেখানে ওর সেই শেখা কোনো কাজে এল না। যতই হাত পা ছুড়ল ততই কোরবান শেখ ডুবে চলল।

অবশেষে পুকুরে ডুবে কোরবান শেখ মারা গেল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মৃত্যু-দুই

আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই আওয়াজটা পাচ্ছি। ধপ ধপ করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার শব্দ। তারপর আমার দরজার ধাক্কা। হাতের ধাক্কা পেয়েই ভেজানো দরজাটা খুলে গেল।

ভেতরে ঢুকেই লীনা বরাবর যা বলে তা-ই বলল—এই যে এখনও শুয়ে আছ? শিগগির ওঠো।

ও বসল। আবার উঠে পড়ল—এখনও চা খাওনি দেখছি! আমি এখনই চা করে ফেলছি। আমার ঘরের কোণে রাখা হিটারটা ও জ্বালাল। চা করল। হাতব্যাগটা খুলে বের করল একটা কাগজের পোঁটলা। পোঁটলা থেকে বেরুল কয়েকটা মংসের পিঠা।

ও সবসময় যেমন করে গল্প করে অর্থাৎ আমার বিছানায় পাজোড়া তুলে চা আর পিঠা খেতে খেতে গল্প বলে চলল। হাসেমের চাকরি হয়েছে রেডিওতে। খালেদার বাবা জোর করে ওর বিয়ে দিয়েছে একটা কালো, ভোঁদা ছেলের সাথে। রতনের বাবা ঘুস খেতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে।

হঠাৎ আমার গায়ে হাত দিয়ে ও চেঁচিয়ে উঠল—একী, তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে!

ওর মুখে বেদনার ছায়া। ওর চোখে টলমল অশ্রু। সারাটা জীবন এমনি করে কষ্ট পাবে এবং আমাকেও কষ্ট দেবে! কেন এত অযত্ন কর স্বাস্থ্যের?

বাথরুম থেকে তোয়ালেটা ভিজিয়ে এনে ও আমার মুখটা মুছিয়ে দিল। টেবিলে রাখা অনেকগুলো কৌটোর মাঝে একটা কৌটো বেছে নিয়ে তা থেকে একটা বড়ি খাইয়ে দিল। তারপর আমার মাথায় হাত রেখে বলল, লক্ষ্মী ছেলে। কথা দাও স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেবে?

কথা দিলাম নজর দেব।

BanglaBook.org

আরও অনেকক্ষণ গল্প করল লীনা। কবে আমরা বনভোজনে গেছিলাম সে-গল্প। সিনেমা দেখতে গিয়ে কেমন করে ওর বাবার মুখোমুখি পড়ে গেছিলাম সে-গল্প।

তারপর উঠল লীনা। খামে মোড়া একটা নিমন্ত্রণলিপি আমার টেবিলে রেখে বলল—তাড়াহুড়ো করে ঠিক হয়েছে। এসো কিন্তু।

চিঠিটা খুললাম। বিয়ের দাওয়াত। কোনো-এক রিটায়ার্ড সাবজজ আমজাদ হোসেনের কনিষ্ঠ পুত্র রফিক আমজাদের সাথে আগামী পরশু লীনার বিয়ে।

আমি শুয়ে শুয়ে তখনও আওয়াজ পাচ্ছি। থপ থপ সিঁড়ি ভেঙে লীনা নেমে যাচ্ছে।

BanglaBook.org

নিলুফার বেগম ও একখানি চিঠি

উৎসবের সমারোহ দোমঞ্জিলা বায়তুল আমানকে ঘিরে। কচি কচি সবুজ লতাপাতার স্তূপ জমেছে ফটকের সামনে। ফটক থেকে সাদা কালো নুড়ির যে-রাস্তাটি সোজা গিয়ে ঠেকেছে বায়তুল আমানের সিঁড়ির গোড়ায় তার গায়েও নূতন রং লেগেছে। দুপাশের ঊর্ধ্বমুখী ছুঁচালো ইটের টুকরোগুলিতে রং পড়েছে সাদা কালো, সাদার পর কালো, কালোর পর সাদা। প্রতি এক হাত ফাঁক দিয়ে পোঁতা হয়েছে লাল শালুতে মোড়া বাঁশ। বাঁশের মাথায় উড়ছে সিল্কের ছোট্ট ছোট্ট জাতীয় পতাকা। ফটকের পেছনে পড়েছে বাজিকর, বাদ্যকরদের তাঁবু। নহবতের হালকা সুর বাতাসের মৃদু কম্পনে ভেসে যায় দূরদুরান্তে। কাশ্মীরি গালিচায় গোল হয়ে বসেছে...দল নিজ নিজ বাদ্য সামনে নিয়ে। মাঝখানে রয়েছে রুপোর রেকাবিতে সাজানো পান, জর্দা, কিমামের নকশা-করা কৌটা, ধূপদানিতে ধূপকাঠি জ্বলে জ্বলে বিতরণ করছে আপনার স্নিগ্ধ সুবাস। আতরদান, গোলাপদান থেকে কড়া মিঠে গন্ধ নহবতের সুরের সাথে মিশে গিয়ে সৃষ্টি করছে এক অপূর্ব মায়ার জগৎ। নকশা-কাটা লক্ষ্ণৌ টুপি আর বুটিদার মলমলের ঢোলা পাঞ্জাবির ফাঁকে নজরে পড়ে শুভ্র-শ্মশ্রুমণ্ডিত ওস্তাদের উজ্জ্বল মুখখানি, চোখ বোজা; মনে হয় যেন হারিয়ে গিয়েছে মায়ার জগতে। অভিজাতসুলভ দূরত্ব বজায় রেখে গাড়ি, বারান্দার টুল চেয়ারে আশ্রয় নিয়েছে ব্যান্ডবাদকের দল। মাথায় তাদের জরিমোড়া তকমা, গায়ে মিলিটারি কায়দার শার্ট, পরনে আঁটসাঁট ব্রিচেস, পায়ে কালো বুট, দাড়িগোঁফহীন সুশ্রী চেহারা সবার। নহবতের হালকা সুর আমনেই তাদের পালা। বিউগলের ধ্বনি তুলে, আকাশবাতাস কাঁপিয়ে মার্চের ভঙ্গিতে ঘুরে ঘুরে সারা চত্বরে চক্কর মারে তারা।

খানবাহাদুর ওয়াহিদ সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মিস নিলুফার খানমের বিয়ে আজ তরুণ ব্যারিস্টার শফিকুল আলমের সাথে। তাই এত উৎসবের আয়োজন। কলেমা পড়া হবে রাত দশটায়। বর আসবে নয়টায়। সকাল থেকেই তাই হুকুম

BanglaBook.org

লেগে গেছে। বাজারের কাজ এখনও শেষ হল না, মিঠাইওয়ালার পাত্তা নেই, বাতিওয়ালা সেই যে আসছি বলে চলে গেল তো একেবারেই যেন গায়েব হয়ে গিয়েছে। খাসি-বকরি সবই হাজির কিন্তু কসাই ব্যাটা লাপাত্তা। শামিয়ানার জিনিসপত্র এখনও এসে পৌঁছাল না। এত ঝামেলায় আর দুশ্চিন্তায় খাঁবাহাদুরের হাঁকডাক ব্যান্ডের গর্জনকেই ছাড়িয়ে যায়। চাকরবাকরের অকারণ ছোটাছুটি বেড়ে যায় চতুর্গুণ। বিয়েবাড়ির তাণ্ডবে সরগরম হয়ে ওঠে সারা মহল্লা।

কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে এত লোকের তম্বি তাগিদ এত হৈচৈ সেই কনে অর্থাৎ মিস নিলোফার বেগম ঘুম থেকে উঠে, নাস্তা সেরে সবেমাত্র চায়ের পেয়ালাটি টেনে নিয়েছেন। ঘুমের জড়তা এখনও চোখেমুখে। চোখ দুটো ফোলা-ফোলা, বোধ হয় রাত্রে ঘুম হয়নি ভালো। সকিনা তার পার্শ্বচরী এ-বাড়ির আজন্ম পালিতা চাকরানি।

গরম চায়ের কাপে একটা বড় চুমুক দিয়ে বললেন কনে—সকিনা তোকে একটা কাজ করতে হবে, এখনই খু-উ-ব জরুরি। মুখের কথাটা শেষ করতে করতে ঝরনাকলমটি নিয়ে টেবিলে রাখা প্যাডে খসখস করে আঁচড় কেটে যান মিস নিলুফার।

ঝন ঝন ঝনাৎ ভীষণ শব্দে কেঁপে ওঠে সমস্ত বাড়িটা। আর তারই সাথে তাল মিলিয়ে খানবাহাদুরের কানফাটা আওয়াজ গর্জে উঠল পরপরই। একরাশ কাচের প্লেট খানখান হয়ে ভেঙে গিয়েছে খেদমতগার নফর আলির মাথা থেকে ফসকে গিয়ে।

নাঃ, কী আজ গোলমাল আরম্ভ হয়েছে, ভ্রূ কুঁচকে চেঁচিয়ে ওঠেন মিস নিলুফার। তাঁরই জন্য এত গোলমাল হয়তো সেকথাটিই স্মরণ করে পরমুহূর্তে লজ্জায় নরম হয়ে আসে তাঁর মুখ। প্যাডটা আবার টেনে নিয়ে বলেন, তুই এখন যা সকিনা, একটু পরে আসিস।

বায়ুতুল আমানের দোতলার সামনে এপাশ-ওপাশ টানা বারান্দা। তারই পূর্ব কোণে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে সকিনা। নিচের ত্রস্তব্যস্ত চলমান লোকগুলোর ঘর্মাক্ত কলেবর তার নজরে পড়ে না।...ওস্তাদের নকশা-আঁটা ধপধপে লক্ষ্ণৌ টুপি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে না। অথচ সে তাকিয়ে আছে নিচের দিকেই। মাঝে মাঝে কৌতূহলী দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একান্ত ঔৎসুক্যে পাশের বাড়ির ফটকের মাথায়, কী যেন সেখানে আছে, কী যেন খুঁজছে ওখানে। কিন্তু শূন্য ফটকের মাথায় ধাক্কা খেয়ে দৃষ্টি ফিরে আসে বারবার। আবার সেই ব্যান্ডবাদকের উর্দি, লাল শালুতে মোড়া বাঁশের ডগায় সবুজ পতাকা...দৃষ্টি তার পুনরায় ফিরে আসে ঐ ফটকের মাথায় সেখানে তখন একটি কাক বসে পায়ের নখ দিয়ে গা খুঁটছে। বড্ড করুণ মনে হয় নহবতের সুর—তার হৃদয়ের কোনো নিভৃত কোণে বিঁধে দেয় নির্মম বেদনার হুল। অশ্রুজলে ঝাপসা হয়ে আসে হাসিনার দৃষ্টি। আঁচলখানি টেনে ভালো করে রগড়ে নেয় চোখ দুটো, আবার একবার তাকায় ঐ পাশের বাড়ির ফটকের সামনে। কাকটি তখন উড়ে গিয়েছে।

BanglaBook.org

এই যে খানকি মাগি এখানে? তোকে খুঁজে খুঁজে আমি সারা—খানবাহাদুর-পত্নীর কণ্ঠস্বর ফেটে পড়ে বোমার মতো। খাস আজরাইলকে দেখলেও বোধ হয় এত ভয় পেত না। সকিনা চকিত কম্পিত দেহ টান করে বলে ভয়ে ভয়ে, ছোট আপা, বলছিলাম কি, জরুরি কাজ আছে, তাই এখানে অপেক্ষা করছিলাম।

এক কথার বেশি দুকথা খানবাহাদুর-গিন্নি কখনও সহ্য করেন না, তাই কথা না বাড়িয়ে সকিনা অন্দরমুখী হয়। দরজায় পা রেখেও গিন্নির রক্তচক্ষু এড়িয়ে একনজর পাশের বাড়িটার দিকে না তাকিয়ে পারে না। তীক্ষ্ণ বেদনায় জর্জরিত একটি নারীহৃদয়ের আকুল কামনা সেই দৃষ্টিতে।

পাশের বাড়িখানা মুফতি সাহেবের। তারই প্রশস্ত প্রাঙ্গণে শামিয়ানা টাঙিয়ে বরযাত্রীদের খানাপিনা, সাদর আপ্যায়নের এন্তেজাম হয়েছে। মুফতি সাহেবের গাড়িখানাও সাজছে বিয়ের সাজে। ড্রাইভার ছাক্কু মিয়া এতক্ষণ ব্যস্ত ছিল সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহের কাজে। এবার লেগে যায় মাজাঘষায়—বালতি বালতি পানি উজাড় করে গাড়িটা ধোয়। ঘষতে ঘষতে হাত দুটো যখন অবশ হয়ে আসে মোটা কাপড় দিয়ে মুছে নেয় অবশিষ্ট পানির বিন্দুগুলো। তারপর স্পিরিটে ভেজা পাতলা ন্যাকড়া আস্তে আস্তে বুলিয়ে নেয় গাড়ির কালো মসৃণ দেহটার উপর। দেখতে দেখতে হেসে ওঠে গাড়িটার সারা অঙ্গ। সেই হাসির ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ছাক্কু মিয়ার ঠোঁটের কোণে। গাড়িটার পাঁচ বছর বয়সে একদিনের জন্যও ছাক্কু মিয়ার শাসন বা সেবায় ছেদ পড়েনি। তার প্রতিটি নাট-বল্টু, খামখেয়ালি চালচলন সবই ছাক্কু মিয়ার নখদপর্ণে। রীতিমতো ভালোবাসে সে গাড়িখানা। তার প্রতিটি কল-কবজার সাথে যেমন ছাক্কু মিয়ার গভীর আন্তরিকতা তেমনি তার চলার গতিতে নেচে নেচে ওঠে ছাক্কু মিয়ার ধমনিপ্রবাহ এক অপূর্ব ছন্দে। গত পাঁচ বছর যতবারই ছাক্কু মিয়া স্টার্টারে হাত দিয়ে এই যন্ত্রশিশুর নির্জীব দেহে প্রাণের সঞ্চার করেছে ততবারই এই বিচিত্র অনুভূতি জেগেছে তার মনে। যন্ত্রশিশু যেন কথা কয়েছে তার কানে-কানে। পাঁচ বছরের এই প্রাত্যহিক অনুভূতিটা আজ একসাথে এসে ভিড় জমায় তার মনের কোণে। ধোয়ামোছার ফাঁকে ফাঁকে ছাক্কু মিয়ার চঞ্চল চোখ দুটি ফিরে ফিরে যায় বোলচালমুখরিত বায়তুল আমানের দিকে। ঐ যে ছাদের উপর মোটা একটি বাঁশকে কেন্দ্র করে ছোট ছোট কঞ্চি দিয়ে কী যেন তৈরি হচ্ছে, ওখানে বুঝি বাতির খেলা চলবে। ঐ তো ফটকের সামনে বাজিকরদের পঞ্চাশ হাত উঁচু বাঁশের ফ্রেমটা দাঁড়িয়ে আছে তারই মাঝে ঝুলছে লাল নীল কাগজে মোড়া অসংখ্য ছোট ছোট পোঁটলা, বারুদে ভর্তি আতশবাজি খেলার প্রস্তুতি চলছে হয়তোবা। এতসবের মানে বোঝে না ছাক্কু মিয়া।

এ হল স্রেফ ফালতু খরচা—একেবারে ফালতু...। বায়তুল আমানের নেপালি দারোয়ানকে হাঁক দিয়ে বলে ছাক্কু মিয়া।

নেপালি মুনিবের গর্বে গর্বিত। খাকি শার্টের উঁচু কলারটি টিপতে টিপতে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে মারে, আমির আদমি খরচা না করবে তো তোমার ড্রাইভারির নোকরিটা মিলবে কোত্থেকে...ভেবে দেখেছ?

BanglaBook.org

অত ভাবার অবসর ছাক্কু মিয়ার নেই, দৃষ্টিটা তার লেপটে থাকে বায়তুল আমানের দোতালার জানালায়, বারান্দার কোণে, যেখানে এখন কুঞ্জলতা আর পাতাবাহারের লম্বা বাঁকা রেখাগুলো সুতোর প্যাঁচে প্যাঁচে জড়িয়ে আছে। তারই ফাঁকে এক টুকরো আসমানি আঁচল কেঁপে কেঁপে জানালার পথে বেরিয়ে আসতে উন্মুখ। ছাক্কু মিয়ার উৎসুক চোখজোড়ায় বিদ্যুতের ঝলক খেলে যায় এক লহমার তরে। মিস নিলুফারের মুখখানি জানালার ফাঁকে দেখা দিয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। বিড়বিড় করে কতগুলো অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে আসে ছাক্কু মিয়ার মুখ থেকে। ইঞ্জিনটা আগেই স্টার্ট করা আছে। তবু আর-একবার পরখ করে নিতে হয়। স্টার্টারে চাপ পড়ে, যন্ত্রশিশু করুণ আর্তনাদে ভেঙে পড়ে।

শাবাশ! মাটগার্টে একটি সজোরে থাপ্পড় মারে ছাক্কু মিয়া।

আজ নূতন বিবি তোর উপর সওয়ার হবে, সেই মাফিক তোকে চলতে হবে, রেকসিনের সিটগুলো আঙুল বুলোতে বুলোতে বলে ছাক্কু মিয়া। এবার দোকানের চুক্তিকরা লোকগুলোকে নিয়ে সে লেগে পড়ে ফুলের সাজ নিয়ে। এ নিয়ে প্রচণ্ড বাগ্‌বিতণ্ডা হয়েছে সারা সকালে ওই দোকানের লোকগুলোর সাথে। খানবাহাদুরের নিজ গাড়িটা তারা সাজিয়েছে। বিশেষভাবে একটি পূর্ণাবয়ব রাজহাঁসের পেটের মধ্যে তলিয়ে গিয়েছে গাড়িটা। জানালার ক্ষুদ্র পরিসরটুকু ছাড়া বাকি সবটাই রাজহাঁসের রজতশুভ্র ডানায় ঢাকা। ওতেই ঘোর আপত্তি ছাক্কু মিয়ার। তার গাড়ি নিয়ে ছেলেখেলা করা যাবে না সাফ জবাব। গাড়ির সুন্দর শ্রীটাই যদি ঢেকে রাখবে তবে ওটা কেমন সাজ? হ্যাঁ, ফুল দিয়ে মালা সেটা বেশ পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে ছাক্কু মিয়া। অবশেষে তার অনমনীয় মনোভাবের কাছে হাল ছেড়ে আত্মসমর্পণ করেছে বেচারি সাজানেওয়ালার দল। নানা রঙের নানা বিচিত্র অলংকারের ফুলে সজ্জিতা হয় নূতন বিবির সোয়ারি। ছাক্কু মিয়ার চোখটা কিন্তু রয়েছে অন্যদিকে, হয়তোবা মনটাও। বায়তুল আমানের জৌলুসে ঠোক্কর খেয়ে ফিরে আসে তার চোখ বারবার। বেলা বাড়তে থাকে। বিরাটকায় ডেকচিতে টিনের পর টিন ঘি ঢলকে পড়ে মিলিয়ে যায়। বাজনার তালে তালে নেচে বেড়ায় ছেলেমেয়ের দল। বায়তুল আমানের জানালায়, বারান্দায় ঢাকা পড়েছে বিজলি তারের জালে। ছাক্কু মিয়ার নিষ্পলক দৃষ্টি তারের জালে আটকে যায়।

খামে পোরার আগে চিঠিটার উপর আর-একবার চোখ বুলিয়ে নেন মিস নিলুফার।

Rashid, dear,

তোমার কাছে হয়তো এই আমার শেষ চিঠি। পিতার অর্থ, স্বামীর যশ এ-দুয়ের আমার প্রয়োজন জীবনকে উপভোগ করার জন্য। তাই শফিকের সাথে আমি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছি, প্রেমের দাবিতে নয়—পিতার নির্দেশে। স্বইচ্ছায় এ সবই তো তোমাকে বলেছি সেই নদীর উপর বাইচের নৌকা ভাসিয়ে যেদিন বিদায় নিলুম তোমার কাছ থেকে। তবু আজ নহবতের সুরের সংবাদে ঘুম ভেঙে তোমার কথাই মনে পড়ল সর্বপ্রথম। বুঝলুম আমার জীবন থেকে তোমার স্মৃতি

BanglaBook.org

উপড়ে ফেলা অসম্ভব। এই অসম্ভবকে সম্ভব করার দায় যে বড় কঠিন। যৌবনের প্রথম স্বপ্নে তোমার ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠেছিলুম একথাই মনে পড়ছে বারবার। আমার যৌবনসম্পদ যে তোমারই পদতলে উৎসর্গিত। এ-সত্য নিজের মনে অস্বীকার করতে পারি কই? ক্ষমা চাইছি আপন ব্যর্থতার জন্য। রাত দশটায় হবে কলেমা পড়া, এসো কিন্তু।—তোমারই নিলু।

মিস নিলুফারের চিঠিটা নিয়ে সকিনা বেরিয়ে যায় গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে। এ-কাজ তার কাছে নূতন নয়। গত চার বছর ধরে রশিদ নিলুফার প্রেমের অনেক মহাকাব্যই তাকে অনেক বহন করতে হয়েছে, কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে, সকলের গোচরে। কিন্তু আজ কেমন বিসদৃশ মনে হল দূতীয়ালির কাজটা। নিজেকেই মনে হল বড্ড নোংরা। বিয়ের দিন কনের চিঠি বয়ে নিয়ে যাওয়া পরপুরুষের কাছে—কাজটা যেমন বিরক্তিকর তেমনি অশোভন। রিকশায় বসে বসে এসব কথাই সে ভাবছিল আর জাহান্নামের ফেরেশতা ইসরাইল-সিকাইলের হাতে সমর্পণ করছিল রশিদ নিলোফারকে। [তার মতে ওদের পাপজীবনকে]। সমবেদনায় উথলে উঠছিল তার বুক নির্বোধ (তার মতে নিষ্পাপ) শফিক ব্যারিস্টারের প্রতি।

মোটরগাড়িটা এসে রিকশার গায়ে প্রায় ধাক্কা খেতে খেতে সামলে যায়। এক অশ্রাব্য গালিতে মুখর হয়ে ওঠে শান্তিপ্রিয় রিকশাওয়ালা।

আচ্ছা ভাই চটছেন কেন? তোমার আর কষ্ট করতে হবে না, অমন কিমতি সওয়ারি না হয়ে আমিই পৌঁছিয়ে দিচ্ছি। নিজের রসিকতায় নিজেই হেসে কুটিপাটি ছাক্কু মিয়া।

ছি, রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে কীসব বেহায়াপনা হচ্ছে—কৃত্রিম ভর্ৎসায় চেঁচিয়ে ওঠে সকিনা। বান্দা যে পাগল হয়ে উঠল সকাল থেকে শাহজাদির মোলাকাত না পেয়ে, তেমনি রসিকতার সুরে বলে ছাক্কু মিয়া।

ওমা, একী বিশ্রী দেখাচ্ছে তোমার গাড়ি? অত ফুল কেন? গাড়িটার দিকে আঙুল রেখে জিজ্ঞেস করে সকিনা।

ছাক্কু মিয়ার হাসিটা আসে ম্লান হয়ে, আশ্চর্য ভাব করে বলে—বিশ্রী? বল কী? বিয়ের কনে নিয়ে যাবে আজ, তাই ওকে সাজিয়েছি মনের মতো করে।

কিন্তু যা-ই বলো, আমাদের নিলুফার বিবির রূপের কাছে তোমার গাড়ির সাজটি দেখাবে রামছাগলের মতো—টিপ্পনী কাটে সকিনা।

সকিনার দুষ্টুমিতে কান না দিয়ে গম্ভীর ছাক্কু মিয়া বলে, দরকারি কথাটা শোনো এবার।

BanglaBook.org

মুন্না

ঠাসাঠাসি লোকের ভিড়ে গমগম করছে রাজপথ। ছোটবড় দল বেঁধে আসছে সবাই, কেউবা উত্তর দিক থেকে, কেউবা পশ্চিম থেকে এসে মিলছে চৌমাথাটায়। তারপর এগিয়ে চলছে বিশাল জনস্রোত যেন ক্রুদ্ধ অজগর ফুসফুস করে পথ কেটে চলছে বিপুল দেহখানি হেলিয়ে দুলিয়ে মন্থর গতিতে, শিকারসন্ধানে, ফণা তার উদ্ধত।

দুপুরের সূর্য সবেমাত্র হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। সাধারণত এমন সময় এই রাস্তাগুলো থাকে জনবিরল। অকস্মাৎ জনসমুদ্রের উদ্দাম বন্যায় ভাসিয়ে দিল সারা অঞ্চলটি। অবেলায় এত লোকের ভিড় কেন? কোথায় চলেছে সব? বড় রাস্তার বাঁকে রশিদ মিয়ার চায়ের স্টল, তারই বয় কিশোর মুন্না। দেইখ্যা আছি সার কী ঐল, মনিবকে এত্তেলা দিয়ে সেও সটকে পড়ে ভিড়ের মধ্যে। অতি যত্নে ভাঙা রিকশাখানার অস্তিত্ব রক্ষা করে কোনোরকমে সিটের উপর বসে আছে হাকিম। প্যাডেলে পা রাখতে গিয়েই আয্যামি হয়েছে যার। তাই বেচারা পা জোড়া তুলে দিয়েছে একেবারে হ্যান্ডেলের মাথায়। ডান হাতখানি শক্ত করে ধরে রেখেছে হ্যান্ডেল আর বাঁ হাত ভিড়ের চাপ থেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত। জনস্রোতের ধাক্কায় রিকশাসহ সেও এগিয়ে চলে সামনের দিকে।

কীরে মুন্না যাস কই। হঠাৎ পাড়ার পোলা মুন্নাকে দেখে চেঁচিয়ে ওঠে হাকিম।

তুই যেথায় যাস হোথায়,—ততোধিক জোরে চেঁচিয়ে জবাব দেয় মুন্না। ইশারা পেয়ে মুন্না কাছে আসে খানিকটা কিন্তু হাকিমের নাগাল পায় না। লম্বা লম্বা জোয়ানদের কোমরের নিচে তলিয়ে থাকতে হয় বেচারা মুন্নাকে। আয়, আয় রিকশার উপরে উঠে বস। হাকিম গলা বাড়িয়ে সাদর আমন্ত্রণ জানায়। হাফপ্যান্টের পকেট থেকে গুঁড়ো বিস্কুটের একটি টুকরো মুখে পুরে জবাব দেয় মুন্না—না রে, আজ রিকশায় চড়ুম না। জ্ঞান হবার পর এই বোধহয় প্রথম মুন্না

BanglaBook.org

অবলীলাক্রমে এমন লোভনীয় আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করছে। হঠাৎ রিকশার ছোট হ্যান্ডেলটি পেঁচিয়ে যায় পাশের মাওলানা সাহেবের শেরওয়ানির সাথে। হ্যাঁচকা টানে শেরাওয়ানির পকেটটি চিরে হাকিম মুক্ত করে নেয় তার হ্যান্ডেল। হা হা করলে কী, ত্রস্ত মাওলানা সাহেব ছেঁড়া পকেটের টুকরোখানা আগলে ধরে থাকেন। রিকশার গতি ফেরাতে গিয়ে পেছনের মাটগার্টের এক লোহা উড়িয়ে নিয়ে যায় আর-এক পথিকের পাজামার নিচের দিকটা। হাঁটু থেকে গোড়ালি অবধি পাজামার আস্ত টুকরোখানা লেপটে যায় চাকার সাথে। মজিদ কেরানি খেঁকিয়ে ওঠে। বাবা রিকশা ফিকশা নিয়ে তুমি কেন এখানে এসেছ, জুলুম করতে? দিলে তো পায়জামাটার দফা রফা করে! ইস্, নিদেনপক্ষে তিনটি মাস চালিয়ে দিতে পারতুম। মুন্না কখন ভিড় ঠেলে ঠেলে ঠিক পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। কেরানি সাহেবের জামার খুঁটে একটুখানি টান মেরে বলে, অমন করবার লাগছেন ক্যান সাব? কী অইছে, ১লা তারিখ তো সামনে, নেবেননে আবার একটা নয়া পায়জামা বানিয়ে। ঠিক কইছস মুন্না, একেবারে আসল কথা কইছস, তারিফ করে হাকিম। লম্বাচওড়া জোয়ানকে ধাক্কা মেরে কোনোরকমে মুন্নাকে তুলে নেয় রিকশার সিটে। ঘাড়খানি কাত করে বলে, হুনছস মুন্না, বাবুজি কয় আমি ক্যান আইছি। আরে আমি আইমু না তো আইব কোন হালা। খিলখিল করে হেসে দেয় মুন্না। কেরানি সাহেবের ছেঁড়া পাজামাটার দিকে তাকিয়ে বলে, সাহেবের লাগছে বড়।

বেজায় সোরগোল ভেসে আসতে থাকে চৌমাথার দিক থেকে। চলতে চলতে অগুনতি পা থমকে দাঁড়ায়। হঠাৎ পেছন দিকে আওয়াজ ওঠে বহু কণ্ঠের। কী হল—এ ওর মুখের দিকে তাকায়। আঙুলের উপর ভর করে দেওয়া মাথাটা উঁচু করে সামনে পেছনে তাকিয়েও কিছু দেখবার যো নেই—শুধু মাথা আর মাথা। কান খাড়া করে শোনা যায় কেবল ঠুসঠাস শব্দ আর অজস্র কণ্ঠের পাঁচমিশালি আওয়াজ, কিছুই বোঝা যায় না।

না, বইস্যা থাকন যায় না, এবার সামলাইতে হয়। এক লাফে রিকশা থেকে নেবে ভিড়ের মধ্যে মিশে যায় মুন্না। ত্রস্ত হুইসল বাজাতে বাজাতে সিপাহিভর্তি তিনখানি লরি পাচারির কারবার না করে পাশ কেটে চলে যায় বিদ্যুৎগতিতে। কেউবা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে, কেউবা চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়, কেউ প্রাণভয়ে ছুটতে গিয়ে হোঁচট খায়, এ ওর গায়ে, ঠোক্কর খেয়ে গড়িয়ে পড়ে খোলা নর্দমায়, খানিক দোলা খেয়ে আবার চলতে শুরু করে কাফেলা, এগিয়ে যায় সামনের দিকে।

কাঠের ফ্রেমে তারের খুপরির আঁকা দরজাটি আগলে কাতারবন্দি শদুয়েক ছাত্র। দরজার উপরে রাস্তায় সারি সারি রাইফেলধারী পুলিশ। চৌমাথায় সাঁজোয়া গাড়ির ভিড়। তার কোণে সতর্ক সিপাহির দল বন্দুক-হাতে প্রস্তুত। দরজায় হেলান দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ে আকবর। আধ-খাওয়া সিগারেটটা পাশের সাথির হাতে দিয়ে বলে, ব্যাপারখানা দেখেছিস? পুলিশ যে ছেয়ে ফেলল!

BanglaBook.org

ব্যাপার আবার কী? পুলিশ দেখে তোমরা সব শান্ত হয়ে ঘরের ছেলে ঘরে গিয়ে ঘুমোও—সিগারেটে কষে এক টান মেরে উত্তর দেয় সঙ্গী।

না, আমি তা বলছি না, ভাবছি এত পুলিশ কেন?

হরতাল করেছ, তাই পুলিশ শান্তি রক্ষা করতে এসেছে, তুই অশান্তি দেখছিস কোথায়?

বা রে, সকাল থেকে স্লোগান মারছ, চ্যাঁচামেচি করছ, এতে শান্তি ভঙ্গ হচ্ছে না?

তাই বলে পুলিশ আসবে কেন?

তুমি একটা আস্ত গাধা, বিরক্ত হয়ে মুখ ঘুরিয়ে নেয় সাথিটি।

কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে একখানি জিপগাড়ি এসে দাঁড়ায় দরজার সামনে। গাড়ি থেকে মাইক্রোফোনের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। গুরুতর শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় সরকার শহরে ১৪৪ ধারা জারি করছে। এতদ্বারা নাগরিকদের জানানো হচ্ছে যে, রাস্তায় একসাথে চারজনের অধিক ব্যক্তির চলাচল নিষিদ্ধ। জিপগাড়িটি চলে যায় অন্যদিকে। অট্টহাসির ঢেউ ওঠে মাইকের ওপারে ছাত্রদের কাতারে।

তৃতীয় সারির লাজুক ছেলেটি গলা চড়িয়ে বলে—চল আকবর একটু চা খেয়ে আসি। পাজামার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে আকবর উঠে দাঁড়ায়। পাশের সাথিকে লক্ষ্য করে বলে, আমার জায়গাটি রইল। এক্ষুনি আসছি। এক পা পিছিয়ে আবার এগিয়ে আসে। বলে—দেখো, আমার জায়গাটি যেন কেউ দখল করে না বসে—বইগুলো রেখে যাচ্ছি আমার নিশানা। নিজের শূন্য জায়গাটিতে গুটি দুই বই আর একখানি খাতা রেখে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যায় উলটো দিকে।

ছেলেমেয়েদের ছোট ছোট দলে তখন ভরে গিয়েছে সারা ভল্লাট। এখানে-ওখানে জটলা বসেছে—কেউ উত্তেজিতভাবে হাত-পা নেড়ে অগ্নিবর্ষী ভাষায় ব্যাখ্যা দিচ্ছে আপন ভাবের। কেউ নীরব দর্শক, কেউ আপন দল-পরিবৃত হয়ে সবুজ ঘাসের উপর পা ফেলে আসর জমিয়েছে, আলোচ্য বিষয় গেটের সামনে কড়া পাহারায় মোতায়েন পুলিশবাহিনীর তত্ত্বাবধানে ব্যস্তসমস্ত সেই বিশাল বস্তুটি। গাছতলায় চলেছে সভার প্রস্তুতি।

দোতলার বারান্দায় মেয়েরাও জটলা পাকিয়েছে নাতিবৃহৎ দলে বিভক্ত হয়ে। সবার কণ্ঠস্বর ছাড়িয়ে ভেসে আসছে হালিমার আওয়াজ—আজ কিন্তু কারো ওজর-আপত্তি চলবে না, সবাইকে মিটিঙে যেতে হবে, লিকলিকে হ্যাংলা মেয়েটি পা থেকে মাথা অবধি সরু বেতের মতো শক্ত সরলরেখা, ছোট্ট লম্বাটে মুখের তুলনায় ঠোঁট দুটি পুরু। কথা বলার সময় মুখটা একটু ঝুঁকে পড়বে সামনের দিকে আর মোটা ঠোঁট দুটি কাঁপবে, আঁকাবাঁকা রেখায় তরঙ্গায়িত হয়ে ফুটিয়ে তুলবে মনের ভাষা।

কিন্তু পারুলদি যে না করে দিয়েছে—রেলিঙে হেলান দিয়ে দাঁড়ানো মেয়েটি জড়িয়ে জড়িয়ে বলে।

BanglaBook.org

হ্যাঁ ভাই, আমরও ভয় পারুলদিকে। আমাকেও কাল রাত্রে অফিসে ডেকে শাসিয়ে দিয়েছেন স্ট্রাইক করলে অথবা মিটিঙে গেলে ফাইন করবেন। হতাশার সুরে যোগ দেয় আর-একজন ছাত্রী।

আরে দ্যাখ! তোরা খালি পারুলদিকেই চিনিস, অবজ্ঞার সুর হালিমার কণ্ঠে, দেখছিস না; সব স্কুলের কচি কচি মেয়েরা পর্যন্ত হরতাল করছে মিটিঙে? তাদেরও পারুলদির মতো রক্তচক্ষুর ভয় আছে। আর আমরা ধাড়ি মেয়েরা চুপসে যাব ঐ পারুলদির ভয়ে? হালিমার কথায় লজ্জা পায় মেয়েটি। রক্তিম মুখ তুলে বলে, আচ্ছা, না, তুই যা বলবি তা-ই হবে, আর স্ট্রাইক যখন করেছি তখন মিটিঙে যাওয়াই ভালো।

তড়াক করে ঘুরে দাঁড়ায় হালিমা। মেয়েটির চোখে চোখ রেখে চাপা উত্তেজনায় ঠোঁট কাঁপিয়ে বলে না রাবেয়া, ওকথা বললে চলবে না। তোকে বুঝতে হবে তুই যা করছিস তা হচ্ছে ন্যায়ের জন্য, সত্যের জন্য। ভূমিষ্ঠ হয়ে যে-ভাষায় 'মা' ডেকেছিলি তাকে বাঁচানো কি তোর ফরজ নয়? মানুষের ন্যূনতম নাগরিক-অধিকার যেখানে পদদলিত সেখানে তুই কেমন করে সুখী থাকতে পারিস বল। মুখ ঘুরিয়ে নেয় রাবেয়া। হালিমার এই রণমূর্তির সামনে সে দুর্বল, কোনো জবাব খুঁজে পায় না। অনিরুদ্ধ হালিমা বলে চলে—আমায় খুশি করার জন্য তুই যদি মিটিঙে যাস তবে বলব হোস্টেলে গিয়ে ঘুম দে। সারা দেশের মানুষ যেখানে কথা বলার জন্য ছটফট করছে, নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে সেখানে কেমন করে তুই নির্বিকার থাকতে পারিস, এ যে মহাপাপ, আত্মহত্যার চেয়েও জঘন্য।

ছেলেদের চিৎকার শোনা যায়, আসুন আসুন, সভার ডাক পড়েছে। হালিমা বই হাতে উঠে দাঁড়ায়। পেছনে মেয়েরা অনুসরণ করে। সিঁড়ির গোড়ায় দেখা হয়ে য'য় আকবরের সাথে।

এতক্ষণ বুঝি দোতলার নিরাপদ দূরত্বে আসর জমিয়েছিলে? দুষ্টমির হাসি হেসে প্রশ্ন করে আকবর।

মোটেই না—প্রতিবাদ করে হালিমা। আমাদের আবার পারুলদির সমস্যা আছে কিনা, তাই সবাইকে জড়ো করতেই এতটা সময় কেটে গেল। চলো এখন সভায় যাওয়া যাক।

না, আমি সকালে এসেই স্থান নিয়েছি একেবারে ফ্রন্টে। এসব বিয়ারের কাজ তোমরাই চালিয়ে যাও। মানে, জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায় হালিমা।

মানে, আমি পিকেট লাইনের প্রথম সারিতে ঠায় বসে আছি সকাল থেকে। একবার তো দেখতেও গেলে না।

ইস্, ভারি আমার বীরপুরুষ রে! এরই মধ্যে হাঁপিয়ে উঠেছ বুঝি!

কই না তো! অপ্রস্তুত আকবর বলে।

তবে পালিয়ে এলে যে!

BanglaBook.org

হো হো করে হেসে দেয় আকবর।

না, পালিয়ে আসিনি, এলাম একটু চা খেতে আর দেখতে তুমি যথাস্থানে ঠিকভাবে আছ কি না।

খবরদারি আমি নিজেই করতে শিখেছি, কিন্তু হাসলে কেন?

হাসলাম তোমার আক্কেল দেখে। আজকের দিনে কেউ পালাবার কথা ভাবতে পারে?

উষ্মাজড়িত কণ্ঠে কথাটা বলে গম্ভীর হয়ে যায় আকবর। এমনি ধরনের কথা শোনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না হালিমা। আবহাওয়াটা লঘু করার চেষ্টায় বলে—এসো, আমাদের সভাটা একটু শুনেই যাও।

মিটিং তখন শুরু হয়েছে পুরোদমে। বক্তার তেজোদীপ্ত কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো, পৃথিবীর আলোবাতাসের উপর যেমন মানুষের জন্মগত অধিকার তেমনি বাক্‌স্বাধীনতা, সভাসমিতির অধিকার আমাদের জন্মগত অধিকার। আলো-বাতাসের মতোই তা সমাজজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। পেটের ভাত আর মুখের ভাষা থেকে বঞ্চিত মানুষের সামনে আত্মসমর্পণের কোনো পথ আছে কি? আসুন ভাইসব, আমাদের বাঁচার দাবিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের ন্যায্য গণতান্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা করার জন্য একতা ও দৃঢ়তার শপথ নিই, কোটি কণ্ঠের বজ্রনিনাদ ঘোষিত হোক।...

স্থির নিষ্কম্প মুখগুলির সংকল্পবদ্ধ চাহনিতে প্রকাশিত হয় বক্তার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন।

এবার যাই হালিমা, অনেক দেরি হয়ে গেল। যাও, each to your own part, স্মিতহাস্যে বিদায়ের ভঙ্গিতে হালিমা হাত তোলে। হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিকেলের কথাটি—দুকদম ছুট মেরে আকবরের পাঞ্জাবির পিছটায় টান মেরে বলে, ব্যস, রাত্রে সিনেমার engagementটা বেমালুম ভুলে গেছ নিশ্চয়ই। ব্যাগ হাতড়িয়ে একখানি নীল রঙের টিকেট বের করে গুঁজে দেয় আকবরের হাতে—ভাবিরা হলের বারান্দায় অপেক্ষা করবেন। ঠিক সময় এসো কিন্তু।

টিকেটখানা তোমার কাছেই থাক-না, দুজনে তো একসাথেই যাব।

যদি তোমার সাথে দেখা না হয়?

আরে হবে হবে—অসহিষ্ণু আকবর সামনের দিকে কদম বাড়িয়ে জোর গলায় বলে, আমি এসে তোমার হোস্টেল থেকে নিয়ে যাব।

বেশ।

হঠাৎ কানফাটা আওয়াজ। সচকিত মুখগুলো ঘুরে যায় রাস্তার দিকে যেখানে সঙ্গিন উঁচিয়ে সারিবদ্ধ আইনশৃঙ্খলার অভিভাবকমণ্ডলী। ও কিছু না, পুলিশ ট্রাকের টায়ার ফেটেছে। হাসি চেপে বলে আকবর।

সভার কর্মকাণ্ড তখনও শেষ হয়নি। স্লোগান আর মুহুর্মুহু করতালির মধ্যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা একে একে পেশ করছেন তাঁদের বক্তব্য, উল্লেখ করছেন নিজ নিজ সংগঠনের প্রস্তুতির কথা; দুর্বলতার দিকটাও বাদ যাচ্ছে না।

BanglaBook.org

কয়েকজন সহপাঠিনী এক লাজুক ছাত্রীকে ঠেলে দাঁড় করিয়ে দেয়। ছাত্রীদের তরফ থেকে আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি সবার সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আমরাও এগিয়ে যেতে চাই। গণতন্ত্রের অভিযানে বোনেরা ভাইদের পাশেই থাকবে—কোনোরকমে কথা কয়টি বলে চুপ করে বসে পড়ে মেয়েটি। হয়তো মেয়েটির জীবনে কোনো সভামঞ্চে দাঁড়িয়ে এ-ই প্রথম বক্তৃতা।

এমনি সময় দেখা যায় ফাটকের কাছে দু-তিনজন পুলিশ অফিসারের সাথে কতিপয় ছাত্রের কী নিয়ে যেন বিতণ্ডা বেধেছে। উদ্যোক্তাদের একজন ছুটে যান ফাটকের দিকে। অফিসাররা ভিতরে আসতে চান। ছাত্ররা নারাজ। পুলিশের কথা—বেআইনি সভা হচ্ছে তাই তাদের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। উদ্যোক্তাদের যুক্তি, প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে পুলিশি হস্তক্ষেপ বেআইনি, সভা চলছে শান্তিপূর্ণভাবে। ব্যর্থমনোরথ পুলিশকর্তারা ফিরে যান। সভার কাজও বোধ হয় শেষ হয়ে এসেছে। বিক্ষুব্ধ মুখগুলোতে নেমে আসছে স্বচ্ছ প্রশান্তি, আচমকা তপ্ত হাওয়ায় ভর করে নেমে আসে আগুনের হল্কা। অনেকগুলো রাইফেলের ক্রুদ্ধ গর্জনে কেঁপে ওঠে দালানের ইট; শিউরে ওঠে গাছের পাতাগুলো। কবুতরের ঝাঁক আর্তধ্বনি তুলে ছুটে যায় নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। হতচকিত বিহ্বল ছেলেমেয়েগুলো দাঁড়িয়ে থাকে নীরব নিথর। মুখে কারো কথা ফোটে না, ভীরু চাহনি, এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজে বেড়ায়। ধোঁয়ার কুণ্ডলী কেঁপে কেঁপে ফুলে ফেঁপে ছড়িয়ে পড়ে, গ্রাস করে নেয় সমস্ত বাতাস। কে যেন চেঁচিয়ে ওঠে পানি, পানি, পানি চাই; হালিমার চোখমুখ জ্বলতে থাকে—কে যেন আগুন লেপে দিয়েছে সর্বাঙ্গে। ঝিম ঝিম করে মাথা, চোখ অন্ধকার, নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়। হাত বাড়িয়ে সামনে কিছু ধরতে চায়, কিন্তু এ যে ধোঁয়া, পা বাড়ায় পা ওঠে না। কোত্থেকে রাবেয়া ছুটে আসে, হাতে তার এক মগ পানি। হালিমার চোখে পানির ঝাপটা মারতে মারতে বলে—ও কিছু না, টিয়ার গ্যাস। ভেজানো আঁচলটি চোখের উপর চেপে ধরে হালিমার, আর-একটি মেয়ে এসে পুরো এক বালতি পানি ঢেলে দেয় মাথায়। হাঁক ছাড়ে হালিমা, পরস্পর হাত ধরে বলে, চলো এগিয়ে দেখি ব্যাপারটা কী। ঝাঁকে ঝাঁকে টিয়ার বোম এসে লাগে গাছের গুঁড়িতে, দেয়ালের গায়ে, ঘাসের বুকে। হঠাৎ চিৎকার ওঠে—গুলি, গুলি। আকাশফাটা রাইফেল-গর্জনে স্তব্ধ হয়ে যায় সে-চিৎকার। হালিমা ফাটকের পাশে এসে জায়গা করে নেয়। লোহার ফাটক তখন খোলা, পুলিশ-লরি ঠিক ফাটকের সামনে। একটি ছেলে এত হট্টগোলের মধ্যেও নির্বিকার চিত্তে মাথা ঝুঁকিয়ে খাতায় কী যেন টুকছে। উৎসুক হালিমা ঘাড় কাত করে একবার দেখে নেবার চেষ্টা করে। ছেলেটি হেসে উত্তর দেয়, ও কিছু না, যারা জখম হচ্ছে তাদের সংখ্যা এবং সম্ভব হলে নাম-ধাম।

কিন্তু আপনি এভাবে উন্মুক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন, গুলি এসে লাগবে যে!

সে আপনার গায়েও লাগতে পারে।

BanglaBook.org

মুখের উপর এক ঝলক হাসি ছড়িয়ে ছেলেটি আপন কাজে মন দেয়।

কয়জন গ্রেপ্তার হল? এক শতের উপর। আহতের সংখ্যা কত?...গুরুতর আহত কেউ হয়নি।

গুলি লেগেছে কতজনের? প্রশ্ন করে হালিমা। এখানে গুলি চলেনি, গুলি চলেছে মেডিক্যাল কলেজের সামনে। খাতায় মুখ রেখে ছেলেটি জবাব দেয়।

বর্শার ফলার মতো কথাটি খচ করে বিঁধে যায় হালিমার বুকে। মেডিক্যাল কলেজের সামনে গুলি চলেছে? ক্ষীণ আর্তনাদ হালিমার কণ্ঠে। হিম হয়ে আসে নাড়ির রক্ত,—পেটের ভেতর থেকে সমস্ত নাড়িভুঁড়িটা যেন বেরিয়ে আসতে চায়, ফেটে পড়তে চায়। অব্যক্ত বেদনায় মুখটা ফুঁফিয়ে ওঠে মুহূর্তের জন্য। পাশের দেয়ালে লাগানো সাইকেলের হ্যান্ডেলটি চেপে ধরে শক্ত মুঠোয় জিজ্ঞেস করে, ঠিক বলছেন তো?

ছেলেটি বিরক্ত হয়ে বলে—এখানে দাঁড়িয়ে থেকে বোকার মতো গ্রেপ্তার হবেন কেন? ভেতরে চলে যান।

মুখ তুলতেই নজর পড়ে হালিমার রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের উপর। চমকে উঠে বলে—কী হল?

না, কিছুই না, ছোট উত্তর দিয়ে পুলিশ, লরিটার পাশ কাটিয়ে হালিমা নেবে পড়ে রাস্তায়। পা চালায় সামনের দিকে। ছেলেটি পেছন থেকে চ্যাঁচায়—করছেন কী? ওদিকে যাবেন না, এখনও ওদিকে গুলি চলছে।

সারাদিনের তপ্তরোদে লাল হয়ে উঠেছে মুখগুলো, ধুলোর পলেস্তরা তার ভাঁজে ভাঁজে চোখের কোলে। ক্লান্ত দেহগুলো তবুও ঠায় বসে থাকে ফটক আগলিয়ে। ওধারে একটি জিপ এসে থামে। জাঁদরেল গোছের একজন অফিসার লাফ দিয়ে রাস্তায় নেমে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় চারধারে। ফাটকের দিকে ক্লান্ত মুখগুলোর উপর দৃষ্টি তার নিবদ্ধ হয় ক্ষণিকের জন্য। বিড়বিড় করে কী যেন উচ্চারণ করে, তারপর কর্তব্যে মোতায়েন কতিপয় অফিসারের সাথে ফিসফিস করে দুটো-চারটে কথা বলে। পাহলোয়ানের ভঙ্গিতে লাফ দিয়ে জিপে চড়ে বসে। জিপ চলে যায়। চৌমাথা থেকে দুটো পুলিশ-লরি গোঁ গোঁ করতে করতে ঠিক ফাটকের পাশে এসে ঠাঁই নেয়। চৌমাথা খালি, পুলিশগুলো এগিয়ে আসছে ফাটকের দিকে, পেছনের সারি যায় ডানদিকে, মাঝের দুটো সারি সমান্তরাল রেখায় রাস্তার দুপাশে লাইন বাঁধে, সামনের সারিটা ফাটক-বরাবর এক হাত দূরত্ব রেখে সঙ্গিন তুলে প্রস্তুত হয়। ফাটকের উপর ধূলিম্লান মুখগুলো নবতর ঔৎসুক্যে চঞ্চল হয়ে ওঠে। দূর থেকে ভেসে আসে বন্দুকের আওয়াজ। নুয়ে-পড়া দেহগুলো সটান খাড়া হয়ে ওঠে, কান সজাগ। চোঙা-হাতে একটি ছেলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে, আপনারা ব্যস্ত হবেন না, যে যার জায়গায় বসে থাকুন। ফাটকের কবজিতে বাঁ-হাতের কনুই ঠেকিয়ে বসে ছিল আকবর। হাই তুলতে তুলতে শরীরের আড়মোড়া ভেঙে

BanglaBook.org

দাঁড়ায়। পেছন দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলে, ওরে জামাল, গুলির আওয়াজটা কোনদিক থেকে এল রে!

না, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে ফাঁকা আওয়াজ।

তা-ই হবে হয়তো, নির্লিপ্ত আকবরের সুর।

লাইনের পেছনদিকের ছেলেগুলো ফিসফিস করে কী যেন বলাবলি করে। অধীর চাঞ্চল্যে হাত-পা ছুড়তে থাকে। ইউনিভার্সিটিতে গুলি চলেছে। মুখে-মুখে কথাটা এসে আলপিনের খোঁচা মারে আকবরের কানে। ছ্যাঁত করে ওঠে বুকটা। হালিমার মুখটা অকারণে—হ্যাঁ অকারণেই মনে হয় তার কাছে, ভেসে ওঠে চোখের সামনে বারবার। শুধু হালিমার বিপদাশঙ্কায় কেন সে অস্থির হবে, আরও অনেক হালিমা, অনেক ছেলেমেয়েই তো ওখানে রয়েছে। কই তাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে সে তো আকুল হচ্ছে না! নিজের স্বার্থপরতায় নিজেই লজ্জা পেয়ে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে ধরে আকবর। মুষ্টিবদ্ধ হাতখানা ছুড়ে মারে আকাশের দিকে। নাঃ, বড্ড আজেবাজে ভাবনায় মন ভারাক্রান্ত করা যায় না। জামাল কাছে এসে কাঁধের উপর কোমল হাতের স্পর্শ বুলিয়ে স্ফূর্তির মেজাজে বলে, কীরে, ভাবছিস কী? জামাল হয়তো বুঝে নিয়েছে তার মনের কথা। তাই লজ্জা ঢাকার চেষ্টায় মুখ ঘুরিয়ে নেয় আকবর অন্যদিকে।

হঠাৎ কী যেন কী হয়ে গেল। এক ঝলক আগুনের হল্কা চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। রাইফেল-গর্জনে কেঁপে ওঠে বাতাস। অনেকগুলো রাইফেল বীভৎস আক্রোশে আগুন ঝরায়। ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ছুটে চলে ফাটকের ওধারে, দেয়াল ফুঁড়ে, ছাদের বাধা ডিঙিয়ে ধেয়ে চলে আকাশের পানে, বিঁধে যায় ঘরের টেবিলের গায়ে, গেঁথে থাকে বইয়ের মলাটে। আর-এক ঝাঁক, আবার এক ঝাঁক বৃষ্টিধারার মতো ঝরে পড়ে অবিরাম ধারায়, ঝরে পড়ে মাথার উপর। ঢুঁ মেরে কপালটা দুফাঁক করে চলে যায়, পাজরের হাড়গুলো গুঁড়িয়ে দেয় ধুলোর মাঝে। মাথার খুলিটা উড়িয়ে নিয়ে মিশে যায় হাওয়ায়। হাতটা আলগোছে তুলে নিয়ে বিছিয়ে দেয় পাশে, বুলেটের ঝড় উঠেছে।

আকবরের স্পন্দনহীন দেহ ঢলে পড়ে মাটির বুকে। রক্তের ফোয়ারা শুকনো মাটির তৃষ্ণা মিটিয়ে স্রোতের বেগে বেয়ে চলে। ডান হাতখানি ছিটকে পড়ে অদূরে।

কাঠের দরজা ভেঙে যায়। রাইফেল নিস্তব্ধ। দুর্জয় আবেগে আকবরের সাথিরা ছুটে আসে রাস্তায়। পুলিশ-লরি গোঁ গোঁ ক্রন্দন তুলে ফিরে আসে চৌমাথায়। বন্দুকধারী পথ করে দেয়। সার্জেন্ট রিভলভার পকেটে পুরে রাস্তার পাশে হাই তোলে।

ডুবন্ত সূর্যের রঙিন আভা তখনও উঁকিঝুঁকি মারছে গাছের ফাঁকে ফাঁকে। আবিরের খেলা আকাশের কোণে। রক্তিম বর্ণচ্ছটা রং ছড়ায় দেয়ালের গায়ে। নির্বাক হালিমা মাত্র একবার দৃষ্টি বুলিয়ে নেয় আকবরের বিবর্ণ মুখের উপর।

BanglaBook.org

চোখ দুটোর পর হাতটা বুলিয়ে দেয় মৃদু কোমল স্পর্শে। রক্তে ভেজা এলোমেলো জটবাঁধা চুলগুলো বিন্যস্ত করে। ক্ষিপ্র হাতে রুমাল ভিজিয়ে মুখটা মুছে দেয়। বুকের মাঝখানটায়, গলায়, ছিন্ন বাহুর গোড়ায়, বগলের নিচে পেঁজা পেঁজা রক্ত ধুয়ে মুছে সাফ করে। ঠোঁটগুলো তার কেঁপে কেঁপে ওঠে, চোখের মণি থেকে ঠিকরে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। আরও অনেকগুলো হাত কাজে লাগে। স্ট্রেচারে সাদা চাদর বিছিয়ে তুলে নেয় আকবরের মৃতদেহ।

রক্তে লাল জামাটা তুলে নেয় হালিমা। বুকপকেটের নীল টিকেটখানির উপর জমেছে পুরু এক ভাঁজ কালো রক্তের শক্ত প্রলেপ।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে আসে জামাল। হালিমার হাত থেকে আকবরের জামাটা তুলে বেঁধে নেয় একটি লাঠির আগায়। বলে, "ওঠো হালিমা, অনেকগুলো শোভাযাত্রা এসে মিশেছে চৌমাথায়। ওখানে যেতে হবে, সেখান থেকে শহরে। এখন তো বসে বসে অশ্রু বিসর্জনের সময় নেই। ওদিকে যে অনেক কাজ!" অন্তিম শয্যায় শায়িত আকবরের বিধ্বস্ত মাথাটির উপর একনজর চোখ বুলিয়ে হালিমা উঠে দাঁড়ায়। ঠোঁটগুলো তার কেঁপে কেঁপে ওঠে। চোখের মণি থেকে ঠিকরে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। লাঠির আগায় শহীদ আকবরের রক্তনিশান হাতে নিয়ে রাস্তায় নামে।

[বাজার-মোড়ে তখন ঘোষণা চলছে "শহীদের লাশ নিয়ে শোভাযাত্রা বের হবে আগামীকাল ভোর ছয়টায়। আপনারা দলে দলে যোগদান করুন।"]

মুন্না পলক ফেলতে-না-ফেলতেই কী যে ঘটে গেল, বুঝতেই পারল না। শুধু একটি বিকট শব্দ কানের পর্দা ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিল। আর পাশে তাকিয়ে নজরে পড়েছিল হাকিম ভায়ার মাথার খুলিটা, দুফাঁক হয়ে ডুবে আছে একরাশ রক্তের মধ্যে। দেহটা তখনও গড়াগড়ি দিচ্ছে রাস্তায়। আরকিছু দেখবার আগেই তার চোখ বুজে আসে। বিজলিবাতির তলায় হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুন্না ভাবে, কী হল? সে কোথায়? হাকিম ভায়ার কথা মনে পড়তেই মুন্নার মর্মের স্রোত ঠেলে ওঠে; হাকিম ভাই কি তা হলে মারাই গেল?

একটি কোমল হাতের মৃদু স্পর্শে চমকে উঠে চোখ মেলে মুন্না—এ কী সেই কেরানি সাহেব না? মাথায় হাতে ব্যান্ডেজ।

এখন কেমন লাগছে বাবা, মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞেস করেন কেরানি সাহেব।

দরদের স্পর্শ পেয়ে সশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে মুন্না। কেরানি সাহেবের হাত জড়িয়ে চেঁচিয়ে প্রশ্ন করে, হাকিম ভাইয়া কেমনে মরল কন-না সাব; হাকিম ভাইয়া কী কসুর করছিল?

কেঁদো না বাছা, কেঁদো না, তুমি বড্ড দুর্বল এখনও, কাঁদলে আবার অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

BanglaBook.org

হয়তো কাঁদার আর শক্তি নেই বলে, হয়তোবা কেরানি সাহেবের সান্ত্বনা শুনে মুন্না চুপ করে যায়। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, আর কী খবর? কন সাব হুনি।

খবর আর কী? অনেক মারা গেল, অনেক ধরা পড়ল, আর এই দেখছ না হাসপাতাল ভরে গিয়েছে সব জখমিতে। বাষ্পার্দ্র হয়ে ওঠে কেরানির কণ্ঠ। চোখের কোণে চিকচিক করে অশ্রুবিন্দু। একটু থেমে মুন্নাকে আদর করতে করতে বলেন, জান বাছা, হাকিম মিয়ার জন্য তোমার যেমন দুঃখ, আমার মনেও আজ গভীর জখম। আমার এক বন্ধুও মারা গেছে গুলি খেয়ে। একসাথেই আমরা কাজ করে আসছিলাম দশ বছর অবধি, পাশাপাশি টেবিলে।

সহানুভূতির চোখে মুন্না কেরানি সাহেবের দিকে তাকায়, নিজের হাতটা গুঁজে দেয় তাঁর কোলে, হঠাৎ আবার প্রশ্ন করে—আচ্ছা সাব মিছিলের কী ঐল কইলেন না যে?

মিছিল? অনেক হল থেকে মিছিল বেরিয়েছে, এখন মিছিল গিয়েছে শহরের ভেতর।

ঠিক আছে, গর্বিত কণ্ঠ মুন্নার। কচি মুখটি তার উদ্ভাসিত খুশির দীপ্তিতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

তিমির বলয়

খাসিয়া মেয়েগুলো কি আমার চেয়ে মিষ্টি? টিক টিক টিক।

খাসিয়া মেয়েগুলো কি আমার চেয়ে মিষ্টি? টিক টিক টিক।

এসব কী বলছ শিরি?

এত স্পষ্ট উচ্চারণ তবু অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে? বেশ আবার বলছি—খাসিয়া মেয়েগুলো কি আমার চেয়ে মিষ্টি?

মুখটা নাবিয়ে নেয় রাজিব।

টিক টিক টিক শব্দ নয় যেন বিদ্রূপ। রাজিবের মনে হল ঘড়িটাও বুঝি আজ কণ্ঠ মিলিয়েছে শিরির সাথে।

দুপক্ষই নীরব। নীরবতার ভারী পাথর হয়ে অতি ধীরে গড়িয়ে যায় কয়েকটি মুহূর্ত। অসহ্য এ-ভার। ঠোঁটজোড়া রাজিবের কেমন শুকনো অথচ সেঁটে রয়েছে একটার সাথে আর-একটা, কিছুতেই যেন আলগা হতে চাইছে না। তবে কি শিরিকে ভয় করতে শুরু করেছে ও? জিবের আগা টেনে ঠোঁট দুটো ভিজিয়ে নিল রাজিব আর মুখ না তুলেই চোখের কোণ দিয়ে একবার দেখে নিল শিরিকে।

বাদলার আগে ঝিম-ধরে-থাকা আকাশের মতো শিরির মুখখানি।

আমার প্রশ্নের উত্তর দাও। উত্তর চাই আমি।

বিচারকের আসন থেকে জবাব তলব করছে শিরি। শিরির কণ্ঠে ঘৃণা। শিরির স্বরে খোঁচা। সে-খোঁচায় মরা মানুষও বুঝি উঠে বসে।

আবারও ঠোঁট চাটল রাজিব। আর ঢোক গিলল।

যে পাপী এমনই নাকি তার অভিজ্ঞতা। পাপের মুহূর্তে পানি থাকে না, ঠোঁট যায় শুকিয়ে। জিবে থাকে না সামান্য একটু লালা। আর যে ভয় পায়, ভয়ের মুহূর্তেও নাকি এমনই হয়। গলা, জিব, ঠোঁট শুকিয়ে খটখট করে।

উত্তর দাও। আদেশ করছে শিরি।

BanglaBook.org

ঠোঁট চেটে ঢোক গিলে বুঝিবা একটু সাহস সঞ্চয় করেছে রাজিব। সিদা হয়ে বসল ও।...

শুনবেই?

হ্যাঁ।

বেশ শোনো তবে। খাসিয়া মেয়ে মিষ্টি নয় মোটেই। খাসিয়া মেয়ে কড়া হুইস্কির তীব্র উত্তেজনা; দেহের কোষে কোষে, মস্তিষ্কের ঝিল্লিতে উন্মত্ত শোণিতের তরঙ্গ খেলিয়া দেয় ওরা।

আর গারো, গারো মেয়েরা?

গারো মেয়ে? ওরা বেশ নাদুসনুদুস, মোটাসোটা, থলথলে। হাতে ধরে বড় আরাম।

যা হয় না কখনও তা-ই হয়েছে। রাজিব আজ চটেছে।

বুনো মেয়ে? ঐ চা-বাগানের কামিনগুলো?

ওরা বড় শক্তসমর্থ মেয়ে। ছুঁতেই মাখনের মতো গলে যায় না। বাধা দেয়। খামচায়। কামড়ায়। ওদের পরাভূত করে পৌরুষের আনন্দ। তা ছাড়া পৌরুষের ধকলটাও ওদের মতো এতক্ষণ ধরে অন্য কোনো জাতের মেয়ে সইতে পারে না।

ওদের মুখে বুঝি কিছুই আটকাবে না আজ, না রাজিবের, না শিরির।

আর পরের বউ? মিসেস কাদের? সে বুঝি ঝরনা জলে অবগাহন?

ও প্লি-ই-জ, প্লিজ। এত ভালগার এত স্থূল হতে পারো তুমি? জানতাম না কখনও। রাগের মাঝেও এতক্ষণ একটা বিদ্রূপ কৌতুকের স্বর ফুটিয়ে চলছিল রাজিব। কিন্তু সে-কৌতুকের স্বরটা বুঝি আর অক্ষুণ্ন রাখা গেল না।

আমিও জানতাম না তুমি চতুর হয়েছ, খল হয়েছ, মিথ্যুক হয়েছ স্ত্রীর প্রতি। মিথ্যুক রাস্কের স্কাউন্ড্রেল। নিজেকে সংযত করার এতটুকুও চেষ্টা নেই শিরির।

কী যা-তা বলছ শিরি? তুমি কি খেপলে?

খেপতে আর পারছি কই! খেপে গিয়ে একটা কিছু করে ফেলতে পারলে তো বেঁচেই যেতাম।

মাথার উপর শোঁ শোঁ করে ঘুরছে পাখাটা। ফরফর করে উড়ছে রাজিবের মাথার চুল আর নাইট শার্টের খোলা হাতা। তবু যেন ঘামছে রাজিব। উঠে গিয়ে পাখার স্পিডটা বাড়িয়ে দিল। বিছানায় না ফিরে পাখার তলায় কাউচটার ওপরই বসল রাজিব।

ইতস্তত চোখ দিয়ে দেখল শিরিকে।

খাটের মাথায় হেলান দিয়ে আধশোওয়া শিরি। রাগ ঘৃণা ক্রোধ—সবকিছু ছাপিয়ে ওর মুখে এখন কী এক কৃপার অভিব্যক্তি। একটি কৃপার হাসি অতি সূক্ষ্ম, অতি ক্ষীণ ধারার মতো কেঁপে কেঁপে চলেছে ওর ঠোঁটের কিনার ধরে। বুঝি নিজেকেই কৃপা করছে ও।

BanglaBook.org

হয়তো আদৌ কোনো আত্মকরুণার হাসি নয় ওটা। ওটা শিরির পরিচয়। একমাত্র শিরিই অমন করে হাসতে জানে।

ক্ষীণ ধারাটা হঠাৎ প্রশস্ত হয়ে এল। শব্দ করে হেসে উঠল শিরি। বলল বাহ্, কী চমৎকার আলাপ স্বামী-স্ত্রীর! স্বামীর মুখে লাম্পট্যের নির্লজ্জ স্বীকারোক্তি। মনোযোগ দিয়ে শুনছে স্ত্রী। এমন মধুর স্বামী স্ত্রীর কথন উপন্যাসেও বুঝি স্থান পায়নি এখনও। কী বল! শিরির হাসিটা যেন আজ বিষ। শিরির কথা যেন তীর। বিষমেশানো সেই তীরের খোঁচায় বুঝি ছটফটিয়ে কাত্‌রে যায় রাজিব। বলল রাজিব, তুমি এসব বিশ্বাস করলে শিরি?

আবার মিথ্যা বলছ, ধিক! শিরির চোখ এখন ইস্পাতের ফলা।

আমার চোখে চোখ রেখে বলো তো এসব সত্য নয়? বলো? বলো? খাট থেকে নেবে এল শিরি।

মুহূর্তে চিনা-জোকের মতো কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে এল রাজিব। এই স্বীকারোক্তির জন্য প্রস্তুত ছিল না ও। কত বড় আর কত জাঁদরেল অফিসার রাজিব হাসান। মুহূর্তের উত্তেজনায় এতবড় একটু ভুল করে বসল!

শিরির চোখে এখনও ইস্পাত জ্বলছে। সে-চোখে একবার ধাক্কা খেয়েই ফিরে এল রাজিবের চোখজোড়া। সিলিংয়ের দিকে মুখ তুলে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করল রাজিব। শোঁ শোঁ করে ঘুরছে পাখাটা। ঘূর্ণায়মান পাখাটার চারিদিকে বাতাস আর বিজলির আলো মিলিয়ে যেন সৃষ্টি করে রেখেছে অসংখ্য গোলক। আলো আর বাতাসের সূক্ষ্ম তরল গোলকরেখা। কী এক শক্তির জোরে সূক্ষ্ম এক-একটি রেখা যেন আপনার মাঝেই আবর্তিত হয়ে চলেছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে মনে হয় পাখাটা আদৌ ঘুরছে না। পাখাটা স্থির। ঘরের যত আলো আর বাতাস, তাই যেন গোল হয়ে অবিশ্রাম ঘুরে চলেছে পাখাটাকে কেন্দ্র করে। এমন সময় কিছুতেই বলা যায় না পাখাটার কয়টা ব্লেড। অনেকদিন রাজিব এই ঘূর্ণায়মান অবস্থায় ব্লেডগুলো গুনতে চেয়েছে। কিন্তু কিছুতেই যেন গোনা যায় না। আজও বুঝি বিজলি পাখার ব্লেডের সংখ্যাটা গুনে স্থির করতে চাইছে রাজিব।

পাশের ঘর থেকে বাবলুর কান্না শোনা গেল। তাড়াতাড়ি পা ফেলে শিরি চলে গেল ও-ঘরে। বাবলার পেচ্ছাবের সময় হয়েছে। আয়াটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। শিরি নিজেই বাবলুকে কট থেকে নাবিয়ে পেচ্ছাব করিয়ে শুইয়ে দিল। তারপর ফিরে এল।

শুয়ে পড়ে চোখ বুজেছে রাজিব। এখনও বুঝি গরম লাগছে ওর। তাই নাইট শার্টটা খুলে নিয়েছে।

ঠিক ঘৃণা নয়, ঘৃণার আগে যে-বিতৃষ্ণা সেই বিতৃষ্ণ-দৃষ্টি শিরির। রাজিবের খালি গা আর চোখবোজা মুখের উপর বিতৃষ্ণ-দৃষ্টি স্থির হয়ে থাকে অনেকক্ষণ।

মেদ-ফোলা বিশ্রী ওই কালো দেহটার দিকে তাকিয়ে শিরির গায়ের চামড়া বুঝি কুঁচকে আসে। খাট অবধি না গিয়ে পাখার নিচে রাজিবের পরিত্যাক্ত কাউচটার উপরেই বসে পড়ে শিরি। বুঝি দেহটার চেয়েও কুশ্রী রাজিবের মুখটা।

BanglaBook.org

বিয়ার আর মদ ছাপ ফেলেছে সেই ফোলা মুখে। নাকের ডগা আর চিবুকে লালচে আভা। কালো মুখে লালচে আভাটা কেমন কুৎসিত আর কদর্য রং নিয়েছে। দেহের অনুপাতে রাজিবের মুখটা যেন বেশি মাত্রায়ই ফুলেছে। ফুলে গোল হয়েছে, পুরু হয়েছে, আর হারিয়েছে সমস্ত আকর্ষণ। যেন আশ্চর্য হয় শিরি, কী কিম্ভূত চেহারা রাজিবের!

ভারী আর সমান হয়ে এসেছে রাজিবের নিশ্বাস। বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকটা ওর ধীরে ধীরে উঠছে, ধীরে ধীরে পড়ছে। কী বিশ্রী বুকটা রাজিবের! দুদিকের দুটো বুক যেন দুটো মাই হয়ে ঝুলে পড়বার অপেক্ষায় রয়েছে। পুরুষের বুক যদি দেখতে হয় মেয়েদের মতো সে কি কখনও সুখদৃশ্য হতে পারে?

এবার সত্যি সত্যি আশ্চর্য হয় শিরি, রাজিবের বুকটা যে অমন বিশ্রী সেটা এতদিন চোখেই পড়েনি ওর। একটিও লোম নেই রাজিবের বুকে। লোমশ বুক, লোমশ হাত কোনোদিনই সহ্য করতে পারত না শিরি। বড় ভাইয়ার বুকে ছিল লোমের জঙ্গল। সেই জঙ্গল উন্মুক্ত করে বড় ভাইয়া যদি কখনও খালিগা হত, চেঁচিয়ে উঠত শিরি—কী অসভ্য তুমি বড় ভাইয়া, শিগগির, শিগগির গেঞ্জি গায়ে দাও। গা আমার শিরশির করে। তাই বাসররাত্রে রাজিবের বুকটা নির্লোম দেখে আশ্বস্ত হয়েছিল শিরি। ভালো লাগত ওর মসৃণ বুকে গাল ঘষতে।

কিন্তু আজ ওই মোটা বিশ্রী দেহটার কোথাও কোনো শ্রী খুঁজে পায় না শিরি। যে-পুরুষের বুকে লোম নেই সে নাকি সিমার, সিমারের মতো নিষ্ঠুর, হৃদয়হীন। সিমারের বুকে লোম ছিল না।

ছোটবেলায় দাদিমার কাছে শোনা কাহিনি। কারবালার যুদ্ধ। নির্লোম বুক সিমারের খুনি হাত। দাদিমা আরও বলেছিল, বুকের লোম নাকি কোমলতার চিহ্ন, বুকে যাদের লোম হৃদয় তাদের কোমল। বুকভরা তাদের দয়া-প্রীতি ভালোবাসা। দাদিমার কথাগুলো আজ অদ্ভুতভাবেই সত্য বলে মনে হয় শিরির। একগাছি লোমও খুঁজে পাওয়া যায় না রাজিবের মেয়েলি বুকে। রাজিবের হৃদয়ে ভালোবাসা নেই, প্রীতি নেই। বুকভরা তার পশুর ইচ্ছা, পশুর কামনা।

ঘোঁ-অঁ-অঁ-ঘোঁৎ, বার দুই নাক ডাকল রাজিব। চমক খেয়ে নড়ে বসল শিরি। ওই নাকডাকা, এও দুঃসহ শিরির। যারা ঘুমোতে ঘুমোতে নাক ডাকে অথবা নাক ডাকতে ডাকতে ঘুমোয় ওদের অসভ্য এবং বুনো ছাড়া আর কিছুই মনে করে না শিরি।

অবশ্য রাজিবকে তেমন মনে হয়নি। রাজিবের নাক ডাকে কতদিন কাঁচা ঘুম ভেঙে গেছে শিরির। বিরক্ত হয়েছে শিরি। দুঃসহ মনে হয়নি কোনোদিন। কিন্তু আজ মনে হয়। মনে হয় ঘোঁ-অঁ-অঁ ঘোঁঅত্ ডাকের চোট খেয়ে মাথার খুলিটা বুঝি ফেটে যাবে, এদিক-ওদিক ছিটকে পড়বে মাথার মগজ। আর মনে হয় ঘরের দেয়ালগুলো যেন ফেটে পড়বে। মনে হয় মানুষ নয়, অতিকায় কোনো জন্তু অবিরাম ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চলেছে।

BanglaBook.org

কবেকার পত্রিকায় পড়া একটা আজব খবর মনে পড়ে গেল শিরির। আজব খবরের দেশ আমেরিকার ঘটনা ছিল সেটা। বউ ডিভোর্স চেয়ে কোর্টে মামলা করেছিল স্বামীর বিরুদ্ধে। বউটির অভিযোগ ছিল স্বামীর নাক ডাকা। নাক ডাকার চোটে কোনো রাতেই নাকি ঘুমোতে পারত না বউটি। খবরটা পড়ে সেদিন শিরি তো হেসে খুন। শিরির সাথে রাজিবও হেসেছিল। কিন্তু আজ সেই বউটির মতো করে যেন ভাবে শিরি। ভালগার ওর নাকডাকা। অসহ্য ওই ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ।

চিন্তাটাকে আর-একটু এগোতে দেবার আগেই রাজিবের মুখের উপর চোখ পড়ল শিরির। হাঁ করে আছে ওর মুখটা। শিরির মনে হল একটা ঘটোৎকচের মুখ, বাতাস গিলছে আর বাতাস ছাড়ছে। বোধ হয় নাকের বদলে গালের ভিতর দিয়ে পথ পাওয়ায় একটু মসৃণ হয়েছে বাতাসের গতিটা, একটু ধিমিয়ে এসেছে ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দটা। এখনকার আওয়াজটা অন্য ধরনের, হি-স-স্ খর-র-র্ খর্।

ঘোঁৎ ঘোঁৎ আর খর্ খর্ ঘড় ঘড় যা-ই হোক, আওয়াজটা আর সইতে পারছে না শিরি। কাউচ থেকে একটা বালিশ তুলে ছুড়ে মারল রাজিবের মুখটা তাক করে। বালিশের ঘা খেয়ে নড়েচড়ে শুল রাজিব, নাক ডাকাটাও থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য।

রাজিবের বাজুটা উঠে এসে শুয়ে পড়ল ওর মুখের ওপর। ওর মুখটা ঢাকা পড়ে গেল। শিরি যেন স্বস্তি পেল। শ্রী-হারা লাবণ্য-হারা নারী নির্যাতনের অজস্র কলঙ্ক-আঁকা ওই মুখটা চোখের সুমুখ থেকে সরে গেলেই যেন বেঁচে যায় শিরি। যতক্ষণ থাকবে চোখের সুমুখে ততক্ষণ ঘুরেফিরে ওই মুখটার ওপরেই যেন চোখ পড়ে যায়, না দেখে নিস্তার থাকে না। আর দেখার অর্থ নরকের যন্ত্রণা।

কিন্তু এমন তো ছিল না।

ওই শ্যামলা মুখখানির ওপর চোখ পড়ে থাকত শিরির। চোখ উঠে আসতে চাইত না। ঐ মুখে ছিল স্বর্গের ছবি, পৃথিবীর আনন্দ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই আনন্দচপল দিনগুলো। সন্দেহরা তখনও জন্ম নেয়নি মনে। কুটিল বেড়িতে বাঁধা পড়েনি জীবনের উদার অঙ্গন। দিনগুলো তখন সোনা-ছড়ানো। রাতগুলো তখন স্বপ্নে-মোড়া। হৃদয় জুড়ে তখন হাসির ঝরনা।

সবাই বলত শিরি বড় ভালো মেয়ে। কেননা সবার জন্যই ওর মুখে জেগে থাকত একটি হাসির অভ্যর্থনা। শিরি খুব হাসত। একলা একলা আনমনেও ও যেন হাসত। ভার্সিটির কোনো মেয়ে হাসতে পারত না ওর মতো।

সহপাঠিনীরা বলত, এত হাসিস কেন? যেন তৈরি করা জবাব শিরির, তক্ষুনি বেরিয়ে আসত, হাসির আবার কেন আছে নাকি? হাসি আসে, হাসি।

সহপাঠিনীরা আবারও শুধাত, কোথায় পাস, কোত্থেকে আসে তোর এত হাসি?

এবার আশ্চর্য হবার ভান করে চোখ কপালে তুলত শিরি। ওমা, কোথায় পাই মানে কী রে, হাসি কি খুঁজে পাবার জিনিস? ও তো ভেতর থেকে আপনিই উঠে আসে।

BanglaBook.org

কষ্ট করে, চেষ্টা করে কেউ হাসতে পারে না। প্রাণের উৎস থেকে আপনিই উঠে আসে হাসি। শিরির বুঝি রয়েছে সেই প্রাণের উৎস, অফুরন্ত উৎস। তাই ফুরোন নেই ওর মুখের হাসির।

চোখের দৃষ্টিতে সুন্দরী বলতে যা বোঝায় শিরি তা নয়। মাঝারি গড়ন, চিকন বরন শিরি। চওড়া কপালের নিচে ঢলঢল দুটো চোখ, মোটা নাক, অপেক্ষাকৃত পুরু ঠোঁট, গায়ের রংটা ওর বাংলাদেশে যাকে বলে উজ্জ্বল শ্যাম।

কিন্তু সৌন্দর্যের নিক্তিতে এতগুলো খুঁত যেন ওই এক হাসি দিয়েই পুষিয়ে নিয়েছে শিরি। হাসি শুধু ওর মুখে নয়, হাসি ওর সর্বাঙ্গ ঘিরে। তাই রূপবতী না হয়ে শিরি রূপময়ী, সুন্দরীর আকর্ষণ ওকে কেন্দ্র করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটখাটো একটি দল মেয়েদের, আসে, যায়, ক্লাস করে। কী এক সংকোচে কুণ্ঠিত জড়সড় ওরা, আড়ষ্ট ওদের পদক্ষেপ। এ-বিদ্যায়তন বুঝি ওদের আপন নয়, এখানে যেন অনধিকার প্রবেশ ওদের। অথবা অকস্মাৎ ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশি ছাত্রের মাঝখানে পড়ে অনভ্যস্ততার লজ্জায় ওরা সংকুচিত। কোনো মেয়ে-কলেজে অল্পসংখ্যক ছেলেকে ছেড়ে দিলে হয়তো এমনই দশা হত ছেলেগুলোর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেগুলোও যেন অতিমাত্রায় সচেতন এই একদঙ্গল মেয়ে সম্পর্কে, ওদের চেয়েও ওদের শাড়ি আর মেয়েলিত্ব সম্পর্কে বুঝি বেশি সজাগ ছেলেগুলো। হয়তো সে-কারণেই শামুকের মতো নিজেদের গুটিয়ে রাখে মেয়েগুলো।

কিন্তু ওই একদঙ্গল মেয়ের মাঝে শিরি যেন আলাদা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়টা এখনও ছেলেদেরই, মেয়েদের নয়—একথাটা মানতে রাজি নয় শিরি। সহজ অনাড়ষ্ট শিরির চলা, নিঃসঙ্কোচে ছেলেমেয়ে-নির্বিশেষে সকলের সাথেই ওর কথা বলা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডোরে শিরি যেন একটি নির্মল হাসির চঞ্চল তরঙ্গের মতো ছুটে বেড়ায়।

মেয়েগুলো হাঁটে কেমন চুপিচুপি পায়ে, কচ্ছপের মতো। শিরি হাঁটে দৌড়ে দৌড়ে, আওয়াজ তুলে। মেয়ের দল চলে দেয়াল ঘেঁষে ছেলেদের ছোঁয়া বাঁচিয়ে। শিরি চলে করিডোরের মাঝপথ ধরে। বাতাস নাচিয়ে। আঁচল উড়িয়ে। ছেলেরা সরে যায়, পথ করে দেয় ওকে।

অল্পদিনের মধ্যেই ফার্স্ট ইয়ার ইংলিশ অনার্সের শিরিন আখতারকে চিনে ফেলল সবাই, যারা বিদ্যা নেয়, যারা বিদ্যা দেয় তারাও। আরও জানল গালভরা হাসি শিরিন আখতারের ডাকনাম শিরি। বাপ তার দীর্ঘকাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের সিঁড়ি ডিঙিয়ে সেক্রেটারিয়েটের সেরা কুর্সির কাছাকাছি এক কুর্সিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

হেঁটে হেঁটে দৌড়ে চলা শিরিন আখতারের দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায় প্রবীণ শিক্ষক। বলে, হয় উগ্র আধুনিকা নয়তো ফাজিল।

BanglaBook.org

তরুণ অধ্যাপকের মনের রস এখনও টইটম্বুর, তারা চকিত দৃষ্টি বুলিয়ে এনে বলে, চমৎকার স্মার্ট মেয়ে শিরিন আখতার।

আর ফার্স্ট ইয়ারের ইংলিশ অনার্সের ছেলেগুলো জানে ১৪ রোল নম্বরের মেয়েটি যেমন হাসি হাসে তেমনই কনুইর ঘায়ে বেজায় জোর তার। কোনদিন কোন ফাজিল ছোকরা কড়িডোরের মাঝামাঝি শিরির পথটার ওপর দাঁড়িয়েছিল। শিরি নাকি তাকে কনুইর গুঁতোয় সরিয়ে দিয়েছিল একপাশে। এর পর থেকে অতি বড় ফাজিল ছোকরাও ঘাঁটাতে সাহস পায়নি শিরিকে।

সেই মেয়েগুলো যারা এই পুরুষদের জগতে আপন নারী-অস্তিত্ব নিয়ে তটস্থ সংকুচিত একদিন তাদের একটা দল জটলা পাকিয়ে বসল গবেষণায়।

গবেষণা শেষ করে ওরা ছেঁকে ধরল শিরিকে, বলল—বুঝেছি।

কী বুঝেছ? শিরি হাসল।

তুমি প্রেমে পড়েছ। প্রেমে পড়েছ বলেই অমন করে হাস তুমি। অমন বেপরোয়া। ওরা বলল।

আবারও হাসল শিরি। বলল না কিছুই।

কিন্তু শিরি কি জানত সত্যি সত্যি একদিন প্রেমে পড়ে যাবে ও? আর কেমন হাসতে হাসতে!

মেয়ে-কমনরুমের ঐ গবেষণার দিন দশ কি বারো পর।

বিদ্যায়তন থেকে নেবে বড় গেইটার দিকে যাচ্ছে শিরি। আমতলায় ছেলেদের সেই নিত্যকার জটলা। শিরিকে দেখ গণ্ডাখানেক ছেলে উঠে এল। বলল—মিস আখতার, কিছু কথা ছিল আপনার সাথে।

বলুন। শিরির মুখে সেই অকারণ হাসি।

জানেন তো হল ইউনিয়নে নির্বাচনের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু আপনার সাহায্য চাই।

বেশ।

আমরা হলাম প্রগতিদল। ছেলেরা বলল।

বেশ। চলবার জন্য পা তুলল শিরি।

তা হলে আপনি কথা দিচ্ছেন?

বেশ। আবারও বলল শিরি।

এই যে ইনি হচ্ছেন আমাদের ইয়ারের সেরা ছাত্র; প্রগতি দলের অন্যতম ক্যানডিডেট।

ছেলেটি আদাব দিল।

শিরি চেয়ে দেখল, কাঁচা মুখ সেই শ্যামলা ছেলেটি। ক্লাসের প্রথম দিন এই মুখটার দিকেই তো একবার চেয়ে দ্বিতীয়বার দেখবার লোভটা সামলাতে পারেনি শিরি।

মুখ টিপে হাসল শিরি। প্রতি-আদাব দিয়ে বলল—আচ্ছা।

BanglaBook.org

তারপর গেইট পেরিয়ে রাস্তায় এসে রিকশায় চাপল শিরি। রিকশায় চেপে বেদম হাসিতে ফেটে পড়ল।

এমনিতেই হাসি পায় শিরির। তার ওপর ছেলেটির লজ্জা দেখে হাসিতে ওর দম ফাটার উপক্রম। অনেক কষ্টে গেইট অবধি চেপে রেখেছিল হাসিটা। বাব্বা পুরুষমানুষও লাজুক হয়? শিরিকে আদাব দিতে গিয়ে কী কাণ্ডটাই-না করল ছেলেটি—ঠোঁট কাঁপল, মুখ কান লাল হল, চোখজোড়া যেন তীর খেয়ে পালিয়ে গেল মাটির দিকে।

সব ভালো ছেলেরই বুঝি এই দশা, স্মার্ট হতে পারে না; চটপটে হতে পারে না। মেয়ে দেখলে যেন ভূত দেখল তেমনি ঠকঠক করে কাঁপে। রিকশাওয়ালাকে অবাক করে দিয়ে আরেক প্রস্থ হাসল শিরি। কিন্তু ছেলেটার মুখখানি যেন শিরির পাশে রিকশায় বসে দৌড়ে চলেছে। কী যেন আছে ছেলেটার মুখে যা অন্য কারো মুখে নেই। প্রথম দিনই নজরে পড়েছিল শিরির।

ওয়ান টু থ্রি, রোলকল করে চলেছেন প্রফেসর সাহেব। যার যে নম্বর উঠে দাঁড়িয়ে সাড়া দিচ্ছে। প্রথম ক্লাস বলে সবারই সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিচ্ছেন অধ্যাপক।

নাম্বার ফাইভ। অধ্যাপকের ডাকের সাথে সাথেই উঠে দাঁড়াল ছেলেটা।

ফার্স্ট বয়? অধ্যাপক শুধালেন।

হ্যাঁ, ফার্স্ট বয়ই বটে। আর ফার্স্ট হয়েছে বলে ছেলেটার যেন কত লজ্জা।

ক্লাসসুদ্ধ চোখ ছেলেটার দিকে।

শিরিরও।

ছেলেটা বসে পড়ল।

শিরি যেন চুরি করে দেখে নিল আরেকবার। দুহাতে তুলে নেয়া যায়, বুকের ওপর রেখে আদর করা যায় তেমনই একখানি মুখ ছেলেটার।

সেই দেখেছিল, আর আজ দেখল শিরি। সেদিন যা ভেবেছিল আজ রিকশায় বসে বসে সেকথাটাই বুঝি ভাবল শিরি। শ্যামল কাঁচা ওই মুখখানাকে আপনার বলে চিন্তা করতে কী এক আনন্দ যেন!

পরদিন ভার্সিটিতে এসে সে-মুখখানাকেই যেন খুঁজল শিরি। কাছাকাছি পেতে পেতে ফোর্থ পিরিয়ডটা কেটে গেল। করিডোরেই দেখা।

শুনছেন? ডাকল শিরি।

ছেলেটা যেন শুনল না।

রোল নাম্বার ফাইভ, শুনছেন?

এবার বঝি শুনল ছেলেটা। দাঁড়িয়ে পড়ল।

কিন্তু চোখ তার মেঝের দিকে।

কাছে এসে বলল শিরি, কই, আর যে পাত্তা নেই আপনাদের?

বহুবচনের কথা। হয়তো তাই জবাব দেবার কোনো প্রয়োজন বোধ করল না ছেলেটা। অথবা লজ্জায় কথা ফুটল না মুখে।

BanglaBook.org

এত লজ্জা নিয়ে আপনি ইলেকশনে দাঁড়িয়েছেন! শিরির মুখে সেই অকারণ হাসি। কিন্তু রোল নাম্বার ফাইভ লজ্জায় লাল। কোনোরকমে বলল, ওরা শিগ্‌গিরই দেখা করবে আপনার সাথে।

ওরা, কেন আপনি যাবেন না দেখা করতে?

ছেলেটা লজ্জায় লুকোবার জায়গা পায় না বুঝি।

হোস্টেলে থাকেন বুঝি? সহসা ব্যক্তিগত প্রসঙ্গে এসে পড়ল শিরি।

জি। ছোট্ট করে বলল ছেলেটা।

রাজধানীতে বুঝি এই প্রথম?

জি।

আমার সঙ্গে রাস্তা অবধি অনায়াসেই হাঁটতে পারেন।

বুঝতে না পেরে শিরির মুখের দিকে তাকাল ছেলেটা। উত্তরে শিরি আগে বাড়ল। ছেলেটা চলল পাশে পাশে।

দূরত্ব রেখে একান্ত অনুগতের মতো।

রাস্তায় এসে দুমুখো হবার আগে শিরি বলল, অমন মুখচোরা হলে কিন্তু ইলেকশনে হারবেন আপনি।

এতে বুঝি একমত ছেলেটা। ছেলেটা হাসল মুখ নাবিয়ে। শিরিও। শিরির ভালো লাগল। কাঁচা মুখের সারল্যমাখা ওই হাসিটুকু। এ-মুখ বুঝি ভুলবার নয়। এ-মুখ গেঁথে গেল শিরির বুকের কোমলতায়।

কিন্তু কখন, কেমন করে হারিয়ে গেল সে-মুখ। শিরি যেন অবাক হয়।

ইস্, আবার নাক ডাকতে শুরু করেছে রাজিব। শিরি উঠে এসে ওর মাথার তলা থেকে বালিশটা সরিয়ে নিল।

তারপর সোফায় ফিরে এসে চোখ বুজল।

ওদের দেয়ালঘড়িটা তখন টিং টিং করে বেজে উঠেছে এক-দুই-তিন-চার।

BanglaBook.org

২

তিনটের ফাংশটনার কথা খেয়াল আছে তো? শেভ করতে করতে শুধাল রাজিব।

ফাংশন, ও হ্যাঁ। মনে পড়ল শিরির। আজ তিনটেয় কিরণময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের বার্ষিক উৎসব।

আমাকে কি যেতেই হবে, না গেলে চলে না? শুধু গতরাতের নয়, যেন অনেক রাতের অনিদ্রার ক্লান্তি শিরির স্বরে।

শিরির মুখের ওপর চোখটা একবার বুলিয়ে এনে শেভটা শেষ করল রাজিব। সাদা তোয়ালে ঘষে মুখ থেকে মুছে নিল সাবানের অবশিষ্ট ফেনা। আস্তে আস্তে চামড়া রগড়ে রগড়ে লোশন মাখল মুখে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর শুধাল শিরির দিকে চেয়ে, অসুখ করেছে? শরীর খারাপ?

না এমনি। আমার ভালো লাগে না।

ভালো লাগে না? আঙুলে লেগে-থাকা লোশনের গন্ধটা নাকে টানতে টানতে শিরির কথাটাকে প্রশ্ন করে শুধায় রাজিব। আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে বলল আবার, কেমন রোগা-রোগা হয়ে গেছ তুমি। একটা টনিক খাও।

না, দরকার নেই। দুদিন ভালো করে ঘুমুলেই ঠিক হয়ে যাবে।

ঘুমোও না কেন? প্রশ্নটা করে যেন অপ্রস্তুত হল রাজিব।

ড্রয়ারটা খুলে ঘাড় নিচু করে ব্যস্ত হয়ে পড়ল শিরি। কী যেন খুঁজছে ও। নিষ্প্রভ ত্বক সরু সরু দুখানি হাত শিরির। পলকা কাঠির মতো ঘাড়। আপন বৈপরীত্বের ঐ ছবিটার ওপর থেকে চোখ তুলে নিজের দিকেই মনোযোগ দিল রাজিব। মাংসের পুরু পর্দায় ঢাকা পড়েছে ওর পেশিগুলো, ঘাড়ের ওপর জমেছে এক ঢেউ মাংস। নাভির ওপর দুভাঁজ চর্বি। বেশ মুটিয়েছে রাজিব। কিন্তু ওই ঈষৎ ফোলা আর গোলমতো হয়ে সামান্য ঝুলে-থাকা বুকের পেশিগুলো ছাড়া আর কোথাও ঢিলেমির লক্ষণ নেই রাজিবের শরীরে। স্বাস্থ্যে শক্তিতে ভরপুর ওর দেহখানি। অফুরান এই শক্তি ওর রক্তে টগবগ করে যায় যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণ।

আয়নায় আপন প্রতিবিম্বটাকে তৃপ্তিভরে দেখল রাজিব। মাথাটাকে পেছন দিকে ফেলে, বুকটাকে টান করে, দুখানি হাত উঁচুতে ছুড়ে মারে, দুপাশে প্রসারিত করে মাংসথলথল শরীরের শক্তি আর চাহিদাটাকে যেন অনুভব করল রাজিব। লম্বা একটা নিশ্বাস টেনে অনেকক্ষণ ধরে রাখল, যেন পরখ করে দেখল ফুসফুসের শক্তিটা। ফো-স-স করে ছেড়ে দিল নিশ্বাসটা, আয়নায় দেখা শিরির ঝুঁকে-থাকা মাথাটাকে লক্ষ্য করে বলল, ডা. বোসকে টেলিফোন করে দিচ্ছি। এলে কিন্তু আবার ভালো আছ বলে বিদেয় করে দিও না।

শিরি উঠে গেল খাবার ঘরের দিকে। রাজিব গেল বাথরুমে। গতরাতের প্রসঙ্গটা উঠল না বলে দুজনাই বুঝি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

পুরস্কার বিতরণ করবে তুমি। নিমন্ত্রণপত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ রয়েছে সেটা। এমতাবস্থায় তোমার না যাওয়াটা কি উচিত হবে? নাস্তার টেবিলে বসে আবার কথাটা পাড়ল রাজিব।

শিরির সুমুখে প্লেটে একখানা টোস্ট আর-একটা পোচ-করা ডিম। চামচ দিয়ে ডিমের সাদা অংশটুকু কেটে কেটে আলগা করে নিচ্ছে শিরি। মুখ না তুলেই বলল, সে আর এমন কী কথা?

হাকিম সাহেবকে খুশি করার জন্যেই তার বউকে একটু সম্মান দেওয়া, বউকেও খুশি করা।

তা বউ যদি না গেলেই খুশি হয়?

না গেলেই কি খুশি হও তুমি? বুঝি একটুবা ক্ষুণ্ন চোখে জবাবটার জন্যে নিঃশব্দে অপেক্ষা করল রাজিব। তারপর কাঁটাচামচের শব্দ তুলে মন দিল নাস্তায়।

BanglaBook.org

ডিমের আলগা করে নেয়া সাদাটা ফেলে দিল শিরি। তারপর হলদেটাকে চামচের আগায় করে তুলে নিল টোস্টের ওপর। টোস্টের আগায় কামড় বসিয়ে বুঝি রাজিবের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার কথাটা মনে পড়ল ওর। বলল—হুঁ!

কিসের হুঁ, সেটা হয়তো ইচ্ছা করেই খেয়াল করল না অথবা শুনল না রাজিব। একমনে খেয়ে চলেছে ও। সুমুখে ওর নাস্তার স্তূপ।

আট ছটাক দুধের ভেতর আধা ছটাক কর্নফ্লেবাস্। দুটো কোয়ার্টার বয়েল ডিম। ফ্রিজে রেখে দেয়া গতরাতের একটা মুরগির ঠ্যাং, মাখনমাখা দুখানি টোস্ট। একটা কলা।

খাবার সময় খাবারের ওপর অখণ্ড মনোযোগ রাজিবের। খাওয়ার সময় পাঁচটা দিকের পাঁচটা কথায় মন দিয়ে খাওয়ার আনন্দটাকে ক্ষুণ্ন করে না ও। একমনে খাবারগুলো শেষ করে চায়ের পেয়ালাটা টেনে নিল রাজিব। শিরির দিকে তাকিয়ে তুলতে চাইল একটু হালকা সুর। বলল, খেদ করে কী হবে। পতির পদমর্যাদায় পত্নীর গুরুত্ব। এই তো নিয়ম এদেশে।

সেই একখানি টোস্ট এতক্ষণে শেষ হল শিরির। পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে বলল, স্বামীর নোকরি দিয়ে মর্যাদাময়ী নাইবা হলাম।

হয়ে যে গেছে এখন না বললে চলবে কেন। লোকেই-বা ছাড়বে কেন। বলতে বলতে একটু হাসল রাজিব। হালকা সুরের বাতাস তুলতে চাইল।

লোক বোলো না, বলো উমেদার। বুঝি শুধরে দিল শিরি।

ওই একই কথা।

মোটেই এক কথা নয়। স্বরে যেন অতিরিক্ত জোর পড়ল শিরির।

হালকা সুরের বাতাস ওঠাতে পারল না রাজিব। পরপর দুকাপ চা খেয়ে উঠে পড়ল ও। টাইয়ের নটটা একটু টাইট করে বলল, তুমি রেডি হয়েই থেকো। আমি ঠিক লাঞ্চ টাইমে ফিরব। লাঞ্চ সেরে একটু বিশ্রাম করে রওনা দেব।

সম্মতি বা অসম্মতি কোনো উত্তরই ফুটে উঠল না শিরির নীরব মুখে। রাজিব অপেক্ষা করল না জবাবের জন্যে., হয়তো তার প্রয়োজন পড়ে না। আগেও কখনও প্রয়োজন পড়েনি, এখনও নয়। রাজিব গিয়ে গাড়িতে উঠল।

রাজিব চলে গেলেও একলা টেবিলে বসে রইল শিরি। চাটা জুড়িয়ে পানি হয়েছে। হাত দিয়ে পোয়ালাটা একবার অনুভব করে আর-এক কাপ চা ঢেলে নিল শিরি। কিন্তু সে-ও তেতো আর ঠাণ্ডা। এক চুমুক দিয়েই সরিয়ে রাখল কাপটা। একলা হয়ে গত রাতটার কথাই মনে পড়ছে। কথাগুলো মনে-মনে পুনরাবৃত্তি করে, কানটা ওর গরম হয়ে উঠছে। কেমন স্থূল কুৎসিত মনে হয় সেসব কথা। মনে হয় না তারই মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়েছে অতগুলো স্থূলতা।

আসলে গতকালকের রাতটা ব্যতিক্রম। সবকিছু জেনেও রাজিবের সাথে খোলাখুলি আলোচনাটা করতে ওর রুচিতে বেধেছে। আর-আর সব বউদের মতোই সমস্ত ব্যাপারটা নিজের কাছে এবং অন্যদের কাছেও চেপে যেতে চেয়েছে

BanglaBook.org

শিরি। কিন্তু গেল রাতে কী যেন হয়ে গেল, নিজেকে আর চেপে রাখতে পারেনি শিরি।

মেমসাব, বাজার নেহি হোগা? আরদালির ডাকে বুঝি চমক ভাঙল শিরির। উঠে গিয়ে তাড়াতাড়ি বাজারের একটা ফর্দ করে নিল। ফর্দ আর টাকাটা তুলে দিল আরদালির হাতে।

আয়া এসে খবর দিল, বাবলুর গাটা যেন একটু গরম। মুহূর্তের জন্যে বুকটা বুঝি ধড়ফড়িয়ে যায় শিরির। বাবলুর ঘরের দিকে চলতে চলতে মনে হয় ওর, ভাবনার পরিমণ্ডল থেকে বাবলু যেন ক্রমশই দূরে সরে যাচ্ছে। সেই রাত্রে একবার দেখে গেছিল। তারপর সকাল হয়েছে, নাস্তা সারার পর বাবলুর কথাটা মনেই হয়নি। নিজেকে শাসিয়ে নিল শিরি, বড় অবহেলা হচ্ছে বাবলুর প্রতি, এমন অবহেলা অন্যায়।

গা-টা ঠাণ্ডাই মনে হল। তবু নিশ্চিন্ত হবার জন্যেই থার্মোমিটারটা ওর বগলে দিয়ে দেখল শিরি। না, জ্বর নেই। এমনিতেই হাত আর কপালের দিকটা একটু গরম। তবু আয়াটাকে বকল শিরি; কেননা বকতে হয়। তা ছাড়া গতরাতে যে পেচ্ছাব করিয়ে শোওয়ায়নি বাবলুকে; বাবলু ঘুম ভেঙে কেঁদেছে। এ-কারণে ডবল বকুনি পাওনা আয়ার। বকুনি শেষ করে বাবলুকে কোলে নিল শিরি, চুমো খেল, ফিরিয়ে দিল আয়ার কোলে। তারপর চলে গেল রান্নাঘরে। রান্নাঘরে শিরির করার কিছু না থাকলেও সামলাবার রয়েছে অনেক কিছু। সামলাতে হয় বয় আবদুল আর বাবুর্চি মকবুলের নিত্যকার রেষারেষি। প্রায় প্রতি হপ্তাঅন্তেই ওদের মারামারি, দক্ষযজ্ঞ।

রান্নাঘরে মকবুলকে একলা দেখে বুঝি আশ্বস্ত হল শিরি। পেঁয়াজ ছিলছে মবকুল, কিন্তু শিরিকে দেখেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। বলল, ওই ছিঁচকে চোরটা থাকবে নয়তো আমি থাকব।

কেন, আজ আবার কী হল?

না মেমসাব, না আমায় বিদায় দিয়ে দিন। বুঝি আখেরি ফয়সালা করে নিয়েছে মকবুল।

আহা, কী হয়েছে বলো-না! দুজনের থাকবার জায়গার তো অভাব পড়েনি। শিরির স্বরে এবার কর্ত্রীর উষ্মা।

ছিঁচকে বদমাশ আমার নাস্তাটা খেয়ে ফেলেছে।

খেয়ে ফেলেছে? তুমি কী করছিলে?

আমি লাকড়ি-ঘরে লাকড়ি আনতে গেছলাম। এই ফাঁকে নিজেরটা আর আমারটা দুভাগই খেয়ে সট্‌কে পড়েছে বদমাশ।

মকবুলের স্বরে ক্ষোভ। মুখে অসহায়তার ভঙ্গি। ওর কথায় অসহায়তার ছবি আঁকা, ওর মুখটির দিকে তাকিয়ে হেসে দেয় শিরি। সেই গতরাতের পর এই এতক্ষণ একটু হাসতে পেরে যেন বড়রকমের তৃপ্তি পেল ও।

BanglaBook.org

কিন্তু মকবুলের পছন্দ নয় এটা। মকবুল বলল, এর পর ও যদি আসে পাকঘরে, আমি ওর কল্লাটা কেটে রেখে দেব।

না না, কল্লা কাটাকাটি কোরো না। ওরকম নিষ্ঠুর বিচার রাজা-বাদশারাও করে না আজকাল। হাসতে হাসতেই বলল শিরি। তারপর আশ্বস্ত করল মকবুলকে। চুরি করেছে? আমি তাকে ঠিক করে দেব, তুমি ভেবো না।

চুরি?—চুরি শব্দটা প্রয়োগ করে আবদুলের অপরাধকে যেন লঘু এবং উপেক্ষণীয় করে তুলছে মেমসাব। পাকঘরের দেয়ালটার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল মকবুল, এটা চুরি হল নাকি। এটা ওর বদমাশি।

আচ্ছা বদমাশি, তার সাজা ওকে দেব আমি। তুমি পাউরুটি দিয়ে আপাতত নাস্তা সেরে নাও। মকবুলকে নিশ্চিন্ত করে লাঞ্চের আর রাতের মেনুগুলো ওকে বুঝিয়ে দিল শিরি। তারপর চলে এল ঘরের ভেতর।

ঘরে অনেক কাজ শিরির। বাবলুর বিছানাপত্র রোদে দেওয়ানো, ওর খাবার সরঞ্জামগুলো পরিষ্কার করানো, ময়লা জামা-চাদর ধুতে বলা। এ-কাজগুলো আয়ার উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে না সে।

বাবলুর কাজ সেরে শিরি মন দিল ঘরের কাজে। রাজিবের ময়লা শার্ট আর প্যান্টের পকেটগুলো টিপে টিপে দেখতে হবে। পাছে কোনো দরকারি কাগজ থেকে যায় পকেটে। সমস্ত শাড়িকাপড় জড়ো করে পাঠাতে হবে লন্ড্রিতে। আজ আবার মাস শেষ—হকার, গোয়ালা, মুদি সবার হিসেব শেষ করে রাখতে হবে। একটু বাদেই ফিরে আসবে আরদালি, তার কাছ থেকে ফর্দ মিলিয়ে বাজারটা বুঝে নিতে হবে। দামগুলো দিতে হবে। গত পাঁচ বছর ধরে রোজকার এই ছক-বাঁধা কাজ শিরির। বাবলু ভূমিষ্ঠ হবার আগে ও পরে কয়েকটা দিন বাদ দিয়ে কখনও বিরতি পড়েনি এই নিত্যকার রুটিনে। আজও বিরতি পড়ল না।

কাজকর্মগুলো শেষ করে গোসল সারল শিরি। গোসল সেরে ঘরে এসে দেখল নাঈমা বসে রয়েছে বিছানায়।

শিরির ছোট বোন মিনার সহপাঠী নাঈমা।

স্থানীয় সরকারি কলেজের ইংরাজির অধ্যাপক ওর স্বামী। মাস কয়েক হল এখানে বদলি হয়ে এসেছে। পুরানো পরিচয়ের সূত্রে নাঈমা যখন খুশি এসে পড়ে শিরিদের বাংলোয় আপন লোকের মতো। জিলায় সরকার বলতে যে-লোকটিকে বোঝায়, তাঁর এ-সরকারি কুটির কায়দা-কানুন, অ্যাটিকেট বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি নাঈমার সমুখে। তবু এই দুপুরবেলায় নাঈমা কখনও আসে না। হয়তো তাই চুলে চিরুনি টানতে টানতে শুধাল শিরি, কীরে নাঈমা, এমন অসময়ে?

ওমা, তোমার বাসায় আসব তার আবার সময়-অসময় আছে নাকি! কেমন আদুরে আর আবদারে সুর নাঈমার।

নাঈমার আদুরে সুরে আত্মীয়তার পরশ, এই কুঠিবাড়িতে যা অনুপস্থিত। নাঈমার আবদেরে কথাগুলো বুঝি ভালো লাগল শিরির। ওর দিকে তাকিয়ে নরম করে একটু হাসল শিরি।

BanglaBook.org

নাঈমা ততক্ষণে মুখ খুলেছে আবার। বেশ তো, তুমি যদি বল এবার থেকে অফিসিয়াল কায়দায় ঘড়ি ধরে ভিজিটার্স আওয়ারে নাহয় দেখা করতে আসব।

না, তা নয়। বলছিলাম এই অসময়ে খাওয়াদাওয়ার পাট না সেরেই চলে এসেছিস নিশ্চয়। খুব জরুরি কিছু নাকি?

ওমা, খাওয়াদাওয়ার পাট তো এগারোটাতেই শেষ। আমরা তো আর লাঞ্চ খাই না। এগারোটার আগেই নাকেমুখে গুঁজে প্রফেসর ছোটে কলেজে। তারপর গিন্নি বেরোয় পাড়া বেড়াতে। বলেই খিলখিলিয়ে হাসে নাঈমা।

নাঈমার হাসি থেকে শিরি বুঝি একটুখানি হাসি কুড়িয়ে নেবার চেষ্টা করল। কিন্তু ব্যর্থ সেই চেষ্টায় শুধুই বিব্রত হল। বলল, অমন খোঁচা দিয়ে কথা বলতে শিখলি কবে রে?

উত্তরে কী যেন বলল নাঈমা। কিন্তু ততক্ষণে দরজার কাছ থেকে ভেসে আসছে আবদুলের গলা—মা এস. ডি. ও. এসেছে।

দুজনাই, শুধাল শিরি।

নর্থ-সাউথ দুজনেই। পর্দাটা সরিয়ে মুখটা এবার ভেতরে আনল আবদুল। এস. ডি. ও.-দের প্রতি খুব যে শ্রদ্ধাশীল নয় আবদুল, সেটা স্পষ্ট ওর বলার ধরনে। কিন্তু এস. ডি. ও.-দের আগমন সে-সুযোগটাই করে দিয়েছে ওকে, যা সেই নাস্তা খাওয়ার পর থেকে খুঁজে ফিরছে ও।

কিন্তু শিরি বুঝি অত সহজে ভোলে না, অত সহজে ক্ষমা করে দেয় না কাউকে। আবদুলের মুখটা ভেতরে আসতেই হাতটা বাড়িয়ে ওর চুলের ঝুঁটিটা ধরে ফেলল শিরি। ঝুঁটি ধরে টেনে আনল ঘরের ভেতর।

সন্দ্বীপের চোদ্দ বছরের কিশোর আবদুল শিরির শাসনকে বুঝি মায়ের শাসনের মতো মাথা নিচু করে গ্রহণ করে প্রতিবার। কিন্তু আজ কেমন ত্যাড়া ভাব ওর। চুলসুদ্ধ মাথাটা সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে দিয়েও শরীরটাকে কেমন কঠিন করে রেখেছে ও।

ও কেন আমাকে কম দেয়?

কম দেয়!

রোজ রোজ কম দেয়,—তা আজ ওরটাও খেয়ে নিয়েছি।

খেয়ে নিয়েছি! শিরি মুখ ভেংচিয়ে বাঁ হাতে দুটো থাপ্পড় বসিয়ে দিল ওর গালে।

এমন অবস্থায় আবদুলের চোখ দিয়ে পানি আসে। আজ পানি এল না। থাপ্পড়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়ে বলল, ওঃ, ওই শা-কে দায়ের কোপে দুখান করে ফেলব আমি।

আবার মুখ-খারাপ করা হচ্ছে। চট-টাস্—আবদুল কোনোকিছু বুঝবার আগেই চড়টা ওর গালের ওপর দাগ কেটে বসে গেল। দুটো পানির বিন্দু এতক্ষণে চিকচিক করে উঠল ওর চোখের কোণে।

BanglaBook.org

ও কেন আমার পকেট মেরেছে? হাতের পিঠে নাকের ডগাটা মুছতে মুছতে দুনম্বর অভিযোগটা পেশ করল আবদুল।

পকেট মেরেছে, কবে?

কাল রাতে। ও শালা চোর।

আবার! এবার আবদুলের কানটা আচ্ছা করে মুচড়ে দিল শিরি। পকেট মেরেছে, বেশ করেছে।

আমিও খেয়েছি, বেশ করেছি। রোজ রোজ খাব। আবদুল মাছের মতো মাথাটা গলিয়ে চলে গেল পর্দার বাইরে।

নাঈমা এতক্ষণ বসে বসে দেখছিল। ব্যাপারটা ওর কাছে একেবারেই অচিন্তনীয়। নাঈমা বলল, চাকর মার তুমি, শিরি আপা!

আর বলিস না, বজ্জাতের হাঁড়ি এ-ছোকরাটা। না মারলে সজুত হয় না মোটেই। নিচের ঠোঁটটাকে বেঁকিয়ে মুখে বিরক্তি ফোটাল শিরি।

কেমন যেন হয়ে গেছে শিরি। একটুতেই যেন খিটিয়ে যায় মেজাজটা আর হাত চলে।

এমন কখনও ছিল না শিরি। স্বভাবের এ-পরিবর্তনটা কখন থেকে শুরু হয়েছে, এ জিলা হাকিমের কুঠিতে অথবা বছর তিন আগে কোনো মহকুমা শহরে ঠিক ধরতে পারে না শিরি। ধীরে ধীরে অলক্ষে আরও অনকে কিছুর মতো এ-পরিবর্তনটাও এসে গেছে ওর জীবনে। সবচেয়ে আশ্চর্য এ-পরিবর্তিত স্বভাবটা নিজেরই কেমন অচেনা মনে হয় ওর।

কেন এসেছিস বললি না তো? মুখের বিরক্তিটাকে সরিয়ে দিয়ে সহজ হল শিরি।

কিন্তু নাঈমার কৌতূহল অন্যদিকে। বলছি বলেও ও কিছু বলল না। পর্দাটা সরিয়ে বারান্দার ওপারে ড্রয়িংরুমের পর্দার ফাঁকে কী যেন দেখল। আশ্চর্য হয়েই বলল, হায় হায়, এই বুঝি তোমার এস. ডি. ও. সাহেবরা! আমি আরও কত কী ভেবে চলেছি এতক্ষণ।

কী ভাবছিলি? শুধাল শিরি।

ভাবছিলাম এস. ডি. ও. সাহেবরা এই ভরদুপুরে এজলাস সেরে তোমার বৈঠকখানায় হানা দিল কেন? বলতে বলতে হাসে নাঈমা। শিরিও হাসে।

আবদুলের কথা শুনে অনেকেই নাঈমার মতো ভুল করে বসে।

আবদুল পর্দার পাশ ঠেলে গলা বাড়িয়ে আবার ঘোষণা দিল ফার্স্ট মুন্সেফ।

এবার কুটিপাটি হেসে বিছানার ওপর এলিয়ে পড়ল নাঈমা। হাসতে হাসতেই বলল, শিরি আপা, আবদুল তোমার বড় রসিক।

নাঈমার সাথে হাসতে গিয়ে শিরির বুঝি মনে পড়ল কোনো-এককালে সামান্য কারণেই এমনিই হেসে হেসে ঢলে পড়ত শিরি। এখনও শিরি হাসে, কেননা না হাসলে বাঁচতে পারবে না ও। যেমন বাতাস না টেনে বাঁচতে পারে না

BanglaBook.org

কোনো প্রাণী। কিন্তু ওই নাঈমার মতো অথবা পেছনে ফেলে আসা সেই কোনো-এককালের হাসির মেয়েটির মতো আর কখনও কি হাসতে পারবে শিরি?

চল, আয়। বেচারিরা অনেকক্ষণ ধরে বসে আছে। পিঠময় ছড়ানো চুলের ওপর দিয়ে ঘোমটা তুলে পা বাড়াল শিরি।

নাঈমার বুঝি আপত্তি—না বাবা, সায়েব সুবোকে বড় ডর আমার। তার ওপর তারা যখন মেয়েমানুষ।

না-রে-না। তোর-আমার মতোই মেয়েমানুষ ওরা, এসেছে মপোয়ার কাজে।

মপোয়া! সেটা আবার কী বস্তু! অবাক হয়েই শুধায় নাঈমা। শব্দটা সত্যিই উৎকট।

মডার্ন প্রোগেসিভ উওমেন্‌স অ্যাসোসিয়েশন, গম্ভীরভাবে বলল শিরি।

কিন্তু হাসির চোটে বুঝি নাঈমার পেট ফাটবে। বুঝি তাই হাতের চাপে পেটটা ধরে রেখে বলল নাঈমা, প্রফেসর ঠাট্টা করে বলত মালপোয়া, কিন্তু মপোয়াটা আজ প্রথম শুনলাম। পেটে হাত রেখে হেসেই চলেছে নাঈমা।

শিরিকে ঢুকতে দেখে ওরা উঠে দাঁড়াল। আদাব আরজের পালাটা সেরে নর্থ-সাউথ দুজনকে দুপাশে রেখে লম্বা শোফাটায় বসল শিরি।

একটু দূরে বসে আছে ফার্স্ট। ওর দিকে তাকিয়ে ঘাড় হেলিয়ে নত করল শিরি। বলল, তুমি বসো রনু আপা, এঁদের সাথে কাজগুলো সেরে নি। নির্দিষ্ট একটা কাজ নিয়েই এসেছেন নর্থ সাউথ। কাজটা মপোয়ার হিসেব। অবশ্য কাজ না থাকলেই যে তাঁরা আসেন না এমন কথা নেই। সায়েবরা বেরিয়ে যান আপিসে এজলাসে, বিবিরা বসেন মজলিশে। কখনও নর্থের বাড়িতে, কখনও সাউথের বাড়িতে, কখনওবা খাস বড় কুঠিতে। বেশির ভাগ সময় স্থানীয় ধনী বেগম কাদেরের বাড়িতে। এ-মজলিশে কখনও এজেন্ডা থাকে, কখনওবা থাকে না। তা ছাড়া নর্থ সাউথকে সুযোগমতো এজেন্ডাহীন সাক্ষাৎ দিয়ে যেতে হয় এই বড় কুঠিতে। এর নাম সৌজন্য। যেমন তাদের পুরুষ অংশরা দেখা দিয়ে যায় সন্ধ্যার পর বড়সায়েবের সাথে। এই সৌজন্য পাত্রভেদে অফিস-হাজিরার মতোই বাধ্যতামূলক। এজেন্ডাসহ অথবা এজেন্ডাহীন। বড়কুঠিতে নর্থ সাউথের হাজিরা একটি রেওয়াজ। অফিসিয়াল মহলের এই রেওয়াজ নিয়ে কখনও প্রশ্ন ওঠেনি কারোর মনে। শিরির মনেও না। প্রশ্ন ওঠবার কথাও নয়। কেননা, সেই কবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির থেকে মহারানি ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে তুলে নিয়েছিলেন এদেশের শাসনভার। সে থেকেই তো চলে আসছে এই রেওয়াজ, স্বদেশীয়দের শাসন আমলেও।

নর্থ সাউথ যেমন এই সৌজন্যের সম্মানদানে অকৃপণ, তেমনি শিরিও গ্রহণে অভ্যস্ত। হয়তো বেশি মাত্রায়ই অভ্যস্ত, কেননা, এই অতিরিক্তটুকুর অভাব ঘটলে মনে হয় কী যেন ঘাটতি থেকে গেল। এটা যেন সকল মানুষের ক্ষেত্রেই সত্য। অতিরিক্তটুকু পেয়ে গিয়ে একসময় এতই অভ্যস্ত হয়ে পড়ি আমরা যে ওটা একান্ত

BanglaBook.org

প্রয়োজনীয় পাওনা বলেই মনে করি। কোনোক্রমে তার ব্যতিক্রম ঘটলে বলি, ন্যায্য থেকে বঞ্চিত হলাম। আর যারা দাতা, যারা দেয় সম্মানের আবওয়াব, অতিরিক্ত ট্যাক্স; তারাও বুঝি কোনোক্রমে না দিতে পারলে অপরাধী মনে করে নিজেদের, মনে করে দেনাশোধে ফাঁকি দিল।

নর্থ বর্ষিয়সী, সাউথ প্রৌঢ়া, চাকরির মেয়াদে নর্থ সিনিয়ার, সাউথ জুনিয়র। নর্থ মপোয়ার ভাইস-প্রেসিডেন্ট, সাউথ ট্রেজারার। অতএব বয়স এবং পদের মর্যাদা উভয় বিবেচনায় নর্থেরই কথা বলার অগ্রাধিকার।

একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেন নর্থ। শিরির সুমুখে মেলে ধরলেন হিসেবের ফাইলটা। বললেন, অডিটে পাঠাচ্ছি, একটু দেখে দিন।

সাউথ হাত বাড়িয়ে হিসেবের শিট দুখানা তুলে নিলেন। সেলাই-স্কুল অ্যাডাল্ট-স্কুল, মিলাত এমনি কয়েকটা হেডিং এবং হেডিঙের পাশে লেখা টাকার অঙ্কটা উচ্চারণ করে গেলেন। তারপর শেষ শিটের তলার দিকে আঙুল রেখে বললেন, দেখার আর কী আছে—সইটা বসিয়ে দিন এইখানে।

নর্থ বললেন, তা বটে, অডিট তো দেখছেই। সাউথ বললেন, এবার কিন্তু অডিটে সাজেশনটা দিয়ে আপনি রক্ষা করেছেন আমাদের।

নর্থ বললেন, তা আর বলতে! গেলবার অডিট হয়নি বলে কত কানাঘুষো।

সাউথ বললেন, অকৃতজ্ঞ আর বলে কাকে! যার কাছে উপকারের জন্য হাত পাতছিস সকাল-বিকেল, আড়ালে তারই বিরুদ্ধে কুৎসা?

নর্থ বুঝি পিছিয়ে থাকতে রাজি নন, তাই সমানে বললেন, মুখে ভেঙে দিতাম না!

সাউথ বললেন, আমার মত—মিসেস কাদেরকে এবার কিছুতেই সেক্রেটারি রাখা চলবে না।

বিস্ময়ের ভানে চোখ কপালে তুললেন নর্থ সেক্রেটারি? তাকে কমিটিতেই রাখা চলবে না। যদি তা-ই হয় তবে এই আমি রিজাইন দিচ্ছি।

নর্থের স্বরে উত্তেজনা। বুঝি তাই এক ধাপ এগিয়ে এলেন সাউথ : আমাদের সম্মানিতা সভানেত্রীর বিরুদ্ধে অহেতুক রটনার শাস্তি তাকে পেতেই হবে।

নর্থ বললেন, হুঁ, এ-জিলার হাজার ভাগ্যে মিসেস শিরিন হাসানের মতো অমন সভানেত্রী পেয়েছে।

সাউথ কিছুতেই পিছিয়ে থাকবেন না। বললেন, অমন শিক্ষিতা অথচ বিনয়ী, অমন অসাধারণ, অমন দেশপ্রেমিক বেগম কাদেররা এমনটি আর দেখেননি কখনও, তাই হিংসেয় জ্বলে পুড়ে মরছে।

এবার নর্থ সায় দিলেন। এই এতক্ষণে বলেছেন সার কথাটি।

নিন। সই সেরে ওদের কথার মাঝখানে ফাইলটা সরিয়ে দিল শিরি।

নর্থ এবং সাউথ একসাথে হাত বাড়িয়ে দুদিক থেকে ধরে নিল ফাইলটা। মধ্যপথে কিছুক্ষণ ঝুলে থাকল ফাইলটা। তারপর ফ্লাপে ফরাৎ করে একটা শব্দ তুলে চলে গেল সাউথের কোলে।

BanglaBook.org

অনেক কষ্টে ঠেলে আসা হাসিটা চেপে ধরল শিরি। তবু যেটুকু ঢল্‌কে পড়ল, সেটুকু নজর এড়াল না কারুর। জিভ কামড়ে ঠোঁটে কুলুপ মারলেন নর্থ-সাউথ।

আবদুল ততক্ষণে শরবতের ট্রেটা এগিয়ে ধরেছে ওদের সুমুখে। কাচের আধারে টলটলে কমলার রং। চুমুক দেবার আগেই বুঝি মন জুড়োয়।

ড্রইংরুমের অন্য কোণে ফার্স্টের সাথে দিব্বি গল্প জুড়েছে নাঈমা।

একদৃষ্টিতে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল নাঈমা। কেবলই মনে হয় চেনা-চেনা। কিন্তু কিছুতেই ধরতের পারছিল না। ফার্স্টও কেমন চিনি-চিনি চোখে দেখছিল নাঈমাকে। হঠাৎ একসময় চিনে ফেলল নাঈমা। শিরিদের দূর-সম্পর্কে বোন, ওদের বাসাতেই দেখেছে নাঈমা। শিরি আর মিনার মতো নাঈমাও আপা বলে ডাকত তাকে।

ও, আপনিই ফার্স্ট মুন্সেফ। চিনতে পেরে বলল নাঈমা।

হ্যাঁ, আমিই ফার্স্ট। অনেকদিন পর দেখা। কেমন আছেন?

একটু রোগা হয়েছেন আপনি। অন্য কিছু খুঁজে না পেয়ে বলল নাঈমা।

অনেক দিন পর দেখা তো! হয়তো তাই রোগা মনে হচ্ছে আপনার, বললেন ফার্স্ট।

নর্থ এবং সাউথকে বিদেয় দিয়ে শিরি এসে বসল ওদের কাছাকাছি। নাঈমার দিকে তাকিয়ে বলল, জানিস, অভিধা হল ফার্স্ট, সেকেন্ড, থার্ড। বাকিটুকু এজলাসের নেমপ্লেটেই লেখা আছে। অন্দরমহলে তার প্রয়োজন পড়ে না।

ওরা তিনজনেই হাসল

তারপর রুনু আপা? ফার্স্ট অর্থাৎ রুনুর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করে শিরি।

দেখতে এসেছি বললে মিথ্যে বলা হবে। এসেছি প্রথমত সালাম ঠুকতে। দ্বিতীয়ত একটা তদবিরে, রুনু বলল বেশ হালকা টোনে।

পুরোনো পরিচিতজনের কাছ থেকে বেশি বিব্রত হয় শিরি। এখনও খাঁটি অফিসার বেগম হতে পারেনি ও। বলল শিরি, কেন এমন করে লজ্জা দাও আপা, কাজের কথাটা বলে ফ্যালো।

কিন্তু কাজের কথাটা বুঝি নাঈমার সুমুখে বলা যায় না। ইতস্তত করছে রুনু।

উঠে বারান্দার দিকে সরে এল শিরি। পেছন পেছন রুনু।

তোকে তো বলতে কোনো সঙ্কোচ নেই। পাঁচটি বোন-পো, চারটি বোন-ঝি তোর। সংসার আর চলে না, ফিসফিসিয়ে বলে রুনু।

এসব হল আসল কথার আগের কথা। কিন্তু ভূমিকার তাৎপর্যটুকু বুঝতে পারে না শিরি। জিজ্ঞেস করল, আমি কি কিছু করতে পারি?

শিরির স্বরে কৌতূহল। কিন্তু মনে হয় সহানুভূতি। হয়তো তাই দীর্ঘতর হল রুনুর ভূমিকা। এরপর তোর দুলাভাই-এর ঘাড়ে যত অপোগণ্ডের বোঝা। মাইনে যে কত সে তো ভালো করেই জানিস তুই। এদিকে আবার মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার। চড়চড় করে বেড়ে চলেছে জিনিসপত্রের দাম। মাইনের টাকায় কিছুতেই কুলোয় না—

BanglaBook.org

আমি কী সাহায্য করতে পারি সেটা বলো-না, রুনু আপা। রুনুর লম্বা কথাটা কেটে দিয়ে শুধাল শিরি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, সেজন্যেই তো এলাম তোর কাছে। তুই একটা কথা বললেই কিন্তু সুরাহা হয়ে যায়।

কী কথা?

আমার একটা বেকার দেওর বসে বসে তোর দুলাভাইয়ের কষ্টের রোজগার ধ্বংস করে। তাই তুই যদি বলিস দুলামিয়াকে, তা হলে দেওরটারও হিল্লে হয়। সংসারেও একটা ফরাগত আসে।

কীভাবে রুনু আপা?

দুলামিয়াকে বল আমার ওই দেওরটার নামে খান দুই ট্রাক করে দিক। ফাইনেন্সিয়ার ঠিকই আছে। শুধু তোর বর লাইসেন্সটা দিয়ে দিলেই হয়ে যাবে।

এবার বুঝি শিরির বিস্মিত হবার পালা। ঠিক এ-ধরনের কিছু প্রত্যাশা করেনি।

বলবি তো? রুনুর চোখে মিনতির আবেদন।

শিরির চোখে ইতস্তত।

অতবড় একটা সংসার নিয়ে যেমন কষ্ট, তেমনি দুশ্চিন্তা আমার। এখনও একটা বাড়ি হল না ঢাকায়। মেয়েটার হল বিয়ের বয়স। কিন্তু বিয়ের বয়স হলে কী হবে, একটি পয়সা আছে ব্যাংকে? আজকাল তো আর আমাদের জামানা নয়, টাকা দিয়ে ছেলে কিনতে হয় এখন। যত বড় চাকুরে তত বেশি দাম। মেয়েটার ভবিষ্যৎ নিয়েই আমার দুর্ভাবনা এখন। পরেরগুলোরই-বা কী হাল হবে কে জানে! নয়টা ছেলে মেয়ে, ওদের খরচা কী কম...

কথা শুনে শিরির চোখের তারা বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। তার মুখে কথা যোগায় না।

BanglaBook.org

এমনি করেই গড়ে উঠবে

ভয়, আশঙ্কা আর অন্ধকার—এই তিনে মিলে রাতটা কেমন ভয়ংকর।

অন্ধকারটা বুঝি আরও ভয়ংকর, সেখানে গা-ঢাকা দিয়ে আছে হায়নার দল, ওত পেতে আছে হিংস্র নখর মেলে, যে-কোনো মুহূর্তে অন্ধকারের গা থেকে নেমে আসবে, ঝাঁপিয়ে পড়বে আর সবকিছু লন্ডভন্ড করে দেবে।

এমন রাত কমই আসে মানুষের জীবনে। যে-রাত ইতিহাস সৃষ্টি করে, যে-রাতের গর্ভ থেকে ইতিহাস জন্ম নেয়, ইতিহাস কথা কয়ে ওঠে, যে-রাত্রে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে পারে না, যে-রাত্রি জীবনকে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় মুখোমুখি, যে-রাত্রি অতি বড় স্বার্থপরকেও ত্যাগের প্রেরণা দেয়, এ তেমনি এক রাত্রি।

পিঁপড়ের সারির মতো এদিক-ওদিক পিলপিল করছে ওরা। ওরা ছাত্রছাত্রী আর কর্মী, ওদের মুখে কথা কম, পিঁপড়ের মতোই নিঃশব্দ পায়ে চলছে ওরা। ডাক্তার নাকি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারে না, সাহিত্যের ছাত্র হতে পারে না রাজমিস্ত্রি। কেমিস্ট্রির কৃতি ছাত্র কেমন করে আর্কিটেক্ট হয়? বইয়ের পোকা কেমন করে ইনক্লাবের কথা বলে? কিন্তু আজকের রাত্রে সবাই সব কিছু হতে পারে, হয়েছে। আজকের রাত্রি তো অসম্ভবের উন্মোচন। পরিকল্পনাটা প্রথমে কার মাথায় এসেছিল সে নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। নকশাটা কেমন সেটাও ওরা দেখেনি, দেখবার কোনো বিশেষ ইচ্ছা বা তাগিদও নেই ওদের। ওরা শুধু জানে একটা মিনার গড়ে তুলতে হবে এবং এই একরাতের মধ্যেই—ভোর হবার আগেই।

বাতি জ্বলে উঠল। ব্যারাকের কামরায় কামরায় আর উঁচু খামগুলোর মাথায় মাথায়। তখন দেখা গেল ওরা অনেক। দুশো পাঁচশো বা তারও বেশি। ওরা একজন আর-একজনের পাশে দাঁড়িয়েছে। এভাবে লম্বা লাইন, পাঁচশো গজ। হাতে-হাতে ইট আসছে। এক হাত থেকে আর-এক হাতে চালান হয়ে চার কি পাঁচশো হাত ঘুরে একটা ইট এসে পৌঁছুচ্ছে অকুস্থলে, যেখানে দুহাত পরিমাণ মাটিতে রক্ত জমাট হয়ে আছে। এখানেই শহীদমিনার গড়ে উঠবে।

BanglaBook.org

এমনি করে ইটগুলো আসছে। কোনোটা রাস্তার ওপারে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে, কোনোটা মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে যেখানে নতুন ইমারত তৈরি সেখান থেকে।

যেমন হঠাৎ করে আলো জ্বলেছিল তেমনি হঠাৎ করেই নিবে গেল। কে যেন চেঁচিয়ে উঠল—'ধ্যুৎ শালা'।

বিজলি কোম্পানিটাও যেন আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকিয়েছে, আর-একজন সখেদে বলল।

কিন্তু কাজ থামল না। ওদের চোখে এখন যে-দৃঢ়তা এবং সংকল্পের জ্যোতি তা সকল অন্ধকারকেই দূর করেছে।

মাটি তোলা হয়ে গেছে। এখন সেখানে ইট পড়ছে। ভিত গড়ে উঠছে। এক-একটি করে ইটের স্তূপ জমে উঠেছে। আর সেই শব্দটা—কোনি, ছেনি, হাতুড়ি আর সিমেন্ট ঘষার যে-শব্দ সেই শব্দটাও দ্রুততর হচ্ছে। শীতের শেষ হলেও মোটামুটি শীত পড়ছে। কিন্তু ওরা সবাই ঘামছে।

একটি মেয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। অমনি চেঁচিয়ে উঠল হয়তো তারই সহপাঠী ছেলেটা, 'আগেই বলেছি যার যেটা কাজ, মেয়েমানুষ দিয়ে এসব কাজ হবে না। এখন বুঝলে তো? দয়া করে সরবে কি?'

'সরবে না হাতি!' একলা নয়, আরও দুই-তিনজন মেয়ে-বন্ধুকে নিয়ে মুখিয়ে উঠল মেয়েটা।

'উইথড্র, উইথড্র'—কোনো-একজন মেয়ে রীতিমতো চিল্লিয়ে উঠল।

'তা নয় উইথড্র করলাম, কিন্তু এ নিয়ে তৃতীয় কি চতুর্থবার পতন, আর কতবার পতন হবে শুনি?'

'মোটেই না, মোটেই না—এ নিয়ে মাত্র দুইবার।' সমস্বরে প্রতিবাদ করল মেয়েরা। বাতি আর জ্বলল না, কিন্তু শেষরাতের চাঁদটা একটু উঁকি মারল। তাতেই দেখা গেল মিনার মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে।

আরও তাড়াতাড়ি—আরও তাড়াতাড়ি। কাজও বিশেষ নেই, রাতও বিশেষ নেই। কয়েক সহস্র হাত উদ্দাম হয়ে উঠল!

তারপর শেষরাত্রির নিঃশব্দটা ভেঙে টুকরো টুকরো হল অজস্র কণ্ঠের আনন্দিত স্লোগানে। মিনার তৈরি হয়ে গেছে। শহীদ স্মৃতি অমর হোক।

এমনি করে গড়ে উঠবে আদর্শের মিনার। এমনি করেই অজস্র হৃদয়ের অর্ঘ্যে, অসংখ্য হাতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রচেষ্টায়, ত্যাগের মহিমায়, দেশপ্রেমের অগ্নিপরীক্ষায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠবে আমাদের ভবিষ্যৎ।

BanglaBook.org

অনিরুদ্ধা

সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে মনে হয় অসম্ভব। অবিশ্বাস্য এমন একটা ঘটনা আদৌ সংগঠিত হতে পারে কল্পনায়ও যে ভাবতে পারেনি কোনোদিন। মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেয়ারও যে কোনো উপায় নেই। চোখ বুজে 'কুছ পরোয়া নেহি' বলে বিষয়টি যদি অস্বীকার করা যেত তবে হয়তো সে স্বস্তি পেত। কিন্তু তা-ইবা কেমন করে হয়! সদ্য-আসা দৈনিকের প্রথম পৃষ্ঠায় জ্বলজ্বল করে জ্বলছে অক্ষরগুলো :

'শ্রমিক নেতা গ্রেফতার'

খবরে প্রকাশ আব্দুল লতিফ নামক জনৈক ব্যক্তিকে গুপ্ত ষড়যন্ত্রকারীদের সাথে সংশ্লিষ্ট ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার অভিযোগে গত রাত্রে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও প্রকাশ ইহা লইয়া সাম্প্রতিক গ্রেপ্তারিকদের সংখ্যা হইল এক হাজার সাত শত একান্ন জন। সকলেই নিরাপত্তা আইনবলে বিনা বিচারে আটক রহিয়াছেন।

অক্ষরগুলো বিঁধে যায় তার বুকে বিষাক্ত তীরের মতো। কী কুৎসিত! ঘেন্নায় রি রি করে ওঠে খালেদার মন। এমন বিশ্রী নোংরামি লতিফের কাছ থেকে সে আশা করেনি। আজ কলেজে গিয়ে লিলিকেই-বা মুখ দেখাবে কেমন করে? লতিফকে লিলি কোনোদিনই পছন্দ করতে পারেনি! বলত, আচ্ছা খালেদা, তুই এমন একটা তৃতীয় শ্রেণীর লোককে কেন ভালোবাসতে গেলি, বলিহারি তোর রুচি! লজ্জায় লাল হয়ে খালেদা জিজ্ঞেস করত, তৃতীয় শ্রেণীর বলতে তুই কী মনে করিস? লিলি একটুও অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিত, লোকটা যেমনি Crude তেমনি দেমাকি। লিলি খালেদার বাল্যবন্ধু, কোনো আঘাত খালেদা তাকে দিতে পারত না। তাই মুখে হাসি টেনে বলত, দ্যাখ লিলি, তোর আমার রুচিবোধ যে একই রকম হতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আর তা ছাড়া ভালোবাসা

BanglaBook.org

জিনিসটা যেমন বাইরের রূপ দেখে প্রভাবিত হয় না, তেমনি হৃদয়ের নিবিড়তম কোণ থেকে হয় তার উৎপত্তি। তর্কের ঝড় হয়তো এভাবেই থেমে যেত কিন্তু লিলির সন্দেহ নিরসন হত না। আজ সেই লিলিই মওকা পেয়ে চেপে ধরবে খালেদাকে, শ্লেষ আর বিদ্রূপে মুখর হয়ে উঠবে তার ক্ষুরধার জিহ্বা।

খালেদার মনটা আরও বিষিয়ে ওঠে লতিফের লুকোচুরির কথাটা চিন্তা করে। নিশ্চয় লতিফ দীর্ঘদিন থেকেই এইসব বাজে (ধ্বংসাত্মক) কাজের সঙ্গে জড়িত। তা না হলে তাকে পাকড়াও করবেই-বা কেন! অথচ আভাসে-ইঙ্গিতেও খালেদাকে সে কোনোদিন বিষয়টি বলেনি। এই গোপনীয়তার অর্থ কি খালেদার প্রতি অবিশ্বাস, তাচ্ছিল্য? হয়তো উভয়ই। যদি তা-ই হয় সন্দেহাতীত লতিফের নীচ মনোবৃত্তি। এটা খালেদা নিশ্চিতরূপেই ধরে নিতে পারে। যে-কোনো কারণেই হোক লতিফ তার নিজের সম্পর্কে অনেক কিছুই যে গোপন রেখেছে খালেদার কাছ থেকে—এটা সুস্পষ্ট। আর ঠিক এই কারণেই লতিফ যে একটা Cheat ধোঁকাবাজ তাতেও কোনো সন্দেহ থাকতে পারে না। নিজের প্রতি বিরক্তিতে অশ্রদ্ধায় ঘেমে ওঠে খালেদা। তিন বছরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে লতিফকে সে বুঝতে পারল না। লতিফ যে এমনিভাবে ফাঁকি দিতে পারে বহু পূর্বেই কি সেটা তার বোঝা উচিত ছিল না? নাঃ, লিলির সত্যিই অন্তর্দৃষ্টি আছে, লিলি বুদ্ধিমতী। কিন্তু বুদ্ধিমতী লিলির কাছে পরাজয় স্বীকার করেও প্রশ্ন থেকে যায় খালেদার মনে—লতিফের আচরণ খামখেয়ালি ফাঁকিবাজি? না ইচ্ছাকৃত? কোনটা? যদি তা হয় ইচ্ছাকৃত তবে লতিফ ক্ষমার অযোগ্য। খালেদা স্থির সিদ্ধান্ত করে নেয়। আর যদি তা হয় খামখেয়ালি তবে এমন খামখেয়ালি অসহনীয়। ভাবনাগুলো তালগোল পাকিয়ে মাথার মধ্যে কেবলই ঢুঁ মারতে থাকে, কোনো পথ পায় না।

ক্যাঁক করে খুলে যায় দরোজাটা। গলা বাড়িয়ে খাসামা মালেক এত্তেলা দেয়, নাস্তা তৈরি। নাস্তার টেবিলে প্রাত্যহিক অংশীদার যাঁরা তাঁরা ছাড়াও রয়েছেন খালেদার মামা জামিল সাহেব—পুলিশের একজন হোমরাচোমরা ব্যক্তি। গম্ভীর মুখগুলোর উপর এক নজর চোখ বুলিয়েই খালেদা বুঝতে পারে আজ ঝড় উঠবে নাস্তার টেবিলে। আম্মার দিকে ভীরু চোখ দুটো নিবদ্ধ রেখে টেনে নেয় ফিরনির প্লেটখানি।

অখণ্ড-নীরবতার মাঝে চামচের ঠুং ঠাং শব্দ কানের পর্দায় এসে ধাক্কা মারে বিশ্রী, বেমানান সুরে।

প্রথম নীরবতা ভাঙলেন জামিল সাহেব। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ কর্কশ কণ্ঠে পুলিশি ঢঙে কাঁধে জোর এক ঝাঁকুনি তুলে দুহাতের জোড়া তালু টেবিলের সাথে ঘষতে ঘষতে বললেন—খালেদা, লতিফের অ্যারেস্টের খবর শুনেছ নিশ্চয়? উত্তরের অপেক্ষা না করেই বলে চললেন—লতিফকে গ্রেফতার করা হয়েছে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও

BanglaBook.org

ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে। তোমার আব্বার সাথে আলোচনা করে স্থির করেছি এই বিপজ্জনক ছোকরার সাথে আর কোনোপ্রকার সম্পর্ক তোমার রাখা চলবে না।

মহামহিম সম্রাটের অলঙ্ঘনীয় ঘোষণার মতো কথা কয়টি শেষ করে পিঙ্গল চোখের শ্যেনদৃষ্টিতে জামিল সাহেব তাকিয়ে থাকেন খালেদার দিকে। এই মুহূর্তেই তিনি জবাব দিতে চান দ্ব্যর্থহীন ভাষায়।

সিদ্ধান্তের ভারটা আমার উপর ছেড়ে দিতে পারতেন—ফস করে কথা কয়টি বেরিয়ে আসে খালেদার মুখ দিয়ে। এমনি ধরনের একটা উত্তর দেবার কথা এক ঘণ্টা পূর্বে খালেদা কল্পনাও করতে পারত না অথচ মনে হল সে যেন পূর্বাহ্নেই সব ভেবেচিন্তে ঠিক করে রেখেছে। তাই চমকে উঠল নাস্তার পাশে বসা তার বাপ, মা, বড় আপা সবাই। খালেদাকে এতদিন সবাই জানত নম্রস্বভাব, লাজুক প্রকৃতির অতি বাধ্য মেয়ে হিসেবে, অন্তত মামা জামিল সাহেব তা-ই মনে করতেন। কিন্তু আজকের এই নির্লজ্জ স্পর্ধায় তিনি স্তম্ভিত হকচকিত হয়ে রাগ চাপার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে সিগারেট ফুঁকে চলেন একরকম দম বন্ধ করে।

মা-বাবার অপ্রসন্ন দৃষ্টির সামনে অসোয়াস্তিতে খেঁকিয়ে ওঠে খালেদা, বড় আপার বড় বড় চোখ যেন তিরস্কার করছে—ছি, এমন অবাধ্যতা তোর কাছ থেকে আশা করিনি খালেদা!

আবহাওয়াটা লঘু করার ইচ্ছেয় খালেদা বলে—আমি বলছিলাম, ব্যাপারটা পরিষ্কার হত যদি আদ্যোপান্ত শোনা যেত লতিফের মুখে। ফল হল উলটো। পুলিশ-মামা শাহি মেজাজে হুংকার দিয়ে ওঠেন—তার মানে তুমি আমাদের কথা অবিশ্বাস কর—Nonsense।

খালেদার বাবা জজিয়তি করে কাটিয়েছেন চাকরিজীবনে। জজিয়তির সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি জেনেছেন পুলিশকর্তাদের নথিপত্র যেমন অভ্রান্ত স্বচ্ছ তাদের অন্তর্দৃষ্টি যার ফলে সত্যিকারের অপরাধী সাজা না পেয়ে নিস্তার থাকে না। হাকিমের সাবলীল ভঙ্গিতে থেমে থেমে প্রতিটি শব্দের উপর জোর দিয়ে বলেন, মেয়ের দিকে সস্নেহে দৃষ্টি বুলিয়ে, লতিফ anti state—এ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়েই পুলিশ লতিফকে ধরেছে। কাজেই তুমি লতিফের কাছ থেকে যা শুনবে সে হবে সাফাই। আত্মপক্ষ সমর্থন করা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই, কোনো অপরাধীই স্বীকার করে না তার অপরাধ। পুলিশ সাহেব আইনজ্ঞ নন, তাই জজসাহেবের যুক্তিজালে ছেদ টানেন—তার কাছে Inflamatary Literature পাওয়া গিয়েছে অজস্র। তা ছাড়া, তার সন্দেহজনক কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রমাণ যা মিলছে তা হল অকাট্য।

বিরক্তির কুঞ্চিত রেখায় খালেদার মুখ বিকৃত হয়ে ওঠে এক মুহূর্তের জন্য। বলে—আমি কাউকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের কথা বলছি না, আমার কথাটা হল

BanglaBook.org

লতিফেরও একটা বক্তব্য থাকা স্বাভাবিক এবং সেটা শোনা দরকার। অন্তত আমার পক্ষে তার বক্তব্য না শোনাটা হবে অপরাধ।

অতিরিক্ত জোর ফুটে ওঠে শেষের কথাটায়। ঘরে বাজ পড়লেও হয়তো এতটা আশ্চর্য হত না যেমন করে তারা চমকে উঠল খালেদার কণ্ঠস্বরের অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণতায়। যুক্তিতর্ক খালেদা চিরদিনই ভালোবাসে। চিন্তামুখী তার মনের নিবিড় আকর্ষণ রয়েছে—যুক্তিবিজ্ঞানের প্রতি—এটা সে বরাবর অনুভব করে এসেছে, কোনোকিছুকে বিনা দ্বিধায় নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করা তার স্বভাববিরুদ্ধ। বুদ্ধি দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে কোনোকিছুকে গ্রহণ করা বা বর্জন করা তার অভ্যেস হয়ে দাঁড়িয়েছে সেদিন থেকে, যেদিন থেকে তার মনে প্রথম জন্ম নিয়েছে চিন্তা করার শক্তি। তার এই বুদ্ধিদীপ্ত মনকে সংগোপনে ঘিরে থাকত বিনম্র মিষ্টি স্বভাবটি। এই বুদ্ধিদীপ্ত মন নিয়ে সে চলত তার নিজস্ব ধরাবাঁধা পথে, কোথাও ঠোক্কর লাগার আশঙ্কা দেখলে পাশ কাটিয়ে চলে যেত সে বাড়িই হোক আর ইউনিভারসিটিই হোক। এইজন্যই ঘরে-বাইরে কোথাও কোনোদিন কোনো সংঘর্ষের সামনাসামনি তাকে পড়তে হয়নি। তাই লিলির কায়দাদুরস্ত ফ্যাশানবাজি যে তার কাছে বিরক্তিকর সেটা গোপন রেখেই লিলিকে বান্ধবীর মর্যাদা দিয়েছে শুধু লিলির সারল্য ও প্রাণখোলা হাসির জন্য। বিরুদ্ধচরিত্রের সাথেও সে খাপ খাইয়ে নিয়েছে নিজের নিয়মটা অপরিবর্তনীয় রেখে। বাড়িতেও কোনোদিন প্রতিবাদের কণ্ঠ তার কেউ শোনেনি, যখনই বিরোধ ঘটেছে সে গিয়েছে পাশ কেটে নিজের রাস্তায় আপনভোলা হয়ে। তাই তার আদর সর্বত্র 'মিষ্টি মেয়ে' বলে। এমন নিরীহ ভালো মেয়েটির মুখে আজ বেসুরো কথা শুনে থেমে উঠলেন জজসাহেব, ভাবিত হলেন মা, নিস্তব্ধ বড় আপা কেঁপে উঠলেন অশুভ আশঙ্কায়।

যা সবসময় চলে আসছে, যা অহরহ ঘটছে তাকে স্বাভাবিক বলেই গ্রহণ করা ন্যায়-অন্যায় বা কার্যকারণের প্রশ্ন না তুলে এটাই জজ-পরিবারে সর্বজনমান্য বিধি। এই ছাঁচেই প্রতিপালিত খালেদা। জজবাড়ির রীতিনীতি মেনে চলেও, বাধার মুখে নীরব আত্মসমর্পণ করেও জজসাহেবের ছোট মেয়ে খালেদার ছিল একটি নিজস্ব গোঁ—সেটা হল তার দেখবার বা চলবার স্বকীয়তা। বড় আপা ধমক দিয়ে বলতেন—তুই ক্লাবে যাস না কেন? উত্তর দিত, যাব। কিন্তু যাওয়া তার ঘটত না কখনও, নানা ছুতোয় এড়িয়ে যেত। গার্ডেন পার্টিতে লিলির নিমন্ত্রণ। সবাই বুঝত এটা খালেদার অবজ্ঞা। খালেদাও মুখ ফুটে বলেনি কখনও, ক্লাব সে পছন্দ করে না। লতিফের সাথে তার বিয়ের পাকা কথা না হলেও দুপক্ষই ধরে নিয়েছিল বিয়েটা হবেই। ভালো ছেলে লতিফ, সিভিল সার্ভিসে সাফল্য নির্ঘাত—এটা ছিল জজসাহেবের সম্মতির প্রধান খুঁটি। খালেদার কাছে বিয়েটা ছিল তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই অন্যের মত বা অমত অপ্রয়োজনীয়। এরই মধ্যে মা ঢুঁ মারতেন আপন দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে। বলতেন—বিয়ের আগে অত মেলামেশাটা কি ঠিক?

BanglaBook.org

খালেদা এমনভাবে ঘাড় বেঁকিয়ে হুঁ বলত যাতে মা নিশ্চিন্ত হতেন, মনে-মনে খালেদার শুভবুদ্ধির তারিফ করে তৃপ্তি পেতেন এমন সুশান্ত মেয়ের মা হতে পেরেছেন বলে। আসলে 'না' বলার দুঃসাহস যেমন খালেদার ছিল না তেমনি অসম্ভব ছিল। শালীনতার একটি গণ্ডি টেনে নিয়ে তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখত লতিফের সাথে মেলামেশার ব্যাপারটা। মাতৃআজ্ঞার নীরব অবমাননা অবশ্য জজ-পত্নীর শ্যেনদৃষ্টির অগোচর থাকেনি।

অমনি ধরনের গোঁ তার ছিল যার প্রকাশ ঘটছে নানা টুকিটাকি কাজে বিভিন্ন সময়ে। কিন্তু তা কোনোদিন প্রতিবাদ বা অবাধ্যতার রূপ নেয়নি। কোনো বিষয়ে খালেদা না করেছে এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তাই লক্ষ্মী মেয়ে বলে বাড়িতে তার আদর।

এমন লক্ষ্মী মেয়েটি আজ চায়ের টেবিলে ঝড় তুলল—এমন অভাবনীয় ব্যাপারে বাড়ির ছোট বড় সবাই প্রচণ্ড বিস্ময়ের ধাক্কায় বেসামাল।

বড় আপা অতীতের সমুদ্র মন্থন করে প্রাপ্ত রত্ন ছুড়ে মারলেন নাস্তার টেবিলে—ও চিরদিনই এমনি গোঁয়ার—কেন মিছে তর্ক করছেন মামা!

জামিল সাহেব এতক্ষণে হয়তো পরিস্থিতির জটিলতা উপলব্ধি করে কিছুটা দম নিয়ে ঠাণ্ডা হবার চেষ্টা করছিলেন। শান্ত কিন্তু অনমনীয় কণ্ঠে বলেন ব্যাপারটি তর্কাতর্কির ঊর্ধ্বে। এর সাথে জড়িত খালেদার ভবিষ্যৎ, সমগ্র পরিবারের মান-ইজ্জত। আপাতত এর চেয়ে বেশি কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করেন তিনি। চোখ ফেরালেন খালেদার দিকে, কান খাড়া করে রইলেন, কোনোকিছু শোনার উদ্দেশ্যে। খালেদা চোখ নামিয়ে নেয়। হাতের চামচটা উলটিয়ে পালটিয়ে একান্ত মনে দেখতে থাকে যেন কোথাও তার একটা খুঁত রয়েছে কিন্তু ধরতে পারছে না। ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সে ভেবেছে লতিফের কথা। ভেবেছে কেমন করে যে অবমাননাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে লতিফ তার সমাধান করা দরকার। তার চেয়েও বেশি করে ভেবেছে লতিফের কপটতার কথা। আত্মপরিচয় গোপন রাখার অভাবনীয় হীনম্মন্যতায় ক্রুদ্ধ খালেদা লতিফের সম্পর্কে প্রশ্ন তুলেছে মনে। লতিফের সাথে পরিষ্কার একটা বোঝাপড়ার সিদ্ধান্ত সে একরকম করেই নিয়েছিল। কিন্তু নাস্তার টেবিলে প্রত্যেকটি অসহিষ্ণু ও অবাস্তব দৃষ্টি বা জিজ্ঞাসার সামনে তার সুপ্ত চেতনা ঘা খেয়ে যেন জেগে উঠল। সে-চেতনা হল বিচার করে দেখার মনোভাব, যে-মনোভাব হয়তো পিতা জজসাহেবের অনুকরণেই সে প্রথম আয়ত্ত করতে শুরু করেছিল কিছুটা সচেতন মনে। লতিফের দিকটা কেউ দেখতে চায় না। ভাবতেও চায় না, বোঝার চেষ্টা দূরের কথা। খালেদা নিজেও তা এতক্ষণ করেনি। পুলিশ মামার ক্রুদ্ধ হুংকার একথাটাই তাকে মনে করিয়ে দিল।

BanglaBook.org

মামার অনাবশ্যক রূঢ় কণ্ঠস্বর। বড় আপার ভর্ৎসনা, মাতার নীরব মিনতি, বাবার অপ্রসন্ন চাহনি—সব মিলিয়ে ঘরের আবহাওয়াটা হয়ে ওঠে খালেদার পক্ষে শ্বাসরুদ্ধ, বুঝতে কষ্ট হয় না চায়ের টেবিলে যে-তুফান উঠেছে তা এখুনি থামছে না। জজবাড়ির খানার-ঘরে এমন অনাত্মীয় পরিবেশ সে কোনোদিন কল্পনাও করতে পারেনি। তাই মেজাজটা তার চড়তে থাকে চক্রবৃদ্ধি গতিতে। সবচেয়ে বেশি সে মর্মাহত হল মা, বড় আপার অদ্ভুত আচরণে। এই সেদিনও এ-দুটি প্রাণের আদর উপচে পড়েছে বাড়ির ভাবী ছোট জামাতা লতিফের উপর। আজ অনায়াসেই তারা লতিফকে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে চরম শাস্তি দিতে উদ্যত। খালেদারা সুপ্ত চেতনা বলে উঠল—এটা অন্যায়, যে-অন্যায়ের উৎস অন্ধ স্বার্থপরতা। তার মনের জেদ বাড়তে লাগল। লতিফের কপট আচরণ এতটুকু লঘু না করেও খালেদার জেদি মন এক নিরপরাধ আসামিকে প্রতিকূল আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য উদার অনুভূতিতে আর্দ্র হয়ে উঠলে। মামার প্রশ্নটাকে কোনো আমল না দিয়ে সোজা বাবার দিকে তাকিয়ে সে বলল—আমি অনেক কিছুই বলতে পারছি না উত্যক্ত আবহাওয়াটার অবসান করার উদ্দেশ্যে। শূন্য চায়ের কাপটা ঠেলা মেরে সরিয়ে রাখল পাশে, নাস্তার তস্তরিতে অনাবশ্যক একটি টোকা মেরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কর্তব্যপরায়ণ জামিল সাহেব সাবধানবাণী উচ্চারণ করলেন অনুত্তেজিত কণ্ঠে—হ্যাঁ, এখন যাও। ভাববার একটু সময় তোমার দরকার। কিন্তু মনে রেখো ভাবালুতা পরিহার না করতে পারলে জেলের ভাত হয়তো তোমার কিসমতেও আছে। ঘরে বাজ পড়লেও হয়তো এমন বিস্ময়ের সৃষ্টি হত না। যেন এক ঝলক বরফসিক্ত হিমেল হাওয়ার ঝাপটা এসে প্রাণীগুলোর বোধশক্তি কেড়ে নিয়েছে। ভীতু মা যন্ত্রণা-দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল মেয়ের মুখের দিকে। বড় আপার ডাগর চোখের শঙ্কামেশানো মিনতি, বাবার কুঞ্চিত মুখে দুশ্চিন্তায় তোলপাড়-খাওয়া মনের করুণ প্রকাশ পরিস্ফুট। কথাটা কতটা ধমক আর কতটা সত্য সেটা আন্দাজ করার জন্য খালেদা চোখ তুলে মামার দিকে চাইবার আগেই বাড়ির দরজায় অপেক্ষমাণ গাড়ির ঘন ঘন হর্ন আর সিঁড়িতে ত্রস্ত পায়ের শব্দ জানিয়ে দিল লিলি এসেছে। মাঝ-সিঁড়ি থেকেই শোনা যায় লিলির গলা, খালেদা তৈরি হয়েছিস? আমি কিন্তু বেশিক্ষণ থাকতে পারব না।

খালেদা বাঁচল হাঁপ ছেড়ে। লিলির আওয়াজে সাড়া দিয়ে নাস্তাঘরের অস্বস্তিকর ও গুমোট আবহাওয়াটা এক ঝটকায় ঝেড়ে ফেলে বেরিয়ে এল বারান্দায়।

এ কী? তুই যে দেখি এখনও চুলই ঠিক করিসনি। নাঃ, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না! অতিক্রান্ত সিঁড়িগুলোর জবরদস্তিতে ক্লান্ত লিলি বলে নিশ্বাস টেনে টেনে। খালেদার হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় ঘরে। ড্রেসিংটেবিলের সামনে দাঁড় করিয়ে বলে—নে, জলদি কর, আমি তোর শাড়ি-ব্লাউজ বের করে দিচ্ছি। হঠাৎ আয়নার প্রতিফলিত খালেদার মুখের উপর নজর পড়ে আঁতকে উঠল। যে-মুখে

BanglaBook.org

সে বরাবর দেখে এসেছে প্রশান্তির স্নিগ্ধ প্রলেপ সে-মুখ আজ অস্বাভাবিক আর দুর্ভাবনার কালো রেখায় ম্রিয়মাণ। খালেদার গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলে—কীরে, কী হয়েছে? অমন প্যাঁচার মতো মুখ করেছিস কেন?

খানা-ঘরের তপ্ত হাওয়ার প্রবাহ তখনও খালেদার সর্বাঙ্গ ঘিরে। আরামকেদারায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে চোখ বন্ধ করে হাতখানি টেনে দিল কপালের উপর। লিলির প্রশ্নের কোনো উত্তর এক কথায় নেই। তবুও চোখ না খুলেই বললে—কিছু না, এমনি মনটা খারাপ। লিলি মনের ব্যাপারে কোনো আমলই দিতে রাজি নয়। চিরুনিটা একরকম জোর করেই খালেদার হাতে গুঁজে দিয়ে বলল, আরে ছোঃ—মনটন কিছুই না, আসলে তোর একটা Diversin দরকার। নে ওঠ। ওদিকে রিহার্সেলে দেরি হয়ে গেলে মুনীর সাহেবের ধমক খেতে হবে।

আজ আমায় মাফ কর ভাই, একটুও ভালো লাগছে না। শ্রান্ত অনুনয়ের ভাষা খালেদার।

উহুঁ, তুই-ই Word দিয়েছিলি, আমার অভিনয় দেখতে যাবি। আজ কোনো ফাঁকি চলবে না।

তুই বোধ হয় জানিসনে লিলি, গতকাল সন্ধ্যায় লতিফ অ্যারেস্টেড হয়েছে। দূরবর্তী আকাশের নীল থেকে যেন কথাগুলো ভেসে এল ক্ষীণতম তরঙ্গের মতো। আচমকা লিলি উত্তর পেল না খুঁজে। খালেদা ভেঙে পড়েছে এটাই লিলির কাছে অসহনীয়। বলল—তাই নাকি? ও নিয়ে অত ভাবছিস কেন? সহজ হালকা ঢঙে ব্যাপারটিকে লঘু করে তুলতে চায় লিলি। খালেদার হাত ধরে টান মেরে বলে—নে ওঠ, একটু বেড়িয়ে এলে ঠিক হয়ে যাবে তোর মেজাজ। নড়ে খালেদা তেমনি চোখ বুজেই উত্তর দেয়—না, আজ কোথাও আর যাব না। দেরি হয়ে যাচ্ছে, তুই যা।

সহজে হালছাড়ার পাত্রী নয় লিলি। আরামকেদারার হাতলে বসে জোর করে সরিয়ে দেয় এক পাশে খালেদার হাত। ওর মাথাটি তুলে নেয় নিজের দুহাতের কোলে। গম্ভীর হয়ে বলে—দ্যাখ খালেদা, সবকিছুতেই তোর বাড়াবাড়ি একটু বেশি। লতিফের যে এমন একটা পরিণতি হবে সে আমি অনেক আগেই বুঝেছিলাম। ওই বাউন্ডেলেটার নজর ছিল তোর আভিজাত্য আর অর্থের দিকে। ভালোবাসাটা ছিল গৌণ। তাই আজ সে এমনভাবে তোর সর্বনাশ করতে পারল। আমার সাবধানবাণী তুই কোনোদিন কানে নিলি না, এটাই আমার আফসোস। কথা তার শেষ হবার আগেই চোখ রগড়িয়ে উঠে বসে খালেদা। জিজ্ঞেস করে—আমার সর্বনাশটা কিসে হল।

সর্বনাশ না? সে তো জেলে বসে বসে হাতি খাবে? আর ভূতের বোঝা বয়ে বেড়াতে হবে তোকে। তা কেন হতে যাবে?

ব্যস, এই উত্তরই তো তোর কাছ থেকে আশা করছিলুম। আমার কথা হল যা হবার হয়ে গিয়েছে। ব্যস, এখন তুই বরং মুক্তি পেলি You start a new

BanglaBook.org

life—হাসির তরঙ্গ তুলে কথাগুলো বলে লিলি বেশ স্ফূর্তির মেজাজে। খালেদার গালে ছোট্ট একটি চড় মেরে বাহু দুটিতে হালকা চাপ দিয়ে বলে—নে নে, চল—রিহার্সেল সেরে রিজে যাব।

লিলির অকারণ আনন্দ, চঞ্চলতা বড্ড বিশ্রী লাগে খালেদার। দুটি বাহু লিলির হাত থেকে মুক্ত করে বলে—দ্যাখ, আমার কি কোনো কর্তব্যই নেই? খালেদাকে এত গম্ভীর হতে দেখে হেসে দেয় লিলি। হাসতে হাসতেই বলে—nothing, স্রেফ চুপ থাকো, সিনেমা থিয়েটারে যাও, স্ফূর্তি। এই তোমার কর্তব্য, বুঝলে?

আচ্ছা, এবার তুই যা, আমায় একটুক্ষণ একলা থাকতে দে, দোহাই তোর। অস্বাভাবিক রূঢ় শোনায় কথাগুলো খালেদার নিজের কাছেই। ধড়াস করে শুয়ে পড়ে বিছানায়, চাদরটা গায়ের উপর টেনে নিয়ে চোখ বোজে। ঘন নিশ্বাসের টানে কেঁপে কেঁপে ওঠে সুপুষ্ট বক্ষ। অপ্রতিভ লিলি নির্বাক তাকিয়ে থাকে এই অদ্ভুত মেয়েটির দিকে যার খেয়ালি আচরণ তার কাছে দুর্বোধ্য শুধু আজ নয়, আশৈশব।

নিঃশব্দে লিলি বেরিয়ে আসে ঘর ছেড়ে। বেগবান ক্যাডিলাক গাড়ির হর্ন বাতাসে মিলিয়ে যেতেই খালেদা উঠে বসে প্রচণ্ড জোরে দেহের এক ঝাঁকানি তুলে। হাত দুটো মুঠো করে ছুড়ে মারে শূন্যে উপরের দিকে। যেন ঝেড়ে ফেলতে চায় এক দুঃসহ বোঝার গ্লানি। অবিন্যস্ত চুলের গোছাটা যথাস্থানে সংবদ্ধ করে। অগোছাল শাড়ির আঁচলটি পেঁচিয়ে নেয় শক্ত করে কোমরে। শিয়রের জানালার ফাঁক দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় অনেক দূরে আকাশের নিঃসীম শূন্যতার অনুসরণ করে।

বারবার তার মনের পর্দায় ধাক্কা মারে লিলির শেষ কথাগুলো—মুক্তি, start a new life, লিলির হাসিটি এখনও এক দুর্বিষহ জ্বালার মতো জ্বলছে তার সর্বাঙ্গ ঘিরে। চিন্তার সূত্রটি কিছুতেই খালেদা ধরে রাখতে পারে না; ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায় তার গ্রন্থি। জামিল মামার আজরাইলি হুংকারটি মনে পড়তেই দেহের সমস্ত রক্ত যেন এক নিমিষে এসে আশ্রয় নেয় বুকের কাছে। অজানা বিপদের আশঙ্কায় মিইয়ে পড়ে দেহের প্রতিটি তন্ত্রী। অচেতন লোমকূপগুলো হঠাৎ খাড়া হয়ে ওঠে। খালেদার মনে হয় যেন জোর ঝাঁকুনি তুলে, জ্বর আসছে। কয়েদখানার এক ভয়ংকর বীভৎস ছবি ভেসে ওঠে তার কল্পনায়। চোখের পাতা আসে বুজে। একটি নরম হাতের পরশে চমকে ওঠে দ্যাখে বড় আপার বড় বড় চোখে বেদনার করুণ ছায়া।

ক্লাবে যাবি না?

নাঃ বড় আপা, আজ কিছুই ভালো লাগছে না, ভাঙা ভাঙা গলার আওয়াজ খালেদার।

আজ তিনটের গাড়িতে তোর দুলাভাই চলে যাচ্ছেন, যাবি নাকি স্টেশানে? জিজ্ঞেস করেন বড় আপা ভয়ে ভয়ে, পাছে খালেদা অসংযত কিছু না বলে বসে।

BanglaBook.org

খালেদার ইচ্ছে নেই একটুও। কিন্তু সোজা না বলে দিলে বড় আপার মনে বড় আঘাত লাগবে তাই বললে—যাব।

বড় আপা নেমে আসেন একতলায়। চিন্তার ছিন্ন সূত্রটি আবার টেনে নেয় খালেদা। একটি সিদ্ধান্ত তাকে করতেই হবে। অনিশ্চয়তার মধ্যে সে কাউকে রাখতে চায় না, নিজেও মুক্তি পেতে চায় শূন্যে-ঝোলা বাদুড়ের অসহনীয় অবস্থা থেকে। এরই মনে হয় এক বিরাট শূন্যতা যেন তাকে গিলে ফেলছে। হিংস্র দানবের রক্তাক্ত থাবার সামনে সে যেন অসহায় বলির পাঁঠা। লিলি, জামিল মামা, বাবা, মা, বড় আপা, লতিফ প্রত্যেকটি ছবি ভেসে ওঠে তার চোখের সামনে। একই সাথে অজস্র কথার প্রতিধ্বনি বেজে ওঠে তার মনে। নানা কথা, নানা ভঙ্গি। চোখরাঙানি, সাবধানবাণী, কাতর মিনতি, এসব অনেক ছবি। পেটের নাড়িতে যেন টান পড়ে।

বাবুর্চির ছোট্ট ছেলে মনা, কখন যে চুপিচুপি ঘরে ঢুকেছে খালেদা টেরই পায়নি, কানের কাছে মুখটা এনে ফিসফিস করে বলে—ছোট আপা, একটা লোক আপনার সাথে দেখা করতে চায়। বলে খুবই জরুরি, আপনাকে নিচে যেতে বলছে।

উত্তেজনায় মনা তখনও কাঁপছে, আস্তে আস্তে কথা বলতে গিয়ে জোর করে নিশ্বাস চাপছে তাতে হিমশিম খেয়ে একাকার। খালেদার আঁচল ধরে টানে, বলে—চলুন।

কোত্থেকে এসেছে, কী নাম, কেন দেখা করতে চায় খালেদার এতগুলো অভাবিত জিজ্ঞাসায় অপ্রস্তুত হয়ে যায় মনা। প্রশ্নগুলো তার কাছে মনে হয় বড্ড অবাস্তব। উত্তর আনার জন্য চট করে উলটো দৌড় মারে মনা। চোখের পলক না পড়তেই আবার ফিরে আসে, তেমনি উত্তেজিত চোখমুখ। খালেদার গলা জড়িয়ে ধরে বলে—নাম বলবে না, কোত্থেকে আসছে তাও বলবে না। আপনাকে নিচে যেতে বলছে। মনার তার সয় না। সমস্ত ব্যাপারটা তার কাছে ভারি রোমাঞ্চকর। খালেদার হাত টানতে টানতে বলে—এসে দেখুন-না কে। ও বলছে—আপনার কাছে সব বলবে।

আগন্তুকের এবংবিধ বিচিত্র আচরণে কৌতূহল জাগে খালেদার। একতলায় নেমে এসে দেখে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি লোক। জিজ্ঞেস করে—কী চাই আপনার? নিরুত্তর লোকটি একখানি খাম তার হাতে দিয়ে বলে, কাল ঠিক এই সময় এসে উত্তর নিয়ে যাব। Ready করে রাখবেন। খামটা একবার উলটিয়ে দ্যাখে খালেদা, উপরে কারো নামধাম কিছুই লেখা নেই। আঙুলের ডগা দিয়ে ফাঁৎ করে ছিঁড়তেই, ছোট এক টুকরো কাগজ এল বেরিয়ে, বিদ্যুৎ চমকের মতো হাতটা কেঁপে উঠল খালেদার এক মুহূর্তের জন্য। কী-একটা অস্ফুট আওয়াজ আটকে গেল, গলার মাঝেই। শুধু দুটো ঠোঁট কেঁপে কেঁপে লুটিয়ে পড়ল হাওয়ার

BanglaBook.org

তরঙ্গে। চোখ তুলে দেখল পত্রবাহক লোকটি এতক্ষণে মিশে গেছে বড় রাস্তার জনস্রোতের মধ্যে। অবাক মনা জিজ্ঞেস করে, কী ছোট আপা!

কম্পিত পা, প্রায় টলতে টলতে খালেদা উঠে আসে দোতলায়, মনার প্রশ্ন তার কানে যায় না—ঘরে খিল এঁটে দেয়।

লতিফ লিখছে—কয়েদখানার শিকলবাঁধা জীবন শুরু করলাম অতি আকস্মিক, অপ্রস্তুতভাবে বিধিনিষেধের এই জগতে এসে প্রথম বিস্ময় কাটিয়ে মনে পড়ল তোমার কথা, চোখের সামনে ভেসে উঠল তোমার বিস্মিত চিন্তিত মুখের নির্বাক অভিযোগ। অপরাধ আমার। কর্তব্যের কঠিন নিয়মে বদ্ধ আমার মুখ কোনোদিনই তোমার সামনে হৃদয়ের মর্মকাহিনি উদ্ঘাটিত করতে পারেনি পরিপূর্ণভাবে। এই অপ্রকাশের বেদনা, মনের ভার হালকা করার সময় যখন উপস্থিত মনে করছিলাম তখুনি এক ঘৃণ্য কুকুরের বিশ্বাসঘাতকতায় নিক্ষিপ্ত হলাম গুহার অন্ধকারে। প্রাচীরঘেরা জীবনের প্রথম প্রভাতে এই বিশ্বাসই মনে দৃঢ় হল নবজীবনের পথে আমার যাত্রা অব্যাহত থাকবে, বুকের মাঝে যে-আশা ধ্বনিত হল তা হচ্ছে আমার নবযাত্রার পথে তোমার উষ্ণ সাথিত্ব আর অকৃত্রিম ভালোবাসা। তোমার উজ্জ্বল চোখের আলো দেয়াল ভেদ করে আমার আঙিনায় ছড়িয়ে পড়ুক শতরেখায় শত রঙের বিচিত্র খেলায়। ভয় পেও না লক্ষ্মী আমার, সাহসে বুক বাঁধো। জীবনকে ভালোবাসতে গিয়ে যারা আজ অন্ধ গুহার নির্জনবাসী তাদের কণ্ঠস্বর তুমি শুনতে পাবে। প্রতি রাস্তার মোড়ে, তাদের কথা ছড়িয়ে আছে দেশের প্রতিটি ধূলিকণায়। তারই সাথে তুমি বিলীন হয়ে যাবে পরিপূর্ণ একান্ত বোধে। নবজীবনের সাথে তুমিও পা বাড়াবে অসংকোচে, বিনা দ্বিধায়। আমার বোন সুলতানা আর বাড়ির অন্যান্যরা আজ বিকেলে দেখা করতে আসবে জেলগেটে। তাদের সাথে অবশ্যই এসো। যে-কথা এ্যদ্দিন বলাও যায়নি আজ থেকেই সে-নবকাহিনির সূচনা হোক।

বারবার অনেকবার চিঠিখানি পড়ল খালেদা। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি লাইন প্রতিটি শব্দ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল। আরও অনেক অর্থ আরও অনেক কথা যেন লুকিয়ে আছে তারই ফাঁকে ফাঁকে। সকাল থেকে যে-অন্ধ উত্তেজনা আর অজানা আশঙ্কায় তার মন বিষিয়ে উঠেছিল এখন মনে হল সেটা অহেতুক বিক্ষুব্ধ মনে যে-এলোমেলো চিন্তার ঝড় উঠেছিল তার জন্য লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল খালেদা। লতিফ কোনো লুকোচুরি করেনি—এই সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে খালেদা নিশ্বাস ছাড়ল গভীর তৃপ্তির। তার সাথে দেখা করার এক গভীর তাগিদ অনুভব করল আরও তীব্রভাবে। এখনও অনেক কিছুই যে তার বোঝার বাকি রয়েছে, অনেক অসংলগ্ন চিন্তার স্থিরতা আসতে পারে লতিফের সাথে প্রাণ খুলে আলাপ করে। মনাকে দিয়ে একখানা রিকশা ডাকিয়ে নেয়। সশঙ্কিত মা পেছন থেকে চেঁচিয়ে ওঠেন—নাওয়া-খাওয়া বাদ দিয়ে তুই চললি কোথায়?

BanglaBook.org

এই এক্ষুনি আসছি মা—উৎকণ্ঠিত মাকে প্রবোধ দিয়ে রিকশায় চড়ে বসে খালেদা।

সুলতানাদের বাসা থেকে যখন ফিরল তখন দুপুরের সূর্য মাঝ-আকাশে স্থির অচঞ্চল। ক্লান্ত অবসন্ন খালেদা দোতলার দিকে পা বাড়াতেই মনা এসে বলল, কে যেন বহুক্ষণ ধরে তার জন্য অপেক্ষা করছে বৈঠকখানায় বসে। মুখ বাড়িয়ে দেখল মাঝবয়সী ভদ্রলোক শোফায় বসে হাঁটুর উপর দুহাতের ঠেস দিয়ে হাতের তালুতে চিবুক রেখে ঘুমুচ্ছে। খালেদার আগমনে উৎকর্ণ হয়ে লোকটি উঠে দাঁড়ায়। লেহাজের সাথে মাথা ঝুঁকিয়ে ঠুকে 'আদাব' বলে বিনম্র ভাষায়—এই যে আপনার অপেক্ষায় বসে ছিলাম। একটু দরকার ছিল আপনার সাথে। পাশের একটা শোফায় বসতে বসতে জিজ্ঞেস করে খালেদা—আপনাকে তো চিনতে পারলাম না? যদি কিছু মনে না করেন আপনার নাম? এমন ধারা পালটা প্রশ্নের জন্য লোকটি হয়তো প্রস্তুত ছিল না। হঠাৎ নামধামের কথা এসে যাওয়াতে বড্ড বিব্রত বোধ করে। একটু ইতস্তত করে ভেবে-চিন্তে উত্তর দেয়—আমি আপনার মামা জাহেদ সাহেবের একজন Subordinate। খালেদা বুঝল মামা পাঠিয়েছেন হয়তো কোনো প্রয়োজনে। বলল, ও বলুন এবার আপনার কী দরকার।

একটুখানি কেশে লোকটি পকেট থেকে বের করে নেয় ছোট একটি পকেট ফাইল লাল ফিতেয় বাঁধা। লাল ফিতের গিঁটটা খুলতে খুলতে বলে, আমার কতগুলো প্রশ্ন আছে—আপনি Frank উত্তর দেবেন এটাই আমি আশা করি।

এমন অনাবশ্যক ভনিতায় খালেদা আশ্চর্য হয়ে যায়। ভাবল—লোকটি হয়তো বিব্রত বোধ করছে অপরিচিতা মহিলার সামনে। বললে—আপনার যা বলার বলে যেতে পারেন নিঃসংকোচে। ফাইল থেকে মুখ না তুলেই লোকটি জিজ্ঞেস করে—আচ্ছা, লতিফ সাহেবের সাথে আপনার পরিচয় কতদিনের? প্রশ্নটি ছুড়ে মেরেই নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে খালেদার দিকে উত্তরের প্রত্যাশায়। এরকম বিদঘুটে প্রশ্ন খালেদার চিন্তার অতীত ছিল। মুখ কঠিন করে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করে—হঠাৎ এই প্রশ্নের অর্থ?

কাঁচুমাচু খেয়ে চোখ ঘুরিয়ে নেয় লোকটি। সলজ্জ হাসির রেখায় নিভাঁজ মুখে ঢেউ তুলে বলে—দেখুন, আমি এসেছি DIB থেকে। লতিফ সাহেব Dangerous element হিসেবে অ্যারেস্টেড হয়েছেন। আপনার সাথে তাঁর সম্পর্ক বিশেষভাবে Intimate এটা আমরা জানি। তাই আমি এসেছি আপনাকে জেরা করতে।

তাই বলে যা-তা অবান্তর প্রশ্ন করবেন? মাঝপথে বাধা দিয়ে খালেদা জিজ্ঞেস করে।

আমার investigation-এর জন্য যা জানা দরকার তার বাইরে একটি কথাও আমি কব না। আপনার কাছে অবান্তর মনে হলেও আমার পক্ষে সেসব হল জরুরি এবং প্রয়োজনীয় প্রশ্ন। বেশ জোর দিয়ে এবং পরিপূর্ণ গাম্ভীর্যের সাথে

BanglaBook.org

আগন্তুক কথাগুলো বলে। ফাইল থেকে একটা লম্বা মোটা খাম টেনে তার ভেতর থেকে বের করে নেয় ছোট ছোট কয়েকটা খাম। একখানি ছোট খাম হাতে নিয়ে আবার বলে—লতিফ সাহেবের বাসা তল্লাশি করে আমরা কতগুলো চিঠিপত্র পেয়েছি। তাতে এ-সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহ যে, তাঁর গোপন কার্যকলাপের কিছু হদিশ আমরা আপনার কাছ থেকে পাব। সেজন্যই আমার আসা। খামটা নেড়েচেড়ে আবার রেখে দেয় যথাস্থানে এমনিভাবে যেন ঐ খামটার মধ্যেই রয়েছে খালেদার জিয়নকাঠি মরণকাঠি।

সারা দুনিয়ার ক্লান্তি তখন এসে ভর করেছে খালেদার কাঁধের উপর। ঝিম ঝিম করছে মাথাটা। অবশ হাতগুলো নড়তে নারাজ। এক অস্ফুট ধ্বনি তুলে খালেদা মাথাটা এলিয়ে দেয় সোফার ফিঠে। সামনের লোকটিকে আর এক মুহূর্তও সহ্য করা তার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে দ্যাখে, আটকে আসে গলা। দেহের সমস্ত শক্তি এক করে, গলাটাকে উচ্চতম মাত্রায় চড়ানোর ব্যর্থ চেষ্টায় কোনোরকমে বলে—দেখুন, আপনার investigation-এ আমি কোনো সহায়তা করতে পারব না। কথা যেন ঠোঁটের কাছে তৈরিই ছিল—তেমনি চটপট লোকটি বলে—তার মানে আপনি জানেন, কিন্তু বলবেন না। এই তো?

সমস্ত রক্ত হঠাৎ যেন দৌড় মেরে মাথায় ভর করে খালেদার, চেঁচিয়ে ওঠে সে—বেশ জানলেও বলব না, আপনি এখন সন্তুষ্ট তো?

আমরা কিন্তু ইচ্ছে করলে আইনের আশ্রয় নিতে পারি—উলটো দিক থেকে দ্রুত উত্তর আসে।

দেখুন, আইনের ভয় দেখিয়ে কোনো ফয়দা হবে না, উত্তেজিত খালেদা কথা কয়টি বলে উঠে দাঁড়ায়। সারাদিনের বিক্ষুব্ধ মন এখন তার ফেটে পড়তে চায় দুর্দান্ত আক্রোশে। পুঞ্জীভূত রাগ তার কেন যেন কেন্দ্রীভূত হয় ঐ সামনের সোফায় বসা আগন্তুকের উপর। নিজের মনেই তর্ক করে—এটা যেমন অহেতুক, তেমনি অন্যায়। তবুও অনাহূত লোকটির উপর তার স্থির নিষ্পলক দৃষ্টি আগুন ঝরায়, ঘৃণার আগুন। রীতিমতো কষ্ট করে খালেদা দৃষ্টি ঘুরিয়ে নেয়। সোফার বাহুতে কম্পিত হাত ভর দিয়ে একটু আশ্বস্ত হতে চেষ্টা করে খালেদা।

খালেদার আকস্মিক ভাব-পরিবর্তনে একটুও অপ্রস্তুত বা অপ্রতিভ না হয়ে আগন্তুক ফাইলখানি দুরস্ত করে তৈরি করে নেয় বিদায়ের জন্য। এক টুকরো কাগজে ঝরনা কলমে ফসফস করে কী যেন লিখলে। তারপর উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে যেন দণ্ডকর্তা আসামিকে শেষ সুযোগ দিচ্ছে ক্ষমা প্রার্থনার এমনভাবে বললে—বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম কিছু ক্লু আপনার কাছ থেকে পাব। কথার শেষে এক স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত মুখ আর প্রত্যাশার দৃষ্টি নিয়ে তাকায় খালেদার দিকে।

কী যেন একটি শক্ত জবাব খালেদার জিবের ডগায় এসে থেমে যায়। ঢোক গিলে সংযত কণ্ঠে বলে—আপনার কথা শেষ হয়েছে তো? আগন্তুক বুঝলে

একথার অর্থ। দরজার দিকে এক পা বাড়িয়ে আবার ঘাড়টা বাঁকিয়ে নিক্ষেপ করলে তার শেষ অস্ত্র—একটা কথা বলে যাচ্ছি আপনাকে খুব privatly—আমরা কিন্তু আপনাকে সন্দেহ করি। You are a suspect.

আপনারা চুলোয় যান—ধাঁ করে প্রত্যুত্তর দিয়ে খালেদা সিঁড়ি বেয়ে উঠে যায় দোতলায় এক দৌড়ে।

ওরা যখন স্টেশনে পৌঁছাল তখন গাড়ি সবেমাত্র ভিড়েছে প্ল্যাটফর্মে। দ্বিতীয় শ্রেণীর খালি কামরাটায় খালেদাকে ঠেলে দেয় বড় আপা। হুকুম হল কুলি যে-মালগুলো তুলছে সেগুলো গুনে গুনে লিস্ট মিলিয়ে দেখতে হবে তা ঠিক আছে কি না। বাক্স-তোরঙ্গের বহর ভেদ করে জজসাহেব কখন এসে বসেন মেয়ের পাশটিতে। অন্য সবার নজর এড়িয়ে চুপিচুপি অতি অন্তরঙ্গ সুরে বলেন—একটা উপায় আছে। কথাটার আগুপিছু কিছুই বুঝতে না পেরে খালেদা নীরবে তাকিয়ে থাকে বাবার মুখের দিকে অধিকতর আলোকপ্রাপ্তির আশায়।

একগাল প্রশস্ত হাসি দিয়ে মেয়ের পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বলেন জজসাহেব—তুই পেরেশান হয়েছিস বড়; আমি এই হলফ করে বলছি, তিন দিনের মধ্যেই লতিফকে জেলখানা থেকে বের করে আনছি, তুই একটুও ভাববি না। আচমকা যেন একটা জরুরি কথা মনে পড়েছে এমনিভাবে কথার মাঝে ছেদ টেনে পকেটে হাত দিয়ে বের করে নেন টাইপ করা একখানি কাগজের পৃষ্ঠা। কাগজখানি খালেদার হাতে দিয়ে বলেন—যখন দেখা করতে যাবি লতিফের কাছ থেকে এটা সই করিয়ে আনবি। ব্যস, তোকে আর কিছুই ভাবতে হবে না। স্নেহপরায়ণ পিতার কণ্ঠস্বরে ঝরে পড়ে ব্যথাহত মেয়ের প্রতি গভীর সমবেদনা আর অভয়বাণী। স্নেহের কোমল স্পর্শ খালেদার তপ্ত দেহে বুলিয়ে দিলে শীতলস্নিগ্ধ প্রলেপ। চোখ তুলে দেখলে পিতার মুখে সহানুভূতির সুকোমল ছাপ। হুড়মুড় করে তখন বড় আপা কাচ্চাবাচ্চার দল নিয়ে ঢুকে পড়েছে কামরায়। লিস্টখানা বড় আপার হাতে দিয়ে খালেদা নেমে আসে প্ল্যাটফর্মে একটুখানি খোলা হাওয়ার লোভে। বাঁ-পাশে দুকদম এগুতেই দেখলে একটি তৃতীয় শ্রেণীর কামরার সামনে ছেলেবুড়ো নানান ধরনের লোকের নাতিবৃহৎ এক জটলা, তারই ফাঁকে জন দুই খাকি পোশাকধারীর স্বাভাবিক কর্মতৎপরতা দেখে খালেদা ভাবলে বসার জায়গা নিয়ে অথবা কুলির ভাড়া নিয়ে মামুলি কোনো গোলমাল অথবা কোনো চুরি-চোট্টামি। পাশ কেটে এগিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ নজরে পড়ল ভিড়ের প্রান্তসীমায় গাড়ির কামরা-ঘেঁষে ছোট্ট একটি বাক্সের উপর বসে আছে তারই বয়সী একটি মেয়ে ডান হাতে লোহার বেড়ি। কোলে একটি বাচ্চা কেন যেন চটেছে ভীষণ, হাত-পা ছুড়ছে আর চেঁচিয়ে কী যেন বলছে অর্ধপ্রস্ফুটিত জড়ানো ভাষায়। কৌতূহল জাগল খালেদার, ভিড়ের পাশে মেয়েটির কাছ থেকে নিকটতম কোণে গিয়ে দাঁড়াল। দেখলে কামরাটি মেয়ে-যাত্রীর জন্য নির্দিষ্ট। বেড়িহীন হাতখানা

BanglaBook.org

রোরুদ্যমান ছেলেটিকে সামলাতে সামলাতে একের পর এক অনেকগুলো প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। তার পরনে দেশি তাঁতের মোটা সাদা শাড়ি সরু লাল পাড়ে ঘেরা। সাদা ব্লাউজটি অতিরিক্ত ঢোলা। পায়ে কাঁচা চামড়ার কিম্ভূতকিমাকার স্যান্ডেল। অলংকারবর্জিত দেহটি মাঝারি গোছের। না-মোটা না-হ্যাংলা, কালো গায়ের রং, রক্তহীনতার জন্য মনে হয় শ্যামলা। মোটা নাক আর সরু চিবুকে মুখায়বয়বে সমতা খানিকটা ব্যাহত; কিন্তু সবটা মিলিয়ে মুখশ্রী বড্ড কমনীয়। আশেপাশের কথা থেকে খালেদা বুঝলে, মেয়েটি রাজবন্দি, বিনা বিচারে আটক। এও শুনলে মেয়েটিকে স্থানীয় জেল থেকে বদলি করছে অন্যত্র। কিন্তু তার কোলে ছেলেটির হদিস পাবার জন্য খালেদার আগ্রহ তর সইতে চায় না। একটুখানি ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলে—এই ছেলেটা কি আপনার?

হ্যাঁ, ও যখন দুমাসের তখন ওকে নিয়ে জেলে যাই; দেখুন, কত বড় আর কত দুরন্ত হয়েছে—স্মিত হাস্যে মেয়েটি বলে।

আশ্চর্য হয়ে যায় খালেদা, ছেলে কোলে নিয়ে কোনো যুবতী মেয়ের কারাবাস পৃথিবীর আলো-আঁধার গার্হস্থ্য জীবনের কলকাকলি থেকে দূরে—অনেক দূরে নির্জন গুহাবাসিনী কোনো নারীর কথা সে যে কল্পনায়ও ভাবতে পারে না। কেন এমন দুর্বিষহ অভিশাপ ডেকে এনেছে মেয়েটি? ভেবে কোনো যুক্তিসংগত কারণ খুঁজে পায় না খালেদা। আর-একটু কাছে এসে প্রায় মেয়েটির পিঠ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে—আপনার স্বামী নেই? খালেদার নিজের কাছেই যেন কেমন বেখাপ্পা পরিহাসের মতো শোনায় প্রশ্নটি। ঘাড় দুলিয়ে ফিক করে হেসে দেয় মেয়েটি সরলা কিশোরীর নির্মল হাসি। ভারি ভালো লাগে খালেদার।

খোকার বাবাও রাজ-অতিথি আজ বছর তিন ধরে। ব্যাপারটা কিছুই নয় এমনি নির্লিপ্ততার সুরে জবাবটা দিয়ে ছেলেটাকে তুলে দেয় খালেদার কোলে।

ধরুন তো একটু। পা-টা ঝিমঝিম করছে। বাবা! কী যে ওজন বেড়েছে ছোঁড়াটার! একটুক্ষণ কোলে রাখলেই হাঁপিয়ে পড়তে হয়। খিল খিল হাসি ছড়িয়ে পড়ে বাতাসের তরঙ্গে।

অবাক মানে খালেদা। কারারুদ্ধ স্বামী, শিশু-সন্তানসহ নিজেও কারাবাসিনী অথচ এতটুকু অভিযোগ নেই মেয়েটির। বেদনার ক্ষীণতম রেশটুকুও পাওয়া যায় না ভাবে ভঙ্গিতে।

আচ্ছা—এভাবে জেলে থাকতে কষ্ট হয় না? বোকার মতো জিজ্ঞেস করে খালেদা।

ক্ষণিকের জন্য চোখ দুটি চিক চিক করে ওঠে মেয়েটির। গম্ভীর হয়ে যায় মুখখানি। শিকল-বাঁধা ডান হাতখানি কোলের উপর তুলে বলে—কষ্ট?

বন্দিজীবনের কষ্ট কি কম? দুঃসহ কারাযাতনার তিল তিল লেহনে জীবনের আয়ু-নিঃশেষ করে দেওয়ার কষ্ট যে অপরিসীম। দৃষ্টি তার চলে যায় দূর দিগ্‌বলয়ের কোনো অচেনার সন্ধানে। খালেদার হাতখানি নিজের মুঠোয় টেনে

BanglaBook.org

নিয়ে বলতে থাকে অতলস্পর্শী বেদনাবিধুর কণ্ঠে—কিন্তু ভাই, লৌহপিণ্ড যেমন আগুনে জ্বলে ক্ষুরধার ইস্পাতের জন্ম দেয় তেমনি দুঃখ কষ্টের তাপে জীবন হয় নির্মল, জীবনসাধনা পায় পরিণতির আশ্বাস।

কথা বলতে বলতে নিশ্বাস টানে মেয়েটি জোরে জোরে। বেদনামিশ্রিত হাসির একটি চিকন আভা খেলে যায় ঠোঁটের উপর দিয়ে, তখন ভারি সুন্দর মনে হয় মেয়েটিকে। অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দ্যাখে খালেদা, সেই সুশান্ত মুখের বজ্রেঘষা শ্যামল শ্রী। নিরাভরণ সৌন্দর্যের অদৃশ্য জ্যোতিতে কালো মুখটি যেন ঝলমল করছে। খালেদার জীবনে এ যেন এক নতুন আবিষ্কার, এক মহান সত্যের স্বর্ণদুয়ার যেন অকস্মাৎ খুলে গেল তার সামনে। গভীর তন্ময়তার বন্দি নারী। শিশুসন্তানটিকে সে চেপে ধরলে বুকের কাছে, নিবিড় মমতায় অনুভব করলে শিশুর তপ্ত জীবনধারা। বন্দিনী তখন কৌতূহলী ভিড়ের অজস্র জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে ব্যস্ত। তার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি প্রতিটি কথা খালেদা গেঁথে নিতে চায় মনের মধ্যে। খালেদা ভাবে—হিমালয়ের মতো অটল ধৈর্য মেয়েটির বুকে, আকাশের সুনীল বিস্তার মেয়েটির গভীর চোখের কোলে। সুবিশাল সমুদ্রের স্নিগ্ধ প্রশান্তি তার মুখে। পৃথিবীর সকল সুষমা যেন ঘিরে রয়েছে মেয়েটিকে, অচেনা মেয়েটার প্রতি নাড়ির টান জাগে খালেদার। এ-হৃদয়ের নিগূঢ়তম ভালোবাসার উৎস যে ক্ষতধারায় খুলে দিতে চায়। খালেদার মনে হল সকাল থেকে যে-প্রশ্ন তার মনে গুমরে গুমরে ফিরছিল উত্তরের জন্য, এই মুহূর্তে যেন তার সমাধান সে পেয়ে গেল বন্দিনী ভগ্নীর চরণতলে। হুইসেল বেজে উঠল সবুজ নিশান উঠল নড়ে। বাচ্চাটি কিছুতেই খালেদার কোল ছেড়ে যেতে চায় না। জোর করে বাচ্চাটিকে টেনে নিয়ে কৌতুক করে বলে মেয়েটি—দেখেছ ভাই, কেমন নিমকহারাম ছেলে? আরাম পেয়েছে তোমার কোলে, ব্যস ভুলে গেল মাকে। কাঁধে ঝুলানো ব্যাগটি খালেদা খুলে ঝটপট বের করে নিল ছোট একটি ডায়েরি, মেয়েটির সামনে খুলে বললে—দিন তো আপনার অটোগ্রাফ—কোনোদিন ভুলতে পারব না আপনার কথা।

গাড়ি তখন চলতে শুরু করেছে ধীরে ধীরে। ডায়েরিটা টেনে নিয়ে মেয়েটি তাড়াতাড়ি লিখে দিলে কয়েকটি লাইন রবি ঠাকুরের—

কালের ঘায়ে সেই তো মরে
অটল বলের গর্ভভরে
থাকতে যে চায় আঁচল হয়ে।
জানে যারা চলার ধারা
নিত্য থাকে নূতন তারা
হারায় যারা রয়ে রয়ে।

জেলগেটে যখন খালেদা পৌঁছাল দেখলে সাক্ষাতের নির্ধারিত সময় আসতে তখনও আধা ঘণ্টা বাকি। যে-বইগুলো এনেছে লতিফের জন্য আবার একটু

BanglaBook.org

নেড়েচেড়ে দেখে নিলে। হঠাৎ একটি মাসিকের ভাঁজ থেকে খসে পড়ল আব্বার দেওয়া সেই টাইপ-করা কাগজের পৃষ্ঠাখানি। স্টেশনের হৈচৈ আর উত্তেজনার মধ্যে ঐ মূল্যবান কাগজখানির কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিল সে, এতক্ষণে কৌতূহলের তাগিদ অনুভব করে চোখ বুলিয়ে নিলে টাইপ-করা লাইনগুলোর উপর। অর্ধেক লেখা শেষ না হতেই ভ্রূ তার কুঁচকে উঠল, ঘন বিষাদের কালো ছায়ায় ম্লান হয়ে এল উজ্জ্বল মুখখানি, ঠোঁটজোড়া হালকা হাওয়ার লঘু তরঙ্গের মতো মৃদু কম্পন তুলে স্থির হয়ে রইল। নির্জীব পাথরের ঢেলার মতো টুকরো টুকরো করে কাগজখানি ছিঁড়ে ফেলল খালেদা। দীর্ঘনিশ্বাসের সাথে সাথে এক বিরাট জগদ্দল পাথরের দুঃসহ বোঝা যেন নেবে গেল তার বুকের উপর থেকে।

২৭ মে ১৯৫৫
চট্টগ্রাম জেল

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

বহুরূপী

কার্তিকের শেষ। গ্রীষ্ম বর্ষা পেরিয়ে শীতের আগমনবার্তায় মুখর একটি রবিবারের বিকেল। মৃদু বাতাস, তাতে একটু শীতের আমেজ। সিল্ক-লিলেনের হাওয়াই শার্ট পরা একদল তরুণ আর হয়তো তাদেরই সহযাত্রী রেশমি ওড়না উড়িয়ে একদল তরুণী কলকণ্ঠের ঢেউ তুলতে তুলতে আমার পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। এক ঝলক সুগন্ধি হাওয়া অনভ্যস্ত নাকে সুড়সুড়ি ফুটিয়ে যায়। পুরানা পল্টন পেরিয়ে ইডেন বিল্ডিং হাতের ডাইনে রেখে এগুচ্ছিলাম রেললাইনের দিকে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে সেদিনই সকালবেলায় বেরিয়ে এসেছি পাঁচ বছরের বন্দিজীবনকে পিছনে ফেলে। সারাটা দুপুর সহকর্মী ও বন্ধুবান্ধবদের সাথে খোস আমদেদের পালা খতম করে বিকেলের দিকে বেরিয়েছি একটু খোলা হাওয়ায় ঘুরে আসব বলে। গদিরক্ষা আইনের দৌলতে যাঁরা দীর্ঘদিন বদ্ধ কারাজীবনের যাতনা ভোগ করেছেন তাঁরাই বুঝবেন এই খোলা হাওয়ায় বিচরণের আবর্তন কতখানি তীব্র। সঙ্গ নিয়েছেন এক পুরাতন সুহৃদ আমার 'নূতন ঢাকার' সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে। বন্ধুর মুখে 'নূতন ঢাকা' কথা কয়টি উচ্চারিত হওয়ার সাথে সাথেই কেঁপে উঠেছিলুম এক রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে। এই রোমাঞ্চ নূতনের নেশায় নয়, আমার আজন্ম পরিচিত ঢাকা শহর পাঁচ বছরে কী রূপ পরিগ্রহ করেছে তা স্বচক্ষে দেখার উদগ্র আগ্রহ মেটাবার সুযোগ পাওয়ার জন্য।

হাতের বাঁদিকে সারিসারি বাঁশের তৈরি ছাউনি। এর মধ্যে কোনোটা নেতিয়ে পড়েছে ব্যাধিগ্রস্তা থুড়থুড়ে বুড়ির মতো—সামনে পিছনে চারপাশে অসংখ্য মোটা গাছে ঠেস লাগিয়ে কোনোরকমে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে। শ্রীহীন ঘরগুলোর চাল থেকে নেতিয়ে-পড়া লাউ-কুমড়োর ডগাগুলো ঘোষণা করছে অধিবাসীদের গার্হস্থ্য জীবনের কথা। বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম—ওগুলো রেল-শ্রমিকদের কোয়ার্টার। প্রতি তিন-চারটি কোয়ার্টারের পরই রাস্তার পাশে নজরে পড়ল কাবাব-রুটি আর মিঠাইমন্ডার ফেরি দোকান। চারপাশে ছড়ানো লম্বা টুলে বসে

BanglaBook.org

রকমারি খরিদ্দার, কেউবা চিবুচ্ছে ঠান্ডা তন্দুর, কেউবা হাতল-ভাঙা গরম চায়ের কাপ নিয়ে বিব্রত, কেউবা নেহাত আয়েশে বিড়ি ফুঁকছে, কথাবার্তাও চলছে কয়েক ভাষায়—বাংলা, উর্দু, হিন্দি, পাঞ্জাবি। এরই মধ্যে বেজে চলেছে দোকানির ভাঙা কলের গান—'আয় পরদেশিয়া।'

ঠাট্টা করে বন্ধুকে বললাম—এই বুঝি তোমার national riconstruction-এর চেহারা। এমন সোজা প্রশ্নে বন্ধু হয়তো অসোয়াস্তি বোধ করলেন। কিন্তু উত্তর দিলেন চট করে—আরে না, না। চলো-না সামনে, দেখবে এটা তো slum.

বললাম—দেখব হয়তো সুন্দর জিনিস, কিন্তু জান তো এ-জায়গাটি ছিল মস্ত বড় খোলা মাঠ, আমার মনে আছে পল্টনের রাস্তা থেকে মাঠে নেমে কোনাকুনি হেঁটে উঠতাম গিয়ে টিকাটুলির রাস্তায়। পুরা কদমে হাঁটলে প্রায় মিনিট দশেক লেগে যেত।

সেটাই বুঝি ভালো ছিল? তবে বলতে পার রেল কলোনিটার মতো slum-টা এখানে সামঞ্জস্যবিহীন।

'বাবু, পালিশ', মুখ না ঘোরাতেই দেখলাম একটি ছোট্ট ছেলে কখন জুতোসুদ্ধ আমার পা-টা টেনে নিয়েছে বুটস্ট্যান্ডের উপর, বাধ্য হয়ে দাঁড়াতে হল।

বন্ধুকে হেসে বললাম—ঢাকায় কিন্তু এটা নূতন জিনিস। বোধ হয় কলকাতা বা চৌরঙ্গী থেকে আমদানি হয়েছে।

কলোনির ভাঙা চালের দিকে আঙুল তুলে বন্ধু উত্তর দিল—এরা সব কলোনিরই ছেলে, কী আর করবে? এই করে তবু দুপয়সা রোজগার হয়।

স্কুলে যায় না কেন? হঠাৎ এ-প্রশ্নটি করে নিজে নিজেই কেমন বোকা মনে হল। সামনের স্তব্ধ পরোটার দোকানের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এমনি কচিকচি ছেলেমেয়ে আরও অনেক। কেউবা বুট পালিশের সরঞ্জাম নিয়ে কোনো ভদ্র পথচারীর প্রতীক্ষায়, কেউবা সুর করে চ্যাঁচাচ্ছে পান-বিড়ি সিগারেট। কেউবা দোকানির এক টুকরো বাসি রুটির প্রতীক্ষায় সারবন্দি দাঁড়িয়ে আছে দুহাত বুকে গুঁজে।

ছেলেটার হাতে একখানি দুআনি গুঁজে দিয়ে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠলেও যেন ডুবন্ত সূর্যের রক্তিম আভা মুছে যায়নি। পশ্চিম আকাশের সোনালি আভা যেন কলোনির বাঁশের চালের উপর থেকে বিদ্রূপ করছে টিমটিম করে জ্বলা রাস্তার স্কাইলাইটগুলোকে। এমনি একটি চালের পর্দা সরিয়ে হঠাৎ চোখ-ধাঁধানো লাইটের আলোয় হোঁচট খেয়ে যেতে দাঁড়িয়ে পড়লুম। আলোর দিকে তাকিয়ে বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন—চা খাবি কোথায়, রিজে না গুলিস্তানে?

বললাম—সুন্দরের রানি প্যারি নগরের বিলাসকেন্দ্র রি-জের নাম শুনেছি আর গুলিস্তানের সাথে পরিচয় আরব্য উপন্যাসের ও নজরুলের কবিতা মারফত। তাই আমি দুটোতেই সমান আগ্রহশীল।

BanglaBook.org

মুচকি হেসে বন্ধু উত্তর দিলেন! ইমিটেশান আমাদের ধর্ম...

কিন্তু অনেক সময় নকল আসলকেও ছাড়িয়ে যায়। যেমন গুণী শিষ্য হার মানায় গুরুকে, বন্ধুর কথা কেড়ে নিয়ে বলতে হল।

আরে গর্দভ, অতটা প্রতিভা যদি আমাদের থাকত তবে তো অনুকরণ ছেড়ে আমরা originality-র দিকেই পা বাড়াতাম—কাঁধে একটি জোর ঝাঁকুনি দিয়ে বন্ধু জবাব দিলেন। আসলে আমরা প্যারি বা আরব্য উপন্যাসের দেশীয় সংস্করণের চেষ্টায় আছি, শাবাশ। বন্ধুকে সান্ত্বনা দিলাম, গরিব দেশের লোক আমরা স্ফূর্তিটাও করব গরিব হালতে—এতে আত্মগ্লানির কিছুই নেই।

রি-জের দরজায় পা রেখেছি এমন সময় বন্ধুবরের হ্যাঁচকা টানে সরে আসতে হল। না—এখন না, রাত নয়টার পর না এলে এখানকার আবহাওয়াটাই বুঝতে পারবি না, ইঙ্গিতটা উপলব্ধি করে চুপ থাকলাম।

গুলিস্তানে চায়ের কাপে চুমুক দিতে বন্ধু জিজ্ঞেস করল—চা'টা কেমন?

সিকিউরিটি চায়ের তুলনায় অতি উত্তম।

বেচারার অপ্রতিভ মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝলাম বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বর্ণনা করতে হল জেলখানায় নিরাপত্তা বন্দিদের দৈনিক যে চা দেওয়া হয় তার মাহাত্ম্য, যার রং হত কখনও কালো, কখনও মেটে, কখনও গাঢ় খয়েরি, অথবা হালকা গোলাপি ঠিক চায়ের রংটি ছাড়া। আর গন্ধ আম জাম যে-কোনো পাতার গন্ধের সাথে তুলনীয় ঠিক চাপাতার গন্ধটি ছাড়া। বাজারে যেমন হরেকরকমের চা Tosh, Lipton, Brookbond স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও স্বাদ গন্ধ নিয়ে বিরাজমান, তারই সাথে টেক্কা রেখে আমাদের ব্র্যান্ড ছিল 'সিকিউরিটি চা', শুনে বন্ধু হেসেই খুন।

সিনেমার টিকেট করা ছিল। তাই চটপট বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় পা দিয়েই বোরখা থেকে বেরিয়ে আসা একখানি হাতের সামনে থতমত খেয়ে দাঁড়াতে হল। বন্ধু বুঝিয়ে দিলেন—ঢাকার রাস্তায় ঐ দৃশ্য আজকাল অহরহ দেখবে। বললাম—'বোরখা' পরিহিতা ভিখারি এই প্রথম দেখলাম।

বন্ধু টিপ্পনী কাটলেন—তা দেখবে কেমন করে, ঢাকার বাইরে তো কোনোদিন যাওনি।

পাঁচ বছর পূর্বে জায়গাটি ছিল জনবিরল, আজ জনবহুল। তখন পথ চলতে আলোর অভাবই পীড়া দিত। এখন লাল-নীল-সবুজ রকমারি বাহার। নিওন-সজ্জিত শোকেস আর আলোয় আলোকিত সাইনবোর্ডের ভিড় পথ চলার আনন্দ বৃদ্ধি করে। তবুও মনে হয় বড্ড কৃত্রিম। মনের কথাটি বন্ধুকে না বলে ভিড়ের মধ্যে পথ-কেটে-নেওয়া প্রায়-ভুলে-যাওয়া অভ্যাসটি রপ্ত করার দিকে মনোযোগ দিলাম। লেভেল ক্রসিংয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়তে হল। রাস্তা বন্ধ। ডজনখানেক মটরগাড়ি অগুনতি রিকশা আর সাইকেলের এক কোণে দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ার চেষ্টা করছি, এমন সময় জামার পাশপকেটে টান পড়ল। সম্ভাব্য কোনো

BanglaBook.org

পকেটমার ভেবে আত্মরক্ষার প্রস্তুতি হিসেবে পকেটটি চেপে ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে বুকটা কেমন যেন জ্বলে উঠল প্রত্যাশিত কোনো পকেটমারের ছুরি দেখে নয়, অপ্রত্যাশিত আসাদের সহাস্য সম্বোধনে—কীরে! চিনতেই পারিস না যে!

বলতে বলতে আসাদ গাড়ির দরজা খুলে নেমে এল। হাতটা টেনে নিল বগলে অতীতের কলেজি অভ্যাসের ঢঙে।

কেমন আছিস? জেলখানা থেকে বের হলি কবে? আছিস কোথায় এখন? এতগুলো প্রশ্নের কোনটার জবাব প্রথমে দেব, ভাবতে-না-ভাবতেই দেখলাম কখন উঠে বসেছি আসাদের সুপরিচ্ছন্ন গাড়ির স্টিয়ারিং হুইলের পাশটায়।

নে, এখন আরাম করে বোস। তারপর আস্তে আস্তে সব শোনা যাবে। সিগারেটের কৌটাটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে আসাদ আশ্বস্ত করল।

পাজামা হাফ শার্ট পরা সহপাঠী আসাদকে দেখেছি নোটবই মুখস্থ করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টায়। সার্কস্কিনের জ্যাকেটে অথবা Owner driven case-এর স্টার্টারে তাচ্ছিল্যভরে সিগারেট টানতে তাকে কোনোদিনই দেখিনি। তাই বাতচিতের আগে ক্যারাভান-এর টিনটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ নীরব ধূম্র উদ্‌গিরণ করাই শ্রেয় মনে করলাম।

এমন অবাক হয়ে দেখছিস কী?

আসাদের প্রশ্নে লজ্জা পেলাম বড্ড। হয়তো আমার মনের প্রশ্নটি তার কাছে ধরা পড়ল। তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম—অনেক দিন পর দেখা হল কিনা! তার উপর আজ সকালেই সরকার বাহাদুরের মেহমানদারি থেকে রেহাই পেয়েছি। তাই আড়ষ্টতাটা এখনও কাটেনি।

উহ্, অনেক দিন কাটালি জেলখানায়, না? সহানুভূতির সুর উঠেছে তার কণ্ঠে।

তীব্র হুইসেল বাজিয়ে রেলগাড়ি বেরিয়ে গেল। আমাদের গাড়ি স্টার্ট নিল নবাবপুরের রাস্তা ধরে। এতক্ষণে আমি কিছুটা সহজ হয়ে নরম কুশানে ঠেস দিয়ে বসেছি। আমাদের কিন্তু কথার অন্ত নেই। কখন সে ঢাকায় স্থায়ীভাবে এসেছে, পুরানো বন্ধুরা কী কী করছে, শাহ্‌বাগের নূতন হোটেলটি কেমন হল, ঢাকার রাস্তাঘাটের অব্যবস্থা—এমনি ধরনের অনেক কথা।

এরই ফাঁকে জানতে পারলাম—সে আমাকে ভোলেনি। বরঞ্চ কখনও কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে আমি যেন বিনা দ্বিধায় চাই, একথাও জানিয়ে রাখল। পেছনের সিট থেকে সাথি বন্ধুবরের খোঁচা খেয়ে খেয়াল হল মুকুল সিনেমায় এসে গিয়েছি। সবার আগে আসাদ একখানি ছোট্ট কার্ড হাতে গুঁজে দিয়ে বলল—এই আমার ঠিকানা। অবশ্যই একদিন আসবি। অ-নে-ক গল্প করা যাবে। সম্মতি দিলাম। স্টার্ট দেবার আগে আবার মুখ বাড়িয়ে স্মরণ করিয়ে দিল, আসবি কিন্তু। সাথি বন্ধুবর এতক্ষণে মওকা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কেমন করে এহেন

BanglaBook.org

মহাপুরুষের সাথে আমার পরিচয় হল? আমি একটু আশ্চর্য হয়ে পালটা প্রশ্ন করলাম—তার মানে তুমি ওকে চেন?

চিনব না? শহরের একজন নামাজাদা ব্যবসায়ী যে!

তাই নাকি? আমার বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গি দেখে বেচারা হেসেই ফেলল।

বন্ধুর বর্ণনায় বুঝলাম আসাদ এখন ব্যবসায়ী মহলে কেউকেটা। হয়তো সেই কারণেই বন্ধু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিল—কেমন করে আসাদ তিন তিনবার আই. এ. পরীক্ষায় নাকাল হয়ে ভবঘুরের আখড়ায় নাম লিখিয়েছিল।

এই মোলাকাতের পর পাঁচটি মাস কেটে গিয়েছে অসম্ভব হয়রানি আর কর্মব্যস্ততার মধ্যে। পেটের ধান্ধা তো আছেই। তার উপরে একটি সাপ্তাহিকের কাজ নিয়েছিলাম। কথা ছিল সম্পাদকের সহকারী হিসাবে কাজ করে। কিন্তু দেখা গেল পত্রিকার কোনো সহকারী সম্পাদকের প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন একজন ম্যানেজার-কাম (cum) প্রুফরিডার-কাম-লেখক-কাম-রিপোর্টার যাকে সম্পাদনা সম্পর্কেও জ্ঞান রাখতে হবে। অবস্থামাফিক গ্রাহকদের বাড়ি গিয়ে কাগজ পৌঁছিয়ে দিতে হবে, প্রাপ্য দামও আদায় করে আনতে হবে। এমনি ঝামেলার মধ্যে আসাদের কথা একরকম ভুলেই গিয়েছিলাম। এরই মধ্যে সম্পাদক সাহেব একদিন অফিসে ঢুকেই জানিয়ে দিলেন কিছু টাকা সংগ্রহ করতেই হবে, নচেৎ পত্রিকার আগামী সংখ্যা বের হতে পারবে না।

প্রয়োজনই মানুষের বড় তাগিদ। তাই একদিন দুপুরবেলায় চাঁদার খাতাটা বগলে নিয়ে আসাদের ঠিকানার উদ্দেশে রওনা হলাম।

যথানিয়মে দারোয়ানজির সেলাম নিয়ে প্রবেশ করতে বিশেষ বেগ পেতে হল না। দোতালার নাতিদীর্ঘ ঘরটির ব্যবস্থাপনা দেখেই বুঝলাম বৈঠকখানা হলেও এটা অপেক্ষাকৃত খাস, আম বৈঠকখানা একতলায়।

হাতে একটা Life ম্যাগাজিন তুলে দিয়ে বেয়ারা গেল সাহেবকে খবর দিতে। জানালার ধারে একটি চেয়ার টেনে ম্যাগাজিনের পাতায় মনোনিবেশ করার কথা ভাবছি এমন সময় হট্টগোল শুনে চোখ ফেরাতে হল বাইরের দিকে। দেখলাম—ছোট্ট রাস্তাটির ওপারেই কেরোসিন তেলের টিনের ছাউনি আর চট দিয়ে ঘেরা দশ-বারোটি খাপরা। খাপরাগুলোর দরজা রাস্তার দিকে আর পেছন দিকে একটুখানি ফাঁকা জমি খাপরাগুলোর সাথেই লাগোয়া। হট্টগোলের উৎপত্তিস্থল এর কোনো-একটি খাপরা। দোতালার জানালা থেকে সামনের খাপরাটির সবকিছুই চোখে পড়ে যায়, দড়ির খাটিয়ার নিচে ছড়ানো থালা-বাটি পর্যন্ত। খাটিয়ার উপর খুঁটির উপর ঘাঘরা-পরিহিতা একটি মেয়ে বসে আছে জড়োসড়ো। পেছনের ফাঁকা জায়গায় ভিড় জমেছে। মেয়ে পুরুষ, যুবা বৃদ্ধ আর কচি ছেলেমেয়ের জন্য কুড়ির রীতিমতো দল। সেই দল থেকেই নানা সুরে নানা গলার আওয়াজ ভেসে আসছে হট্টগোলের আকারে। তারই মাঝে এক জোয়ান অনর্গল চেঁচিয়ে চলছে। ঘাঘরার ভিতরে হস্ত নির্দেশ করে প্রতি কথায় তার নূতন

BanglaBook.org

নূতন অঙ্গভঙ্গির তালে স্বরের ওঠানামা। বোঝা গেল ভিতরের মেয়েটিই তার আক্রমণের কেন্দ্র। অন্য সাথিরা অত উত্তেজিত না হলেও বক্তব্য তাদেরও কম নেই।

তাই একের কথা অন্যের শোনার মতো ফুরসত কারো নেই। একমাত্র মেয়টিই দেখলাম নির্বাক। বস্তি-জীবনের মামুলি ঝগড়া, অতএব মিয়ামির সমুদ্রসৈকত সৌন্দর্য প্রতিযোগী এক মার্কিন তরুণীর উলঙ্গ ছবির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে দেহসৌষ্ঠবের বিচারে Critical চেষ্টা করলাম। কিন্তু খাপরাবাসিনীর চকিত আর্তনাদে আবার মাথা তুলতে হল। মেয়েটি এবার উঠে দাঁড়িয়েছে বিদ্রোহী ভঙ্গিতে।

ততোধিক ঝাঁজালো তার কণ্ঠস্বর, ঝড়-তুফানে বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত দাঁড়কাকের ছন্দহীন আওয়াজের মতো।

বাদানুবাদ দুর্বোধ্য হলেও মেয়েটির বক্তব্যের অর্থ মোটামুটি বোঝা গেল—তিন দিন যে উপোস করে ছিলাম তখন একটি দানাও মুখে তুলে দিয়েছিলে? আর এখন খুব বড় বড় বাত শোনাতে এসেছ। বাইরের জোয়ানকে উদ্দেশ করেই তার উক্তি।

এমন সময় দরজা ঠেলার শব্দে মুখ ঘুরিয়ে দেখলাম, আসাদ এগিয়ে আসছে একগাল হাসি নিয়ে। আমারই পাশে জানালার ধারে একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসল। হাঁটুতে এক ঠেলা মেরে প্রশ্ন করল—যাক এ্যদ্দিন পর তা হলে তোমার সময় হল? অপরাধীর দৃষ্টি নিয়ে তাকাই, বলি—সময় করে উঠতে পারিনি। আবার বুঝি নেমে পড়েছ?

আমার জিজ্ঞাসু-দৃষ্টির জবাবে নিজেই আবার বলতে থাকে—

তা ঠিকই করেছ। Your's is the only eight path. শালা দেশটা একেবারে জাহান্নামে গেছে। Corruption nepotism সমানে চলছে। যে-ডিপার্টমেন্টেই যাও, দেখবে মামা-ভাগনের রাজত্ব। কে কাকে কতটা ঠকাতে পারবে অহরহ তারই প্রতিযোগিতা চলছে। This must be stopped.

সে তো বুঝলাম। কিন্তু তোমরা কী করছ? জিজ্ঞেস করলাম।

আমরা? What do you mean by তোমরা? কোনোরকম পেট চালিয়ে নিতেই হিমশিম খেয়ে যাচ্ছি।

প্রসঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে জিজ্ঞেস করলাম—ব্যবসায় কেমন চলছে? কিসের ব্যবসায় করছ এখন?

একটুখানি হাসির আভাস দিয়ে আসাদ উত্তর দিল—আ-র ব্যবসায়! টুকটাক আরম্ভ করেছিলাম। এখন চলছে একেবারে যাকে বলে dull.

কথায় ছেদ পড়ল। খাপরার হট্টগোল এখন রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধে রূপান্তরিত হয়েছে। জোয়ানটি এবার দলবল নিয়ে ঢুকে পড়েছে খাপরার অভ্যন্তরে। মেয়েটির নাকের সামনে আঙুল নেড়ে বলছে—শালি রন্ডি কোথাকার! ঘরে বেগানা

BanglaBook.org

মরদ ডেকে দিনদুপুরে বেহায়াপানা করছিস আবার লম্বা লম্বা কথা। ভিড়ের ভিতর থেকে এক বৃদ্ধা ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে সামনে। মেয়েটির সবুজ উড়নির প্রান্ত ধরে টিপ্পনী কাটে—ওরে! এটা বুঝি নূতন নাগরের উপহার! মেয়েটি ঝটকা টানে গুটিয়ে নেয় উড়নি। ছুড়ে ফেলে বৃদ্ধার হাতখানি নর্দমায় ছুড়ে-মারা আবর্জনার মতো।

ইস্, মাগির দেমাক যে বেজায়! অন্য হাতখানি হাওয়ায় ঘোরাতে ঘোরাতে খেঁকিয়ে ওঠে বৃদ্ধ।

থামো নানি—তোমায় ফোড়ন দিতে হবে না। তোমার কেচ্ছা-কাহিনি এখনও কেউ ভুলে যায়নি—জবাব দেয় মেয়েটি।

ফোঁস মেরে ওঠে নানি। বুকে-জড়ানো শিথিল উড়নিখানা টান মেরে চিৎকার করে ওঠে—কী বললি খানকি মাগি, কী বললি? আমিও জানিয়ে রাখছি—ছেলের জোয়ান বউ আমার ঘরে। মেয়ে আমার সেয়ানা। এখানে বসে তোর ছেনালি চলবে না। এই আমার আখেরি কথা।

Nuisance, অসহ্য। আসাদের উত্তেজিত আওয়াজে মুখ ঘুরিয়ে নিই। বোলো না ভাই—শালা বিহারি রিফিউজিগুলোর জ্বালায় এ-মহল্লায় টেকাই দায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেমন নোংরা তেমনি চরিত্রহীন। ঝগড়াঝাঁটি, মারপিট তো লেগেই আছে। মেয়েগুলো হয়েছে সব বেশ্যা আর ছেলেগুলো পকেটমার। দমকা হাওয়ার মতো এক কিশোরী তন্বীর প্রবেশে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে আসাদ বিরক্তবোধ করে। কিশোরী ঘরের কোণে থাক থাক সাজানো ম্যাগাজিনের স্তূপ ঘাঁটতে থাকে। আমার মতো একজন অপরিচিতের উপস্থিতি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র উৎসুক্য না দেখিয়ে, কোনোপ্রকার অপ্রতিভতার পরিচয় না দিয়ে। মুসলমান মেয়েরা অন্তত দু-চারটি মেয়েও এতটা 'ফ্রি' হয়েছে ভেবে মনে-মনে খুশি হলাম, গর্বিত হলাম।

আসাদ ডাক দেয় কিশোরীকে—মিনা শুনে যা। তাড়াতাড়ি বলো, আমার সময় নেই। নিকটে এসে মিনা উত্তর দেয়। এরই ফাঁকে এক নজর দেখে নেয় আমার আপাদমস্তক। আমার হাতের ম্যাগাজিনটা টেনে নিয়ে বলে ওঠে—বাঃ, আপনি তো বেশ—এই ম্যাগাজিনটাই যে আমি খুঁজছি!

আমার দিকে ইশারা করে আসাদ বলে—চিনতে পারছিস একে?

মিনা কড়ে আঙুলের পালিশ-করা সরু নখটা দুপাটি দাঁতের মাঝখানটায় রেখে সেকেন্ডখানিক আমায় পর্যবেক্ষণ করে নেয়। তারপর মুখে একটুখানি হাসি ফুটিয়ে নিয়ে বলে—আমিন ভাই না?

ঠিক ধরেছিস।

কিন্তু আপনি না জেলে ছিলেন?

এতক্ষণে বুঝলাম পাঁচ বছর পূর্বের বালিকা আমিনা আজ কিশোরী মিনা। দাদার অবস্থার উন্নতির সাথে সাথে তারও মর্যাদা বেড়েছে। গুরুত্ব বেড়েছে। পরিবর্তিত অবস্থায় সেকেলে ধরনের নামটিও বর্জিত হয়েছে। বললাম—হুঁ,

BanglaBook.org

ছিলাম। তবে মুক্তি পেয়েছি কিছুদিন হল। কিন্তু তুমি অনেক বড় হয়ে গিয়েছ। চেনাই যায় না।

মিনা আমার কথা শুনতে পায়নি বা শুনলেও নূতন কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন এমনি ভাব করে আসাদের কাঁধে হাত রেখে বলে—বড়দা, কী বলছিলে বলো।

বলছিলাম—আজ সন্ধ্যায় কোথাও যাসনে।

কেন?

আজ রাত্রে তো কোরেশি সাহেব এখানে ডিনার খাবেন, তাই তোর থাকা দরকার।

না, সংক্ষিপ্ত উত্তর মিনার।

সে কী? থাকবি না কেন? উদ্বেগমিশ্রিত কণ্ঠ আসাদের।

মিনা নিরুত্তর। আসাদের সুপ্রসন্ন দৃষ্টি এড়িয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে হাতের পত্রিকাখানি।

Don't be silly, মিনা। বেচারাকে দাওয়াত করা হল অথচ তুই থাকবি না—এটা কেমন করে হয়? যতটা সম্ভব মোলায়েম করে কথাগুলো বলে আসাদ।

কিন্তু তোমার বেচারাটি বড্ড অভদ্র।—ঝড়ের গতিতে মিনা বেরিয়ে যায় ঘরময় কতগুলো শব্দতরঙ্গ তুলে।

দুপুরের সূর্য তখন অনেকখানি হেলে পড়েছে পশ্চিম আকাশে। একসারি রোদ্দুর এসে পড়েছিল মুখের উপর। জানালার ধার ছেড়ে এগিয়ে বসলাম। মিনার আকস্মিক প্রবেশ ও তেমনি আকস্মিক অন্তর্ধান কেমন যেন এলোমেলো করে দিয়েছে আলাপি আবহাওয়াকে। আসাদকে মনে হল একটু বিমর্ষ। আলাপের সূত্রটি পুনরুদ্ধার করার কথা ভাবতে গিয়ে নেহাত অবচেতন মনে পকেট থেকে বের করে নিই চাঁদার খাতাটি। বলি—দাও তো কিছু চাঁদা।

চাঁদার খাতটি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ উলটিয়ে পালটিয়ে দ্যাখে আসাদ। গভীর মনোযোগ দিয়ে পরখ করে সম্পাদকের বইটি। ছেঁড়া রসিদের নাম-ঠিকানাগুলো আস্তে আস্তে পড়ে চলে। আমার সকালবেলার বিপর্যস্ত সম্পাদক ভাইয়ের করুণ চাউনিটি ভেসে উঠল চোখের সামনে। যে-আশা ও সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলাম স্পষ্ট বুঝলাম তার ইতি হয়েছে। অতঃপর কোন কোন দুয়ারে ধরনা দেওয়া যায় মনে-মনে তার লিস্ট তৈরি করছি এমন সময় কলমের দুটি আঁচড় মেরে আসাদ খাতাটি ছুড়ে দেয় আমার কোলে। টেবিলের উপর পাঁচটি দশ টাকার নোট রেখে বলে, আপাতত এই দিলাম। যে-কোনো প্রগ্রেসিভ কাজে আমার সাহায্য, সমর্থন ও সহানুভূতি তোমরা পাবে। টাকাপয়সার যখনই প্রয়োজন পড়বে নিঃসংকোচে চাইবে।

সে তো বটেই, সে তো বটেই—আনন্দে ডগমগ হয়ে বললাম। ভাবলাম অগাধ ঐশ্বর্যের মালিক হয়েও আসাদের মনটি রয়েছে নিষ্কলুষ। আর এই মানসিক পরিচ্ছন্নতা ও ঔদার্যের স্বীকৃতি প্রকাশের ভাষা খুঁজছিলাম। দরজার বাইরে

BanglaBook.org

ধুপধাপ আওয়াজে মুখ তুলে দেখি মিনা অর্ধেকখানি মুখ এগিয়ে দিয়ে বলছে—আমি যাচ্ছি দাদা, যদি ফিরতে একটু দেরি হয় তবে তোমার কোরেশি সাহেবকে বসিয়ে রেখো।

তাড়াতাড়ি করিস কিন্তু। না হলে ভদ্রলোক বড্ড অপ্রস্তুত হবেন। ততক্ষণে মিনা সিঁড়ি ডিঙিয়ে প্রায় একতলায়। ভেসে আসে তার কণ্ঠস্বর—সে তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক সময় ফিরব।

কোনো সূত্র ধরেই আলাপ আর জমে না। দুএকটি মামুলি প্রশ্ন, সংক্ষিপ্ত হুঁ অথবা না তার জবাব। অনেকক্ষণ কেটে যায় চুপচাপ। আসাদ উঠে রেডিওর সুইচ টিপে দেয়, কোনো অখ্যাতনামা ওস্তাদের সেতারের মৃদু আলাপ ছড়িয়ে পড়ে ঘরময়। হাতের ম্যাগাজিনখানা কোলের উপর রেখে সংগীত-শ্রবণে মনোযোগ দেবার চেষ্টা করি।

বেয়ারার হাতে খাবার নিয়ে প্রবেশ করে বন্ধু-স্ত্রী। যথানিয়মে পরিচয় ও অভিবাদন বিনিময়ের পর নূতন কথা বলা বা আলাপ পাড়ার প্রচেষ্টা দুদিক থেকেই ব্যর্থ হয়। দেশি-বিদেশি কাঁচাপাকা নানা ধরনের নানা রঙের খাদ্যসামগ্রী। প্লেটগুলি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে আসাদ—Sorry! I can't give you company; আমি এ-সময় কোনোকিছু খাইনে। মোগলাই গন্ধে ভরপুর এতগুলো খাদ্যদ্রব্য সামনে রেখে বাক্যব্যয় বা বাক্যবিনিময় অর্থহীন। তবুও রসনা সংযত করে ভদ্রতার অস্বস্তিকর কায়দামাফিক অতি আস্তে আস্তে চামচের ডগায় খাবারগুলো একটুখানি নেড়েচেড়ে মুখে পুরতে আরম্ভ করছিলাম। বেশ কয়েক প্লেট নীরবে আহার করে গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশে যুতসই কিছু বলা নেহাত প্রয়োজন মনে করলাম। একটু ভেবেচিন্তে বললাম, বাঃ, ভাবিসাহেবের পাক তো ভারি চমৎকার! কথাটা শেষ হতে-না-হতেই হো হো করে হেসে উঠল আসাদ। বুঝলাম, বড্ড বেমানান কথা বলে ফেলেছি।

ও আবার পাক করতে জানে নাকি? টেনে টেনে বলে আসাদ। হাসি রাখলাম ব্যর্থ প্রচেষ্টায়। কর্ত্রীর তখন মুখ লাল, ঘর্মাক্ত। ঈষৎ উষ্ণ কণ্ঠেই জবাব দিলেন—নিজে আমি পাক কোনোদিন করিনি।

ঐকান্তিক ইচ্ছায় বললাম—সে তো নিশ্চয়ই! আপনি কেন পাক করতে যাবেন! গৃহকর্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর-একটু যোগ করে দিলাম—কিন্তু যা-ই বলুন পাক হয়েছে খাসা!

Direction নিশ্চয়ই আপনার, তা না হলে এমন পাক—

আমার কথার মাঝখানেই ভদ্রমহিলা তেমনি বিক্ষুব্ধ স্বরে বলে উঠলেন—আমাদের কাশ্মীরি বাবুর্চি রয়েছে যে!

বুঝলাম, প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে বোকামি করেছি আর তা শোধরাতে গিয়ে নাকালের একশেষ। দক্ষিণ হাতটির ক্ষিপ্রতা বাড়িয়ে দিলাম।

BanglaBook.org

একটি মোটরগাড়ি এসে থামল সদর ফটকের সামনে। আওয়াজ শুনেই জানালায় মুখ ঝুঁকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল আসাদ। Hallo Mr. Arif—come in, come in শাড়ির ভাঁজগুলো বিন্যস্ত করে নড়েচড়ে বসলেন মিসেস আসাদ।

পরিপাটি পোশাকে সজ্জিত সুদর্শন মি. আরিফ ঘরে ঢুকে মিসেস আসাদের সাথে করমর্দন করে তাঁরই পাশে আসন গ্রহণ করলেন। জ্বলন্ত সিগারেটটি আলতোভাবে ঠোঁটের কোণে রেখে খান দুই টাইপ-করা কাগজ এগিয়ে দিলেন আসাদের দিকে। বললেন—নিন আপনার সেই Licence। ওহ্, কম ঝামেলা পোহাতে হয়েছে? applicant ছিল সব জাঁদরেল জাঁদরেল লোক। তার উপর দুজন তো খাস মন্ত্রীসাহেবের সুপারিশ নিয়ে হাজির।

So kind of you Mr. Arif. গভীর কৃতজ্ঞতা বেজে ওঠে আসাদের কণ্ঠে। টাইপ-করা কাগজগুলো সযত্নে শার্টের পকেটে গুঁজে দাঁড়িয়ে বলে—চলুন ভিতরে গিয়ে বসা যাক।

প্রথমেই আসাদ, তার পিছে পিছেই মি. আরিফ ও মিসেস আসাদ বেরিয়ে গেলেন। আসাদ সিঁড়ি বেয়ে নেমে যায় নিচে, গ্যারেজের সামনে রাখা গাড়িটার ঢাকনি খুলে কলকব্জা নাড়াচাড়া করতে লেগে যায়। নিজেকে শুধু অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হল না, মনে হল অবাঞ্ছিত। ভাবলাম, টিপয় থেকে টাকাগুলো পকেটে নিয়ে এবার বিদায় হই। কিন্তু বেয়ারা এসে খবর দিল আসাদের মা আমায় ভিতরে ডাকছেন। অগত্যা ভিতরের দিকেই পা বাড়ালাম। ঘর থেকে বেরিয়েই আর-একটি তেকোনা ঘর, মাঝখানে একটি লম্বা টেবিল, চারপাশে অনেকগুলা চেয়ার সাজানো। মনে হল ডাইনিং রুম। ডাইনিং রুমের দরজা থেকে বেরিয়ে গিয়েছে একখানি সরু বারান্দা।

দেখলাম বারান্দাটি গিয়ে শেষ হয়েছে আর-একটি দরজার মুখে। সেই দরজাটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বেয়ারা সরে পড়ল। বারান্দার দুপাশে রয়েছে দুখানি প্রশস্ত ঘর। দরজায় দোল খাচ্ছে রেশমি ইতালীয় পর্দা। বারান্দায় পা রেখে দেখলাম সুপরিচ্ছন্ন দেয়ালের উভয় প্রান্তে এক হাত অন্তর অন্তর সাজানো রয়েছে ডজন দেড়েক বিদেশি চিত্র। খান দুই উলঙ্গ নারীচিত্র, কয়েকখানি ইউরোপীয় প্রাকৃতিক দৃশ্য, বাকিগুলি সবই জাপানি ও চৈনিক ছবি। ছবি বাছাই ও সাজানোর পরিপাটি স্পষ্টতই গৃহকর্তার শিল্পরসিক মনের পরিচয় বহন করছে। এক মুহূর্ত পূর্বে আসাদের প্রতি যে-বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়েছিল তা কেটে গেল। বরঞ্চ নিজেকেই বড্ড ছোট মনে হল। একটি চৈনিক উডকাট ভালো লাগল খুব। ছবিখানি নয়াচীনের গঠনমূলক কাজে নিযুক্ত কয়েকজন বলিষ্ঠ মেহনতকারীকে কেন্দ্র করে, তাদেরই শ্রম-প্রচেষ্টা ফুটিয়ে তুলেছে।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখলাম, লোভ সংবরণ করতে পারলাম না। তারই উলটোদিকের ছবিটা দেখতে গিয়ে দৃষ্টি গেল ঘুরে। ডান পাশের কামরার পর্দাটা গিয়েছে একপাশে খানিকটা সরে। সেই একটুখানি ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ল

BanglaBook.org

সোফায় হেলান দেওয়া মিসেস আসাদের বক্ষে রক্ষিত মি. আরিফের মুখের আধখানি। সামনের দিকে এগুতে গিয়ে পা উঠল না। ফিরে আসলাম বৈঠকখানায়। টেবিলে ছড়ানো নোটগুলোর পাশ থেকে চাঁদার বইটি পকেটে গুঁজে নেবে আসলাম নিচে। আসাদ তখনও গাড়ির কলকব্জা নিয়ে ব্যস্ত। রাস্তায় নেবে ঊর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চললাম। বেলা প্রায় শেষ। পাশের খাপরাগুলোর গোলমাল আজ থেমে গিয়েছে, সবই নিস্তব্ধ। হয়তো সারা দুপুরের একটানা ঝগড়ায় নিস্তেজ হয়ে মিইয়ে পড়েছে ক্লান্ত মানুষগুলো সূর্যের উত্তাপবিহীন আলোকরশ্মির মতোই।

১০ই ডিসেম্বর ১৯৫৪
চট্টগ্রাম কারাগার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

মহম্মদ দীনের গল্প

একটি বিরাট জাহাজে বোঝাই হয়ে সবাই যেন তীর্থদর্শনে চলেছি।

মানুষ তীর্থদর্শনে যায়। যারা যেতে পারে না টাকার অভাবে অথবা সাংসারিকতার চাপে তাদেরও মনের আকর্ষণটা থেকে যায় তীর্থের প্রতি। তীর্থ মানুষকে টানে চুম্বকের মতো।

পাপপুণ্যের প্রশ্নে যাদের মন দোল খায় তারা তীর্থধর্ম পালন করে পুণ্যার্জনের তাগিদে। মৃত্যুকে যারা ভয় পায় তাদের তীর্থদর্শনের উদ্যেশ্য হল পাপক্ষালন।

সাদামাটা সাধারণ মানুষ যারা জীবন-মৃত্যুর নিগূঢ় রহস্যের দার্শনিক ব্যাখ্যায় মাথা ঘামাবার মতো অবসর পায় না, তাদের তীর্থদর্শনটা নেহাত বিষয়বুদ্ধি প্রণোদিত। তাদের হল মানত করে তীর্থ করা। যেমন, পুরানো রোগ সারছে না, ব্যবসায় মন্দা যাচ্ছে অতএব আজমির শরিফে হযরত মঈনুদ্দিন চিশতির দরগায় ঘুরে এলাম। তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এদের সংখ্যাটাই বেশি।

তবু তীর্থযাত্রার আবেদন রয়েছে। সে-আবেদন মনের এবং দেহের। সে আবেদন শুধু ধর্মের নয়। পাপপুণ্যের প্রশ্নের বাইরে। লাভক্ষতির ঊর্ধ্বে তীর্থযাত্রার যে-ক্লেশ, দর্শনের যে-আনন্দ অভিজ্ঞতার বিচিত্র সঞ্চয়—সব মিলিয়ে তীর্থযাত্রী নরনারীর মনকে যে-উদার অনুভূতিতে সমৃদ্ধ করে তার আবেদন ব্যাপক। সংকীর্ণ গণ্ডির বাইরে জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত মহাভূমির আকর্ষণ পরিচিত পরিবেশের নরনারীকে তীর্থের দুর্গম পথে টেনে নামায়।

তাই পুণ্যস্থানের পুণ্যস্পর্শে পুণ্য সঞ্চয়ের জন্যেই যে মানুষ তীর্থে যায় এমন নয়। জাতীয় বীরদের স্মৃতিসৌধে দলে দলে মানুষ যায় এমন এক আত্মিক টানে যার সাথে ধর্মীয় অনুভূতির হয়তো অনেক মিল আছে। মানস-সরোবরের আকর্ষণের সাথে মানবমনের সৌন্দর্যপিপাসার আদৌ কোনো সম্পর্কে নেই এমন কথা জোর করে বলা যায় না। দিনের পর দিন তপ্ত মরুভূমি পাড়ি দেয় যে-ক্যারাভান কাবার পথে ক্লান্ত পদক্ষেপ টেনে টেনে তার সবটাই শুধু পাপপুণ্যের

BanglaBook.org

হিসবেনিকেশে যেমন গোনা যায় না তেমনি পিরামিডের আকর্ষণটাও যে তীর্থযাত্রার পবিত্র আকর্ষণ তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

যা পবিত্র তা-ই সুন্দর। দুয়েরই অনুভূতি মূলত একটি আত্মিক অনুভূতি। তীর্থের ফলাফল অপেক্ষা তীর্থদর্শনের অনুভূতিটাই বড়ো। সেই অনুভূতিটা পবিত্র আর সুন্দরের আত্মিক অনুভূতি।

আশ্চর্য! এই কয়েদখানার ঘৃণা-মলিন, নিষ্ঠুর পরিবেশও তেমনি এক পবিত্র অনুভূতির ছোঁয়া। এ কি আমাদের তীর্থদর্শন?

সন্ন্যাসী ফকিররা হামেশাই বলেন অমুক তীর্থ না দেখলে মানবজন্মই বৃথা। তাঁদের মতো অতিকথনের দোষ পরিহার করে আমি বলব এ-কারাতীর্থের পবিত্রতা যারা প্রত্যক্ষ দর্শনে দেহ মনে গ্রহণ করতে পারেনি তাদের জীবনে অনেক কিছুই বাকি রয়ে গিয়েছে। চোখ খুলে যারা এ-তীর্থ দর্শন করে গেছে তারা এক মহামূল্য অভিজ্ঞতার অধিকারী। যাঁরা মন খুলে বুঝতে চেয়েছেন তাঁদের কাছে এ এক সুপ্রাচীন সুমহান গ্রন্থ যা পড়ে শেষ করা যায় না। আবার যাঁরা বিশেষভাবে ভাবেন তাঁরা তো গোর্কির মতোই একে বিশ্ববিদ্যালয় মনে করেন, পূর্ববঙ্গের পদ্মা মেঘনার দুরন্ত কোলে যাদের জন্ম সেই ছেলেদের কাছে এটা সত্যিকারের তীর্থভূমি। কথায় বলে, হাজিদের মধ্যেই পাজি বেশি আর বারাণসীতেই চোরের আখড়া। তেমনি আমাদের এ-তীর্থেও মন্দ-ভালো পাপ-পুণ্য সবই আছে। কিন্তু পার্থক্যটা হল এ-তীর্থে কেউ স্বইচ্ছায় অথবা পবিত্র ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত হয়ে আসে না। এখানে মানুষকে আনা হয়। এনে তীর্থদর্শনের পুণ্য সঞ্চয়ে বাধ্য করা হয়। চোর-ডাকাতের মতো পাপীদের সংখ্যাই এখানে বেশি।

পুণ্য অর্জনের কোনো মহা উদ্দেশ্যে অথবা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে তারা আসে না। তারা যেন আসে পেনাল কোড অনুসারে পাপের দন্ড পরিশোধ করতে। কেউ আসে সঞ্চিত পুণ্যের মাশুল দিতে। আর কেউ আসে সে-অসম্ভবের সন্ধানে যা মানুষকে ঘরছাড়া করে।

এ-তীর্থভূমিতে কোনো বিশেষ পর্ব নেই, বিশেষ ক্ষণ নেই। এখানে অবিরত আসা-যাওয়া চলছে। পাপপুণ্য ন্যায়-অন্যায়ের লীলাখেলা এখানকার নিত্য মুহূর্তের ব্যাপার। এখানে আগমন যতটা নিজের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না, নির্গমনটা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভর করে অন্যের ইচ্ছার উপর। 'দর্শন' শেষ হলে এখানে এক মুহূর্তও বিলম্ব করা যাবে না কিন্তু 'দর্শন' পুরাপুরি সম্পন্ন না করে এখান থেকে ফিরে যাওয়ার কোনো পথ নেই। এ-তীর্থের আচার-বিচার নিয়ম-বিধি বড় কঠিন আর বিচিত্র। এখানকার পান্ডা-মুফতিরা কপালে তিলক এঁকে অথবা পাগড়ি বেঁধে আলখাল্লা গায়ে দিয়ে দরুদ পড়ে না। এখানকার পান্ডারা বুট-পট্টি এঁটে হ্যাট-মাথায় কড়া হুকুমদারি করে বেড়ায়।

আবার এই কারাতীর্থের পুণ্যপিপাসুরা বিভিন্ন ধর্মের—জীবের বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষিত-অশিক্ষিত ধনী-নির্ধন। তারা সবাই এখানে নিক্ষিপ্ত হয়েছে পাপক্ষালনের উদ্দেশ্যে।

BanglaBook.org

মোহাম্মদ দীন কেমন করে এখানে এসে পড়েছে নিজেও বুঝতে পারেনি। কোন কূটিল চক্রান্ত তিন বছর পূর্বে তাকে এখানে ঠেলে দিয়েছে আজও সে তার কোনো হদিস পেল না।

স্বল্পভাষী মোহাম্মদ দীন। বাঁশির মতো খাড়া নাক। উজ্জ্বল গৌরব তনু। নাতিদীর্ঘ দেহটি শক্তির অধিকারী, লেখাপড়া বিশেষ না জানলেও তার কথাবার্তায়, চালচলনে, আদব-লেহাজের এতটুকু ত্রুটি নেই। কথা যখন বলে এমনভাবে বলে যে দুহাত দূরের লোকটিও তা শুনতে পায় না। ত্রস্তপদে যখন সে চলে তখনও তার পায়ের শব্দ পাওয়া যায় না। চায়ের কাপে চিনি দিয়ে যখন সে চামচের নাড়া দেয় তাতে টুং টাং শব্দটি পর্যন্ত হয় না।

মোহাম্মদ দীন ডাকাত। এখন সে ডাকাতের প্রায়শ্চিত্ত করছে আমাদের ফাই-ফরমায়েশ খেটে।

যে-লোকটির মুখে মার্জিত আভিজাত্যের ছাপ, সদা স্মার্ট, যার আদব-কায়দার শিক্ষা এত নিখুঁত সে কেমন করে ডাকাতিটা করল ভাবতেও অবাক লাগে।

ভারতের উত্তরপ্রদেশে গোরক্ষপুর জিলা। সেই গোরক্ষপুরেরই এক সমৃদ্ধ কৃষক মোহাম্মদ দীন। তার জমি ছিল ধূসর প্রান্তর জুড়ে।

নিজের হাল ছিল দুটি। ছিল দুজোড়া বহিস (মেষ) আর দুধের গরু। বৃদ্ধ পিতা আর ডজনখানেক ভাইবোন নিয়ে ওদের সংসার মোটামুটি ভালোভাবেই কেটে যেত। খাওয়া-পরার অন্তত ভাবনা ছিল না এটা মোহাম্মদ দীনের স্বাস্থ্যের গাঁথুনি আর জৌলুসের দিকে তাকালেই বোঝা যায়।

ঘরকন্নার কাজে সে অভ্যস্ত নয়। তবু মুখ বুজে সে হুকুমমাফিক কাজ করে যায়। মশলা বাটা হোক আর কাপড় কাচা হোক, কোনো কাজেই তার গাফিলতি নেই। কোনো হুকুমেই তার না নেই। এমন সুবোধ ফাল্তু আমরা কদাচিত পাই। তাই অল্পদিনেই তার উপর বেশ মায়া বসে গিয়েছে। কিন্তু মুশকিল বেধেছে তার স্বভাবটা নিয়ে। খোঁচা দিয়ে এমনকি ধমক দিয়েও তার মুখ থেকে কোনো কথা গত চার মাসে বের করা গেল না। হুঁ, হাঁ, না-এর বেশি কোনো শব্দ তার যেন জানা নেই। উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে অনেকদিন বেশ রাশভারী গলায় বলেছি, 'তুমি পাক্কা ডাকাত না হলে এমন চুপচাপ থাক কেন?' উত্তরে মোহাম্মদ দীন ঠোঁট উলটিয়ে উপেক্ষা আর করুণা-মেশানো এমন এক টুকরো হাসি টেনে আনত যে অপর কোনো প্রশ্ন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়তো। কিন্তু মুখ ফিরিয়ে চলে যেতেই আমি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে প্রায় চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে বলতাম, 'সত্যি তুমি ডাকাত।' ঘাড় ফিরিয়ে সে তার বিস্ফারিত চোখের আগুন বর্ষণ করত আমার উপর। যদি সে ভস্মদেব হত তবে আমি সেই চোখের অনলবর্ষণে যে ছাই হয়ে যেতাম তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

BanglaBook.org

মনে-মনে আমি একটু চটেও উঠেছিলাম। আমার একটি গোপন বাসনা ছিল মোহাম্মদ দীনের সাথে আলাপচারি করে প্রায়-ভুলে-যাওয়া উর্দু ভাষার প্রাথমিক বোলগুলি যদি আবার রপ্ত করে নিতে পারতাম, কিন্তু দীন সাহেব মুখই খোলেন না, আলাপ তো দুরের কথা।

দৈনিক আমরা পাঁচবার চা খাই। এর মধ্যে সপ্তাহে দুদিন চিঠি লেখার রাত্রি। সে-দুদিন রাত্রে খাওয়ার পর চা। তা ছাড়া স্পেশাল অর্থাৎ বাড়তি এক-আধবার প্রায়ই চলে। প্রতিবার চায়ের কাপটি নিয়ে মোহাম্মদ দীন টেবিলের পাশে এসে দাঁড়ায়। আর প্রতিবারই আমি তাকে দেখতে পাইনি এমন ভাব করে হয় বসে থাকি, নয় শুয়ে থাকি। ইচ্ছা দীন সাহেব মুখ খুলে বলুক 'চা পিজিয়ে' অথবা ঐ ধরনের কিছু। কিন্তু গত চার মাস ধরে প্রতিবারই জনাব আমায় নিরাশ করেছে। আমি মুখ ঘুরিয়ে থাকলে জনাব চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবে। বড়জোর চামচের ঠুং ঠাং আওয়াজ করবে তবু কথা বলবে না। ঠাণ্ডা চায়ের জিল্লতি থেকে বাঁচার জন্য অবশেষে আমাকেই মুখ ফেরাতে হয়েছে। আমার এই অপমানটি যেন তার নজরেই পড়েনি এমন একটি নির্বিকার ভাব করে এক চামচ ফালতু চিনি রেখে চলে যেত। যদি বলেছি 'শুকরিয়া' ফিক করে হেসে দিয়েছে। নেহায়েত পেটের অসুখে ঘায়েল না হলে প্রতিবারই দুকাপ চা নেওয়া আমার অভ্যেস। জনাব দীন সেটা প্রথম দিনেই টের পেয়ে গিয়েছিল।

দ্বিতীয় দিন ডেকে জিজ্ঞেস করার অপেক্ষা না করেই আমার অর্ধসমাপ্ত অথবা খালি কাপটা পুনর্বার ভর্তি করে দিয়ে যেত। এমন নির্লিপ্ত দায়িত্ব পালনে কখনও খিটমিটিয়ে উঠতাম। 'কেঁউ পুছতা নেহি। নেহি পিয়েগা, লে যাও।' বলে নিজেই বিপদে পড়েছি একাধিক বার, কেননা তারপর সেই এক কাপেই তুষ্ট হতে হত যতক্ষণ না মোহাম্মদ দীনকে ডেকে ঝগড়াটা মিটিয়ে নিতাম। তবু প্রায় খিঁচিয়ে উঠতাম—'কেয়া তোম বোবা হ্যায়? বাত কেঁউ নেহি করতা, তোম ডাকু হ্যায়।' অনলবর্ষী দৃষ্টিতে আমায় দগ্ধ করে জনাব দীন নিরুত্তম দৃষ্টিতে অদৃশ্য হয়ে যেত।

এহেন মোহাম্মদ দীন হঠাৎ মুখর হয়েছে কাল দুপুর থেকে। কথায় খই ফুটছে তার মুখে অনর্গল, বক বক করে চলেছে সে। গত চার মাসের নীরবতার জন্য যত বকুনি খেয়েছে আজ একদিনেই যেন সে তা সুদে-আসলে শোধ করে দেবে।

কাল দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে নিয়মমাফিক দিবানিদ্রার আয়োজন করছি ঠিক তক্ষুনি অবিশ্বাস্য ঘটনাটি অনুষ্ঠিত হয়।

অন্যদিনকার মতো কুণ্ঠিত পদক্ষেপ নয়। খাটিয়ার পাশ-ঘেঁষে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকা নয়। সোজা এসে মোহাম্মদ দীন আমার মুখের উপর একটি পূর্ণ বাক্য ছুড়ে মারলে। বাক্যটি হচ্ছে, 'মেহেরবানি করকে মেরা টিকেট দেখিয়ে।' রীতিমতো মিষ্টি, এমনকি মেয়েলি কণ্ঠস্বর। হাঁ করে তাকিয়ে ছিলাম তার দিকে। গত চার মাসে যা সম্ভব হয়নি কোন মন্ত্রে তা সম্ভব হল! কোনোরকম ভনিতা না

BanglaBook.org

করে দীন সাহেব টিকেটটা গুঁজে দিলে আমার হাতে। আর তখন থেকেই অবিশ্রাম কথার তুফান তুলে চলেছে।

আজ মোহাম্মদ দীন খালাস পাচ্ছে। তার দন্ডের মেয়াদ ফুরাতে আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা বাকি। সন্ধ্যা হওয়ার পূর্বেই তাকে কারাগার থেকে বের করে দিতে হবে।

আসন্ন মুক্তির রঙিন মুহূর্তের কল্পনাই কি মোহাম্মদ দীনকে এমন কথামুখর করে তুলেছে? দীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয়ামিলনের মধু-সম্ভাবনায় সে কি কথার রাজ্যে সম্বিৎহারা?

অথবা মুক্তিমুহূর্তে চঞ্চল হৃৎপিণ্ডে তড়িৎপ্রবাহ রুদ্ধ করার ক্ষীণ প্রচেষ্টা?

কিন্তু কোনোটাই সত্য নয়।

অপূর্ব মধুর কোনো ছবি দীন মোহাম্মদের চোখে নেই। মুক্তির পর উজ্জ্বল কোনো ভবিষ্যতের কল্পনাও সে করছে না। তার সমস্ত কথাগুলোর যোগফল যা দাঁড়ায় তা হচ্ছে 'দুনিয়া ঝুটা হ্যায়'। এই মুহূর্তে বাইরে গিয়ে সে কী করবে তা নিয়ে তার মাথাব্যথা নেই—মুক্তির মুহূর্তে তার মন অতীতমুখী। স্মৃতির পর্দাটা পরতে পরতে সে মেলে ধরেছে আমার সম্মুখে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সেই অনলবর্ষী চোখ তুলে ধরেছে, যেন বলছে—কী, আমি কথা বলি না? এখন মজাটি টের পাচ্ছ তো?

সাতচল্লিশের কোনো-এক অন্ধকার রাত্রে মোহাম্মদ দীন গোরক্ষপুরের রুক্ষমাটির মায়া ছেড়েছিল আর-এক মায়ার টানে। পিতামাতাকে ঘুমের কোলে রেখে চুপিসারে গভীর রাত্রে সে বেরিয়ে পড়েছিল হিজরত করবে বলে। এসে মিশে গিয়েছিল সেই ক্যারাভানের সাথে যা মধ্যভারত আর পূর্বভারতের আর জনপদে ধূলির ঝড় তুলে রওনা হয়েছিল গঙ্গার পূর্ব প্রান্তের শস্য-শ্যামল পানিকা মল্লুকের উদ্দেশে। বিশ বছরের নওজোয়ান মোহাম্মদ দীন। পকেটে পয়সা না থাকলেও দেহে অফুরন্ত শক্তি আর মনে প্রচুর বল। খুলনায় একটি চাকরিও পেয়ে গেল ঝটপট। এদিক-সেদিক মুখ-বদল করে শেষে খুলনায়ই এক পাটকলে আধা দক্ষ শ্রমিকের একটি ভালো কাজ পাকাপাকিভাবেই বাগিয়ে নিয়েছিল। এই ভালো চাকরিটি পেয়ে মোহাম্মদ দীন বিয়েও করে ফেলল। বিহারের কোনো-এক মোহাজের পরিবারের দ্বাদশ বর্ষিয়া লাজুক বালিকাটিকে ঘরে তুলে আনবার জন্যে গোরক্ষপুর থেকে তার বৃদ্ধা মাতা অনেক তকলিফ স্বীকার করেও সেদিন স্বয়ং উপস্থিত হয়েছিলেন। আশীর্বাদ করে মা ফিরে গিয়েছিলেন দেশে।

কারখানার কলওয়ালা বাতি-লাগানো একটি ছাদ-নিচু ঘরের মধ্যে তারা দুজনে পৃথিবীর সমস্ত আনন্দকেই বন্দি করেছিল। মোহাম্মদ দীন তার সুখী দাম্পত্য জীবনের চিত্র এঁকে যায়। তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাটিও বাদ দিতে সে নারাজ।

কিন্তু সুখের সংসারে শনির দৃষ্টি পড়লে। সে যাকে বিয়ে করেছিল তার ভাইগুলো ছিল বদ প্রকৃতির। তারা বোনকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আজ দুটো টাকা কাল

BanglaBook.org

একটি রুটি এমনি করে ঘরের জিনিসপত্র নিয়েও টান দিলে। তা নিয়ে বিবি আর শ্বশুরকুলের সাথে বিবাদটা শুরু হল। এরই মধ্যে ওই বদ শালাদের ততোধিক বদ এক বন্ধুর নজর পড়ল তার বিবির দিকে। সময় অসময় যখন সে থাকত কারখানায় তখন এসে তারা বিবিকে দিক করত। টাকার লোভে শ্বশুরকুল সেই বদমায়েশটাকে সহায়তা করত। কিন্তু শক্ত সমর্থ সাহসী লোক মোহাম্মদ দীন। তার উপর সে কারখানার ফিটার। তল্লাটজুড়ে তার মানসম্ভ্রম। সে সুযোগ পেলেই আচ্ছা করে পিটিয়ে দিত শালা দুটিকে আর তাদের ঐ বদমায়েশ বন্ধুটিকে।

কিন্তু যেখানে সাহস শক্তি বা মান কোনো কাজে লাগে না সেই কূটচক্রের কাছে অবশেষে দীনকে হার মানতে হল।

সেদিন ছিল ছুটির বার। সারাদিন আলস্য উপভোগে কাটিয়ে বিকেলে বেড়াতে গিয়েছিল বন্দরের দিকে। বন্দরে গিয়ে পুরনো পরিচিত দেশওয়ালি ভাইদের সাথে কিছুটা মউজে মেতে গিয়ে বেশ রাত করে ফ্যালে। অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরে না-খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ে। ভোরবেলায় পুলিশ গিয়ে তাকে ধরে নিয়ে আসে। সেই যে এল আজ তিন বছর রয়েই গেল। অথচ আজ এই মুহূর্ত পর্যন্ত তার প্রশ্ন—কেন সে এখানে এল?

ঠিক কী ঘটেছিল তা সে জানে না। তবে যা সে শুনেছে এবং যেজন্য তার বিচার হল, শাস্তি হল সেটা প্রতি অক্ষরই সে মনে গেঁথে রেখেছে। যে-রাত্রে সে বন্দর-অভিসারে বেরিয়েছিল সেদিনই বন্দরের পথে ডাকাতি হয়। সেই ডাকাতিতে জড়িয়ে পড়ে তার দুই শ্যালক। শ্যালকদের সাথে তাকেও ধরে আনে।

দুবছর ধরে বিচার চলে। বিচারে তার শ্যালকরা খালাস পেয়ে যায় আর সে দুবছর হাজত খেটে আর এক বছরের দন্ড নিয়ে জেলা থেকে কেন্দ্রীয় কারাগারে চলে আসে। মোহাম্মদ দীনের দৃঢ় বিশ্বাস, ব্যাপারটা তার শ্যালকপ্রবর আর ওই বদমায়েশটার কারসাজি। তা না হলে ওরা পরদিনই জামিন পায়, খালাসও হয় আর তার কিনা জেল? দুবছর হাজতে পচে এক বছর জেল।

এতদিনের নির্বাক দীন আজ কথার তোড়ে ফেটে পড়ে।

ইয়ে কেয়াসা জুলুম—দো বরস হাজতমে, আওর এক বরস সাজা? হাম ইয়ে মুলুকমে নেহি রহেগা।

দুঃখ তার কারাযন্ত্রণার জন্য নয়। দুঃখ তার অবিচারের জুলুমের জন্য।

স্বল্পভাষী দীন এত রোষ বেদনা পুষে রেখেছিল তার অন্তরে!

আশ্বাস দিয়ে বললাম, দুই কেন, তিন বছর হাজত খেটে ছয় মাস সাজার দৃষ্টান্তও আছে ভূরিভূরি। সব ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। তবে তাকে পাকিস্তান ছাড়লে চলবে না। তাকে এদেশেই থাকতে হবে।

সেই অনলবর্ষী দৃষ্টি, ঠোঁট উলটিয়ে অবজ্ঞা-করুণা-মিশ্রিত সেই ফ্যাকাশে হাসি যার অর্থ 'তুমি একটা আস্ত উজবুক।'

BanglaBook.org

আদৌ না দমে আমি সোজাসুজি তার দেশপ্রেমের প্রতি আবেদন করে বসি। দ্যাখো, আমাদের দেশে দক্ষ কারিগরের বড় অভাব, তোমার মতো অভিজ্ঞ শ্রমিক আমাদের কয়টি আছে?

পাটকলের ফিটার মোহাম্মদ দীন হয়তো এর আগেও অমন সস্তা বক্তৃতা প্রচুর শুনেছে। শুনেছে খুলনায়, শুনেছে গোরক্ষপুরে। তাই ওতে তার ভাবের ব্যতিক্রম হয় না। সোজা জবাব দিয়ে বসে—'হাম গাঁওমে চলে যায় গা।'

চলে যে যাবে তাকে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখা যাবে?

কিন্তু এক মহা অন্যায়বোধে নিজের মনে পীড়ন অনুভব করলাম। গোরক্ষপুরের তরুণ মোজাহিদ মোহাম্মদ দীন কী পেল এই তীর্থস্থান থেকে? বিশ বছরের তরুণ যে-স্বপ্নের হাতছানিতে ঘর ছেড়েছিল তার স্বপ্ন কে বা কারা এমন নিষ্ঠুর আঘাতে ভেঙে দিল? তার জীবনের এই তীর্থযাত্রা কি বিফল হল?

আর-একটি কথা জিজ্ঞেস করি-করি করেও সংকোচে থেমে যাই। দীন কয়েদির পোশাক ছেড়ে নিজের ছককাটা লুঙ্গি আর রঙিন পপলিনের শার্ট পরে নেয়। মাথায় বসিয়ে দেয় জিন্নাহ্ টুপি। একটি রুমালও তার ছিল। তিন বছরের ধুলাবালি আর ইঁদুরের চুম্বনে শতছিদ্র। তবুও যত্নের সাথেই তা স্থান পায় দীনের বুকপকেটে। মাঝে মাঝে সেটা বের করে মুখ মুছে সে বহুদিনের অভ্যস্ত কায়দায়।

কিন্তু আমার প্রশ্নটি করা হয় না। দীন জুতো পরে নেয়। এর ওর সাথে হাত মিলিয়ে বিদায়। এসে পড়ে আমার কাছে, যথারীতি হাত মিলিয়ে চলেও যায়। তবু কথাটা জিজ্ঞেস করার সাহস পাই না। গেট পর্যন্ত তার সাথে এগিয়ে চলি। দীন মুখ ফিরিয়ে শেষ-বিদায়ের জন্য চোখ তোলে। কোথায় সেই অনল দৃষ্টি; ছলছল চোখ। তা হলে দীনের মায়া বসে গিয়েছিল আমাদের উপর? ঠাস করে প্রশ্নটি ছেড়ে দি।

তোমহারা বিবি কাঁহা হ্যায়?

দীন তখন কয়েক কদম দূরে এগিয়ে গিয়েছে। চোখ তখনও ফেরানো আমাদের দিকে। হঠাৎ আমার প্রশ্নে চোখ নামিয়ে নেয়। যেন স্বগতোক্তি করল এমনভাবে কথাটি পৌঁছল আমার কানে:

'ওন্ বদমায়েশনে উনকো খরিদ লিয়া অওর শাদি কর লিয়া।'

তীর্থশেষে মোহাম্মদ দীন কি সত্যি মুক্তি পেল?

কী নিয়ে গেল সে এখান থেকে? ভীতি অবিশ্বাস আর বিদ্বেষ ছাড়া!

১০ মার্চ ১৯৫৯
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

BanglaBook.org

জোবেদ আলির গল্প

সত্যি সত্যি কি এটা তীর্থ?

অপরাধী যারা পাপী যারা তীর্থাবসানে তাদের পাপক্ষালন হয় কি? অথবা অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত? রোগ-শোক-তাপে দগ্ধ হয়ে শুধু শান্তির জন্য এখানে কেউ আসে কি? হয়তো আসে না। অন্তত উন্মাদ ছাড়া কেন এখানে ব্যাধিজরা শোক-তাপ নিবারণের জন্য আমার কথা ভাবতে পারে না। তার জন্য উৎকৃষ্টতর ও স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব নেই পৃথিবীতে।

কিন্তু উন্মাদ নয়। খুনিও নয়। স্বভাব-অপরাধী বলতে যা বোঝায় জোবেদ আলি সে-ধরনের লোকও নয়। অথচ আজ পঁচিশ বছর ধরে সে জেলের বাসিন্দা কেন? জিজ্ঞেস করলে জোবেদ আলি শাঁ করে জবাব দেবে, বাইরে তার ভালো লাগে না। বাইরে বড় ঝামেলা, ঝগড়াঝাঁটি হানাহানি, মারামারি কাটাকাটি। এক কথায় বাইরের পৃথিবীটা জঘন্য। বড় অশান্তি সেখানে। এই কয়েদখানাতেই পরমতম শান্তি, এখানেই সে আরাম পায়, আনন্দ পায়। তাই গিয়েও সে আবার চলে আসে। গত পঁচিশ বছরে সে ছয়বার ছাড়া পেয়েছিল। কিন্তু কোনো বারই এক-দু মাসের বেশি সে বাইরে থাকেনি। আবার চলে এসেছে অথবা আসতে বাধ্য হয়েছে। সে বলে—নিজেই চলে এসেছে। না এসেও যে পারত জোর দিয়েই কথাটা বোঝাবে সে। যে-কোনো সুস্থ লোক বলবে—এ হচ্ছে বিকৃত মানসিকতা অথবা জটিল স্নায়বিক ব্যাধি। বিষয়টা যে একান্তভাবেই তার মনের ক্রিয়াপদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট তাতে সন্দেহ করার অবকাশ নেই। কিন্তু এটা বিকার—অসুস্থ মানসিকতা আজও নিঃশংসয়ে বলতে পারি না।

জোবেদ আলির সাথে প্রথম দেখা হয়েছিল এই জেলে ১৯৫২ সালে, যখন আবদ্ধ ছিলাম সেলে। সে ছিল আমার 'ফালতু'। পরের বার দেখা হয়েছিল ১৯৫৬ সালে হাসপাতালে। সেখানেও সে 'ফালতু'। তৃতীয় বার ১৯৫৮ সালে। এবার তার পদোন্নতি হয়েছে। এখন সে সিকিউরিটি ইয়ার্ডের পাহারাদার।

BanglaBook.org

জোবেদ আলি চোর। সে নিজেও স্বীকার করে তার চৌর্যবৃত্তির কথা। প্রথম অভিজ্ঞতা যতই অমানুষিক, হৃদয়হীনতার পরিচায়ক বলে বিবেচিত হোক-না কেন, জোবেদ আলি সে-অভিজ্ঞতা স্মরণ করে প্রথম অ্যাডভেঞ্চারের রোমাঞ্চমিশ্রিত মাদকতা দিয়ে।

সময়টা ছিল দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বে মন্দার কাল। নারায়ণগঞ্জের কোনো-এক পাটের গুদামে ঠিকা কুলির চাকরিটা জোবেদ আলি হারিয়েছে। পাটের কেনাবেচা বন্ধ। জোবেদ আলির কাজও বন্ধ, যতদিন গুদামের তালা খোলা ছিল ততদিন পাটবাবুদের কাছ থেকে এক-আধ পয়সা চেয়ে চুয়ে ছোলাভাজা খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যেদিন গুদামে তালা পড়ল সেদিন এক মুঠ ছোলাভাজা পাওয়ার আশাও তিরোহিত হল। শুধু পানি খেয়ে কাটল তিন দিন। চতুর্থ দিনটা বন্দর ছেড়ে জোবেদ আলি চাষাড়া বাজারের এক কলের দোকানের সামনে বসে বসে কাটিয়ে দেয়। বিকেল নাগাদ এক ঝুড়ি পচা কলা আর পচা ছোবড়া উদরস্থ করে ফের রওনা দেয় বন্দরের দিকে। পদার্থ যা-ই হোক ভরাপেটের আনন্দে জোবেদ আলি নিজেকে অবিশ্বাস্য রকমের হালকা আর খুশি দেখতে পায় অনেকদিন পর। রাস্তা থেকে একটা পোড়া বিড়ির গোড়া কুড়িয়ে দুটান মেরে রেললাইনের উপর অনেকক্ষণ বসে থাকতে তার বেশ স্ফূর্তিই লাগছিল। আর ইচ্ছে করছিল একটা-কিছু করতে। এমন একটা-কিছু যাতে হাতের পেশিগুলো আবার শ্রমদীপ্ত নিশ্বাসের টানে টানে ফুলে উঠবে, পয়সাও আসবে। কিন্তু কোথায় কাজ? বেকার ভিক্ষুকের ভিড়ে এই ছোট্ট বন্দরের জনাকীর্ণ রাস্তা দিয়ে ঠেলাঠেলি করে চলতে জোবেদ আলিরই ঘেন্না ধরে। আবেদ আলীর সঙ্গী-কুলিদের অনেকেই ছাঁটাই পেয়ে অন্য খাতায় নাম লিখিয়েছে। শহরে আশেপাশের গ্রামে বেশ কয়েকটি লুট আর ডাকাতি হয়ে গিয়েছে। জোবেদ আলি সেখানেও কপাল পরীক্ষা করেছে। কিন্তু সফল হয়নি। সেখানেও নাকি ভিড়, নূতন লোক নেওয়া বন্ধ। তার উপর তারা আনাড়ি জোবেদ আলিকে ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে না। অথচ জোবেদ আলি ভেবে দেখলে, এপথে একলা কিছু করারও উপায় নেই। সাহস দুঃসাহসের কথা নয়। নেহাত কর্মসমাধার জন্যই সাথী চাই। অনেকক্ষণ জোবেদ আলি ভাবলে। এ ছাড়া দুটো পয়সা উপার্জন করার অন্য কী কী উপায় আছে? কতক্ষণ এভাবে ভেবেছিল সেটা স্মরণ করতে পারে না। শুধু মনে আছে সে চমকে উঠেছিল কী-একটা দেখে। কতগুলো চলমান মানুষের অস্পষ্ট ছবি, কাফেলার মতো আঁকাবাঁকা। একটি নাতি-গম্ভীর আওয়াজ :

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহো মোহাম্মদুর রসুলুল্লাহ্। নির্জন প্রান্তরে কেঁপে কেঁপে আসা কান্নার মতো তার কানে বাজে।

ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে আসে ছবিটা। একটি শব-শোভাযাত্রা। মৃতদেহটি কাঁধে নিয়ে দশ-বারোটি লোক রেললাইন ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যায় জোবেদ আলির চোখের সামনে দিয়ে বাঁপাশের রাস্তা ধরে। ঝিঁঝি-ধরা মাথায় জোবেদ

BanglaBook.org

আলি হঠাৎ কিসের এক তীব্র ঝাঁকানি খেয়ে উঠে দাঁড়ায়। কোনোকিছু ভাবার মতো যখন তার মনের অবস্থা তখন দ্যাখে সেও চলেছে মৃতের পিছনে পিছনে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্...' তারও মুখ থেকে অচেতনভাবে বেরিয়ে আসছে। তারাভরা আকাশের ফিকে আলোয় ওরা কবর দেয় মৃতদেহটিকে। জোবেদ আলিও মাটির ঢেলা তুলে তুলে কবরের গর্ত পূরণ করতে সাহায্য করে। মৃতের আত্মীয়দের দাফন শেষ করে সবাই যখন দাঁড়িয়ে মৃতের আত্মার মাগফেরাত চায় জোবেদ আলিও যোগ দেয় সে-প্রার্থনায়। একান্ত শোকাভিভূত আত্মীয়ের মতো শেষকৃত্য সমাপনান্তে আত্মীয়েরা চলে যায় যে যার গৃহের পথে। শুধু যায় না একজন—জোবেদ আলি। কবরস্থানের লাগোয়া উঁচু রাস্তার ঘাস-বিছানো কিনারায় বসে সে তার এই অদ্ভুত আচরণের যুক্তিসংগত কারণ খুঁজতে থাকে। খুঁজতে থাকে এই অবিশ্বাস্য পাগলামির অথবা হঠাৎ-জানা ধর্মপ্রবণতার কোনো বোধগম্য অর্থ। অর্থ খুঁজতে গিয়ে সে হারিয়ে ফেলে ঘটনার যোগসূত্র। মৃত ব্যক্তি কে? জোবেদ আলির সাথে কীই-বা তার সম্পর্ক? সে এলই-বা কেমন করে এই কবরস্থানে? জোবেদ আলির মনে পড়ে সে কর্মচ্যুত বেকার কুলি। চার দিন ধরে প্রায় উপবাসী। মাথার শিরায় সকালে সেই বোবা ব্যথা আবার টনটন করে উঠে। পচা কলার সোঁদা গন্ধভরা একটা টক ঢেকুর গলা দিয়ে উঠে আসে। টক পানিতে মুখটা ভরে যায়। সেইসাথে উঠে আসতে চায় ক্ষুধিত নাড়িভুঁড়ি।

তারাভরা আকাশের ফিকে আলোয় নয়া মাটির কবরের সামনে দাঁড়িয়ে জোবেদ আলি তার এই অদ্ভুত আচরণের কোনো যুক্তিসংগত অর্থ খুঁজে পায় না। তবে কি সে পাগল হয়েছে? বা হতে চলেছে? নিমিষের জন্য চিন্তাটা বর্ষার বিদ্যুৎঝলকের মতো মনের উপর খেলে যায়। এই রাস্তা ঐ কবর। ঐ আকাশ আর ঐ তো কবরস্থানের পাশে মান্দারের জঙ্গল তো সত্য। সবই তো তার চেনা। আর তার নরম দেহটি?

অতএব সে পাগলও হয়নি, জিনপরীও তার উপর আছর করেনি।

অনেকটা নিশ্চিন্ত এবং আশ্বস্ত হয়ে জোবেদ আলি শহরের দিকে মুখ ফেরায় কিন্তু পা তুলতে গিয়েও আবার বসে পড়ে। কী যেন সে ভুলে যাচ্ছে। কী একটা খুব বড় কথা সে যেন স্মরণ করতে পারছে না। তারার আলোয় নূতন মাটির কবরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সে মনে করতে চেষ্টা করে। অর্ধেকটা হয়তো মনে এসেই পুনরায় গুলিয়ে যায়। আবার ভেসে ওঠে সেইসব শোভাযাত্রার ছবি। সেই কলেমা খাটিয়ার উপর মৃদু আন্দোলিত দেহটি অজানা অপরিচিত কোনো হতভাগ্যের মৃতদেহ। আবছা আলো-অন্ধকারে আধো ঢাকা। সাদা-কালো কবরটি যেন এগিয়ে আসে তার দিকে। কবরের সাথে সাথে উলটোদিকের মান্দার ছায়াও যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলতে থাকে। আকাশের তারাগুলো হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় কোনো মায়ালোকে। আবছায়ার ভয়াল প্রেত ভয়ংকর দুবাহু বাড়িয়ে তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে। ভয়ে দৌড় মারার জন্য দেহের সকল শক্তিতে ভর দিয়ে

BanglaBook.org

জোবেদ আলি চেষ্টা করে উঠে দাঁড়াতে। কিন্তু তার সমস্ত প্রয়াস, সমস্ত শক্তি কোনো-এক অদৃশ্য নিশ্বাসের টানে থমকে যায়। জোবেদ আলি নিজেকে সঁপে দেয় তারা-ছড়ানো আকাশের নিচে ভিজে আর নরম ঘাসের কোলে।

কতক্ষণ এমনভাবে ছিল সেটা আজ জোবেদ আলি স্মরণ করতে পারে না।

যখন চোখ মেলল তখন আকাশে চাঁদ উঠে হেলে পড়েছে পূর্ব কোণে। অস্তগামী চাঁদের ক্লান্ত রেখা কবরস্থানের উঁচু-নিচু টিলার মতো ঢেউ-খেলানো মাটির বুকে মৃত্যুরই মায়া বিস্তার করে। মান্দার ঝোপগুলো যেন অনেক কাছে সরে এসেছে। দূরে লোকালয় থেকে রাত্রিশেষের কুটকুট ধ্বনি ভেসে ভেসে আসে। একটি সঙ্গীহীন কাক হঠাৎ যেন দৌড়ে এসে নয়া কবরটার উপর দিয়ে উচ্চচিৎকারে কবরখানায় শব্দের তরঙ্গ তুলে মিলিয়ে যায় মান্দার বনে। শেষরাত্রির মোরগ-ডাকা প্রহরে অকস্মাৎ হারানো কথাটা জোবেদ আলি ফিরে পায়। তার মনে পড়ে কাল সকাল থেকে যে-কথাটা সে ভেবে আসছে সেকথা। সে উপবাসী, একটা-কিছু তাকে করতে হবে। আবার সেই টনটন ব্যথাটা নেই। এখন সে পরিষ্কার করে, স্পষ্ট করে ভাবতে পারছে। ক্ষীণ চাঁদের আলোতে সে স্পষ্ট করেই দেখতে পারছে। এক পা দুপা সে এগিয়ে যায় কবরস্থানের দিকে, সন্ধ্যারাত্রের সেই নূতন কবরটির পাশে। প্রথমে আস্তে আস্তে একমুঠ দুমুঠ করে। পরে অতি দ্রুত বাহুর সমস্ত শক্তি দিয়ে জোবেদ আলি কবরের নয়া মাটি সরিয়ে নেয়। মাটির অন্তরালে ধবধবে সাদা কাফনে-মোড়া মোর্দাকে সে হাত দিয়ে স্পর্শ করে। জোর ধাক্কা খেয়ে নিথর মৃতদেহটি একবার নড়ে ওঠে। কাফনের টুকরোগুলো খুলে নিয়ে অনাবৃত মৃতকে সে-অবস্থাতেই রেখে জোবেদ আলি দ্রুত পদক্ষেপে রাস্তায় এসে দাঁড়ায়

তার নিজের মুখে শোনা এ-কাহিনি। সেই উপবাসী সন্ধ্যা, তারা-ভরা আকাশ আর সন্ধ্যার বনের লম্বিত ছায়ায় সম্বিৎ হারানো—এ সমস্ত বর্ণনাও জোবেদ আলির নিজস্ব। চৌর্যবৃত্তির এই প্রথম অভিজ্ঞতার পর জোবেদ আলি অসংখ্য ছোট বড় চুরি করেছে। চুরির চেয়েও উঁচু ডিগ্রির অপরাধেও হাত পাকিয়েছে। কিন্তু এসমস্ত অপরাধের অধিকাংশই এখন আর তার মনে নেই। যা মনে আছে তাও আজ স্মৃতির পটে ঝাপসা আঁক মাত্র: কিন্তু এই প্রথম অপরাধের ক্ষুদ্রতম ঘটনাটিও তার স্মরণে খোদাই রয়েছে।

'৫২ সাল থেকে অনেকদিন, অনেকবার তাকে বলেছি, জোবেদ আলি, তুমি শক্তসমর্থ পুরুষ। সৎপথে কাজ করে জীবনধারণ কর না কেন? প্রতিবারই নেহাত তাচ্ছিল্যভরা একটি জবাব পেয়েছি। জেলের বাইরে আমার ভালো লাগে না। পাঁচ-ছবার সে ছাড়া পেয়েছে জেল থেকে। প্রতিবারই নূতন কোনো অপরাধ করে শাস্তি নিয়ে ফিরে এসেছে। এবং নূতন অপরাধের জন্যে পুরানো পাপী বলে তার শাস্তির পরিমাণটাও ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছিল। অথচ জোবেদ আলি খুশি। কোনো-এক হাকিম তাকে একবার গালি দিয়ে বলেছিলেন—ব্যাটা তুই একটার

BanglaBook.org

পর একটা চুরি করে চলেছিস। তোকে সারাজীবন জেলে রাখার ব্যবস্থা করছি। প্রত্যুত্তরে জোবেদ আলি নাকি খুশি হয়ে বলেছিল, 'হুজুর তা-ই করেন। হগলবার বাইর অইয়া নূতন নূতন ফিকির আর কইরতে অয় না। পৃথিবীতে হানাহানি কাটাকাটি মারামারি। মানুষগুলো অসৎ, কে কার গলায় ছুরি বসাবে সর্বক্ষণ এই চিন্তায় মত্ত।' তাই জোবেদ আলি এই দেয়ালঘেরা ক্ষুদ্র জগৎটিকেই নিজের স্থায়ী বাসস্থান হিসেবে বেছে নিয়েছে। এখানে অসৎ প্রবৃত্তি সংযত। মারামারি কাটাকাটি নেই। এখানে শান্তি। অথচ এখানে স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থা নেই। তাই বাধ্য হয়েই তাকে ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হয় এক-এক মেয়াদের জন্য। অপরাধ সে করতে চায় না। সে শান্তিতে বাঁচতে চায়। শান্তিতে মরতে চায়। নারায়ণগঞ্জের কর্মচঞ্চল বন্দরে শান্তি সে পায়নি; পেয়েছে ক্ষুধা, হানাহানি, মারামারি, শেষজীবনটা তার এখানেই কাটবে। আর শান্তিতে সে শেষনিশ্বাস ত্যাগ করতে পারবে এটাই তার এখন একমাত্র কামনা। জোবেদ আলি কি সত্যি পাগল?

১৫.০৩.১৯৫৯
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গেরাম আলির গল্প

আজ দেখা হল বুড়ো মিঞার সাথে। নাম তার গেরাম আলি তালুকদার। ময়মনসিংহ জিলার টাঙ্গাইলনিবাসী পক্বকেশ বৃদ্ধি। বয়সের হিসেবটা সে নিজেই জানে না। কখনও বলে তিন কুড়ি, কখনও বলে চার কুড়ি বছর। আমার সাথে প্রথম পরিচয় ১৯৫৫ সালে এই জেলেই। তখন সে ছিল আমাদের ঝাড়ুদার। তার বয়সের প্রতি শ্রদ্ধাবশত আমরা তাকে 'বুড়ো মিঞা' বলে সম্বোধন করতাম।

কোনোকিছুতেই মন বসছে না এমন একটি বিশ্রী মেজাজে বসেছিলুম জানালার পাশে। চড়ুই পাখির বাসা বাঁধার কাজ শুরু হয়েছে পুরোদমে। ঠিক আমার বিছানার উপর যে-মোটা কাঠের বিমটি রয়েছে তার ফাঁকে দুটো বাসা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়েছে। সারাদিন ধরেই বাইরে থেকে খড়কুটো আমদানি হচ্ছে। তার অধিকাংশই বিম পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। মাঝপথেই কোথাও পড়ে যায়, কিছু ঠাঁই পায় আমার বিছানায় অথবা টেবিলে।

একপক্ষকাল ধরেই ভেবে আসছি বাসাগুলো ভেঙে দেব না, আমার খাটটি সরিয়ে নেব অন্য জায়গায়। আজও সেই কথাটা ভাবছিলাম খড়কুটোয় বিপর্যস্ত বিছানাটার করুণ অবস্থার দিকে তাকিয়ে। উঠে আসছিলাম চাদরটা বদলিয়ে দেবার জন্যে। কিন্তু একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে দাঁড়ালুম।

কুপরি-হাতে বুড়ো মিঞা। মুখে তার বিশুষ্ক হাসি। বয়সের ছাপটা আরও বেশি করে পড়েছে হাতে, মুখে, দাঁড়াবার ভঙ্গিতে। লোল-খাওয়া চামড়া শীতের টানে চিমসে গিয়েছে। ডান হাতটি অনবরত কাঁপছে। সামনের দিকে সব কয়টি দাঁতই অদৃশ্য হয়েছে।

পরিচিত লোক পেয়ে আমি খুশিই হলুম। জিজ্ঞেস করলুম—বাড়ির খবর কী? একটিমাত্র প্রশ্ন। কিন্তু সেই প্রশ্নটি গেরাম আলি তালুকদারের জীবনবীণার কোন হারানো সুর স্মরণ করিয়ে দিলে জানি না। হঠাৎ সে কেঁদে উঠল অভিমানী শিশুর

BanglaBook.org

মতো। দুচোখ বেয়ে অশ্রুর প্লাবন নামল। খসে পড়ল হাতের কুপরিটি। অভিমানে কান্নায় ন্যুব্জ দেহটি কেঁপে কেঁপে বুঝিবা ভেঙে পড়ে।

যে-নিষ্ঠুর ক্ষতটি গেরাম আলি অতি সন্তর্পণে হৃদয়ের মধ্যে লুকিয়ে রাখে সেখানেই আমি খোঁচা দিয়েছি। সে-কঠিনতম দুঃখের কাহিনি সে মুছে ফেলতে চায় স্মৃতির পর্দা থেকে তা-ই আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। একলা জীবনের শক্তি আর স্বপ্ন দিয়ে যে-গৃহ সে গড়ে তুলেছিল সেই হারানো গৃহের কথাই আমি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছি। তাই তার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

গেরাম আলির জীবনকাহিনি বাংলাদেশের অপর দশজন কৃষকের মতোই। জমি নিয়ে কলহ, মারপিট, মিথ্যা মামলা, মিথ্যা সাক্ষী। সাজা। অথবা এক টুকরো জমি, একটি বসতবাটী—কয়েক বছরের মধ্যেই সব চলে গেল মহাজনের পেটে। এতে কোনো অভিনবত্ব নেই। নূতনত্ব নেই কিছু। বিস্মিত হবার মতো ঘটনা এগুলো নয়।

গেরাম আলি যে একটা তালুকের মালিক ছিল নামের শেষে পদবিটিই তার স্বাক্ষর বহন করছে। তালুকটি পেয়েছিল সে পৈতৃক সূত্রে। এ ছাড়া ছিল বিঘে পাঁচেক জমি। একজোড়া হাল। গাইগরু। মাছভর্তি একটি পুকুর। বসতবাটী। প্রথম পক্ষের বউ বাঁজা ছিল বলে সে দ্বিতীয় বউ এনেছিল ঘরে। এই ছোট বউ-এর তরফে সে পেল দুই ছেলে।

একটু বড় হতেই গেরাম আলি ছেলে দুটোকেও লাগিয়ে দিলে ক্ষেতের কাজে। চাষাভুষার ছেলে—এলেম দিয়ে কী হবে? গতর খাটাবে, ফসল ফলাবে। পেট পুরে খাবে। গেরাম আলির এই মত। সেজন্যেই সে তাদের যত্ন করে হাল ধরতে শেখাল। জাল ফেলতে আর দাঁত দেখে গরুর বয়স ঠিক করতে শেখাল, এমনি হাজারো টুকিটাকি বুদ্ধি আর বিদ্যে যা বই পড়ে শেখা যায় না। সেসব গেরাম আলি তালিম দিয়ে দিয়ে শিখিয়ে দিলে।

বাপ-ব্যাটারা মিলে ক্ষেতের ফলন দিল বাড়িয়ে। 'আল্লাহ্‌র কুদরত', গেরাম আলি বলে, 'আমার সুখের সংসার ছারখার হয়ে গেল'।

গেরাম আলির ছিল এক দূরসম্পর্কের ভাই। সে ছিল বড় গরিব। কবে-না-কবে এক বিঘে জমি গেরাম আলি তাকে দিয়েছিল চাষ করতে। যখন যা হত তার এক ভাগ দিয়ে বাকি তিন ভাগ সে-ই ভোগ করত। সেই ভাইটিই চক্রান্ত করে জমিটি কবলা করে দেয় মহাজনকে। মহাজন জমির দখল নিতে এলে গেরাম আলি তার ব্যাটাদের নিয়ে বাধা দেয়। এমনি করে মহাজনের সাথে ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত হয়। গ্রামের মোড়লরা সালিশি করতে এসে মহাজনের পক্ষেই রায় দেয়। আল্লার নামে বুড়ো গেরাম আলি শপথ নেয় এই অন্যায় সে হতে দেবে না। জমির হক-দখল সে ছাড়বে না।

মহাজনের টাকা আছে, হাতে মানুষ আছে। মামলা-মোকদ্দমা চালাবার বুদ্ধি আছে। আছে ভাড়াটে লেঠেলের দল।

BanglaBook.org

গেরাম আলি তো জমি দখলে রেখেছে। বীজ বুনেছে। কিন্তু ফসল যখন তুলতে গেল মহাজনের লেঠেলরা এসে বললে, তা হবে না। গেরাম আলিও রুখে দাঁড়ালে। তার দুই জোয়ান ব্যাটা জখম হল। নিজে সে হুঁশ হারাল। জ্ঞান যখন ফিরে পেলে তখন সে জেল-হাসপাতালের লোহার খাটে শুয়ে।

তার পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। কোর্ট থেকে সেশন, সেশন থেকে আপিল—হাইকোর্ট। দুবছর হাজতবাসের পর গেরাম আলি খুনের অপরাধে পনেরো বছরের দণ্ড নিয়ে কয়েদিজীবন শুরু করল।

তেমন কোনো অভিনব ঘটনা এটি নয়। প্রতি বছর এদেশের অসংখ্য কৃষক জমির দাঙ্গায়, খুন-ডাকাতির অপরাধে দণ্ড পায়। জেল খাটে। আর এই মামলা চালাতে গিয়ে সেসব কৃষক-পরিবার যে যথাসর্বস্ব খুইয়ে নিঃস্ব ভিখিরিতে পরিণত হয়েছে তাও অতি সাধারণ ব্যাপার। যেমন আপিল হাইকোর্টের চক্র অতিক্রম করে কেউ খালাস পায়। কেউ পায় না। কিন্তু খালাস পেয়ে অথবা না-পেয়েও অধিকাংশই ভিটেমাটি হারিয়েছে। আপিল করতে গিয়ে তার শেষ ইঞ্চি জমিটুকু বিক্রি করতে হয়েছে। তারপর দুবছরের মধ্যেই ছেলেরা খেতে না পেয়ে, কাজ সংগ্রহ করতে না পেরে বসতবাটীটা বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে। বড় ছেলে চলে গিয়েছে আসামে ভাগ্যান্বেষণে। ছোট ছেলে থেকে গিয়েছে গ্রামে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি, এ-ক্ষেত সে-ক্ষেতে যখন যেখানে যা পায় তা-ই করে কোনোরকমে সে দিন কাটাচ্ছে।

বউ দুটির কোনো খবর তার জানা নেই।

হাজতের দুবছর ধরে আজ—বারো বছর গেরাম আলি এ-জগতের বাসিন্দা। গত দশ বছর সে বউ ছেলে কাউকে দেখেনি। তাদের কোনো খবর পায়নি। কোনো চিঠি পায়নি সে ছেলেদের কাছ থেকে অথবা বউদের কাছ থেকে। খবরগুলো শুনে নিয়েছিল পাঁচ বছর আগে। গ্রামেরই এক কয়েদি ভাইয়ের কাছ থেকে। দুবছরের সাজা নিয়ে সেই লোকটি এসেছিল। মুক্তি পেয়ে সে চিঠি দেবে বলেছিল। কিন্তু পাঁচ বছর ধরে বৃথাই গেরাম আলি তার চিঠির প্রতীক্ষা করছে।

বাড়ির খবর কী?

এ-প্রশ্নের কী জবাব দেবে গেরাম আলি তালুকদার? তালুক গিয়েছে, জমি গিয়েছে, বাড়ি গিয়েছে, ছেলেরা গিয়েছে ভুলে। নিজের বলতে একদিন সবকিছুই তার ছিল। আজ কোনোকিছুই অবশিষ্ট নেই।

যা নেই, যা হারিয়ে গিয়েছে সে-সম্পর্কে গত বারো বছরে হয়তো এই প্রথম প্রশ্ন সে শুনতে পেল।

জীবনসায়াহ্নে সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে, গোটা পৃথিবীর বিরুদ্ধেই তার অভিমান।

'খোদার হুকুম। নইলে আমার একডা দেহা আসে না। ছেলেরা একডা ছিডি দেয় না।'

BanglaBook.org

অনেক দুঃখে, অনেক অভিমানে কথাগুলো বলে গেরাম আলি। কেউ তাকে দেখতে আসে না। দুবান্ডিল বিড়ি কেউ তার নামে জমা দেয় না। বারো বছরের নিঃসঙ্গ নিষ্করুণ কারাজীবনের ব্যর্থ কামনা প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে কথাটার মধ্যে।

প্রসঙ্গটা পালটে দেবার উদ্দেশ্যে বললাম—বড় জোর এক বছরের মধ্যেই তো চলে যাচ্ছ, তখন আবার ঘর বাঁধবে, জমি করবে।

নিজের কানেই কেমন নিষ্ঠুর পরিহাসের মতো শোনাল আমার কথা। সত্যি কি তার কোনো সান্ত্বনার প্রয়োজন আছে?

গেরাম আলি পাহারার কাছ থেকে কামের তাড়া পেয়ে উঠে চলে যায়।

চড়ুই পাখির উৎপাতে বিপর্যস্ত বিছানার চাদরটির দিকে তাকিয়ে ঠিক করে ফেললুম—বাসাগুলো ভাঙতেই হবে।

২৮ জানুয়ারি ১৯৫৯
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

পল্টু

পল্টুর সাথে আবার দেখা হবে ভাবিনি। আরও আশ্চর্য, দেখা হল তার সাথে জেলখানাতেই, 'তখন ছিলাম ফরিদপুর জেলে। আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ববিক্ষুব্ধ উনিশশো চুয়ান্ন সাল। পল্টু ছিল আমাদের ফালতু। চা-নাশতার ব্যবস্থাপনা ছিল তার বিশেষ দায়িত্ব। ভালো চায়ের জন্য তো বটেই, পল্টুকে মনে রাখার অন্য একাধিক কারণ ছিল।

আমাদের সংখ্যা মাত্র নয়। এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ ধরনের চাহিদা। কারো চায়ে এক চামচ চিনি। কারো দুচামচ। কারো বেচিনি। হকের চা হবে হালকা। বিষ্টুদারটা হবে ঠিক তার উলটো। বাকি ৭ জনের হালকাও না, কড়াও না। কেউ পছন্দ করে ছেঁকা রুটি, কেউ কাঁচা রুটি। কারো রুটিতে চিনি থাকবে। কারো থাকবে গোলমরিচ। বিভিন্ন রুচির এই বিভিন্ন চাহিদা পল্টু পূরণ করত অভ্রান্তভাবে। এ ছাড়াও অনেকের ছিল বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন। যেমন আবদুল হকের পোড়া বেল। আমার আখি গুড়। অতি আপনজনের মতো সযত্নে পল্টু এসব বিশেষ চাহিদা মেটাত। একটি সুখী পরিবারের সে যেন প্রধান কর্তা। আমাদের ভালো খাইয়ে তার আনন্দ উপচে পড়ত। আমাদের একটু প্রশংসা পেলে সে খুশিতে ডগমগ হয়ে নূতন খাবার তৈরির ফন্দি আঁটত।

পল্টুর তৃতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল তার সদাহাস্য মুখটি। লোক নয়জন হলেও আমাদের টুকিটাকি প্রয়োজন নেহাত কম ছিল না। পল্টু দুবেলা নাস্তা, চার বেলা চা খাইয়েও টুকটাক কাজে সারাটা দিন ব্যস্ত থাকত। এর উপর ছিল তার নিজের কাজ। কাপড় কাচা, দুপুরে বিকেলে বালকশিক্ষা পড়া, রাত্রে পত্রিকা শোনা। কিন্তু পল্টুর ক্লান্তি নেই। সারাক্ষণ এটাসেটা করে চলেছে। আর হাসিটা সর্বদা লেগে রয়েছে মুখের উপর।

পল্টুকে কেউ কখনও রাগ করতে দেখেনি। কখনও মুখভার করে থাকতেও দেখা যায়নি তাকে। তার সবল পদক্ষেপে রাজবন্দি ইয়ার্ডটি সদাসচকিত থাকত।

BanglaBook.org

এটা টানতে ওটা ফেলে দেওয়া, থালা-বাটির ঝনঝনানি—যতক্ষণ পল্টু জেগে আছে ততক্ষণ এসব অঘটন ঘটতেই থাকবে। তিরস্কারের কোনো উপায় নেই। কেননা সেই সর্বজয়ী হাসির সম্মুখে তার যে-কোনো শত্রুই ঘায়েল ; আর এই হাসির প্রতি আমাদের সবারই ছিল দুর্বলতা। কয়েদিদের মধ্যে হাসি বিরল। খিটখিটে মেজাজ পরস্পর অবিশ্বাস ঝগড়া আর চিন্তাভারাক্রান্ত নিরানন্দ মুখ। এটাই কয়েদির চেহারা। পল্টু সেখানে নিয়মের ব্যতিক্রম তাই তার ছিল সাত খুন মাপ।

আমাদের চক্র খেলার মাঠে সংস্কারকাজ চলছিল। রাজমিস্ত্রির কানি হাতে লোকটি প্রথমে নজরেই তেমনি পড়েনি। কিন্তু যে-হাসি নজরে না পড়ে পারে না তেমনি হাসির টানে এগিয়ে এসে পল্টুকে দেখে অবাক হলুম। সে তো পরিচিত লোক পেয়ে মহাখুশি। হড়হড় করে একগাদা কথা সে বলে গেল যার সংক্ষিপ্ত অর্থ এই যে, সে এত সিকিউরিটি গারদের মধ্যে খুঁজে খুঁজে এতক্ষণে মাত্র একজনকেই পরিচিত পেল। আর সে খুব খুশি। সব সিকিউরিটি সাহেবকেই সে কেন চেনেনি এই আফসোসটিও প্রকাশ করলে।

আবার বুঝি চুরি করে জেলে এসেছ?

আবার তিরস্কারটি আদৌ গায়ে না মেখে সে গম্ভীরভাবে জবাব দিলে—মোটেই না।

পল্টু চব্বিশ বছর জীবনে অনেক কিছুই দেখেছে। খুলনার এক গরিব কৃষকের ঘরে জন্ম নিয়ে আট বছর বয়সেই তাকে রোজগারের সন্ধানে বের হতে হয়। চটপটে স্বভাব আর সুন্দর স্বাস্থ্যশ্রীর জন্য শহরে এসেই সে কাজ পেয়ে গেল। চায়ের দোকানে বয়ের চাকরি। ছয় টাকা মাইনে খাওয়াদাওয়া মালিকের। বছর দুয়েকের মধ্যেই সে তিন-চার দোকানে ঘুরে-পালটে পনেরো টাকা মাইনের ব্যবস্থা করে নেয়। তৃতীয় বছরে দুশো টাকা পুঁজি নিয়ে পল্টু পান-বিড়ির দোকান খুলে বসল স্টেশনের লাগ। দোকানের আয় আর বন্দরের খদ্দেরদের বদৌলতে পল্টু বারো বছর বয়সেই শহুরে জীবনের স্বাদ পেয়ে গেল। আয় বাড়ার সাথে সাথে ইয়ার দোস্তের সংখ্যাও গেল বেড়ে। সেই অনুপাতে দোকানের কলেবরও কমতে থাকে। কমতে কমতে যখন পুঁজিতে হাত পড়ল তখন পল্টুর ফেরার রাস্তা বন্ধ। দেনা শোধ করতে গিয়ে দোকানটাই বেচা পড়ল। ইয়ার দোস্তরা কিন্তু পল্টুর প্রতি নিমকহারামি করল না। সহজ আয়ের যে-কোম্পানিটি তাদের ছিল সেখানে পল্টুকে ভর্তি করিয়ে নিলে। ট্রেনিং দিলে। কিন্তু অপটু পল্টু অল্প দিনের মধ্যেই জনৈক রেলযাত্রীর পকেট কাটতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে গেল। চোদ্দ বছর বয়সে জেলখানায় তার হাতেখড়ি পড়ল।

তিন মাস সাজা খেটে পল্টু যখন বেরিয়ে এল তখন দেখলে দলের মধ্যে সে অচ্ছুৎ। ধরা পড়ে সে দলের কলঙ্ক কিনেছে। তাই সহজ আয়ের রাস্তাটা ছেড়ে দিয়ে পল্টু ঘাটে কুলির কাজ নিলে। এই মেহনতের কাজটা বছরখানেক তার ভালোই

BanglaBook.org

লেগেছিল। কিন্তু আয় বড় কম বলে সে শহরে এসে রিকশা চালাতে শুরু করল। এতে আয়টা তার দ্বিগুণ হল। আয় বাড়লেই পল্টুর বিপদ। এবারও সে বিপদ থেকে রেহাই পেল না। সেই পুরানো দলের বন্ধুদের সাথে আবার নতুন মিতালি হল। নূতন মিতালিতে পল্টুর দুঃসাহসিকতায় পুরানো বন্ধুরাই অবাক হয়ে যেত। এই দুঃসাহসিক অভিযানে রিকশাটা তার মস্ত সহায় হিসেবে কাজ করে। দলের মধ্যে আর দলের বাইরে পল্টুর দাপট তখন সর্বোচ্চ শিখরে। কিন্তু এ-গৌরব বছর দুয়েকের বেশি টিকল না। পল্টু আবার ধরা পড়ে গেল দুজন সাথিসমেত।

ঘটনার নায়ক পল্টু নিজে। কিন্তু ধরা পড়েছিল তার সাথিদেরই অবিমৃষ্যকারিতার জন্যে। সিনেমাফেরত দুই অফিসারতনয়াকে পল্টু রিকশা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। অপেক্ষাকৃত জনহীন গলির মুখে তাদের ভয় দেখিয়ে অলংকারগুলো হাত করে নিতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু পল্টুর অপর দুই বন্ধুর নজর ছিল আরও উঁচা। অফিসারতনয়াদের নিয়ে একটু স্ফূর্তি কবার রোখ তাদের চেপে গিয়েছিল। ফল হল পাড়াবাসী কর্তৃক পাইকারি প্রহার। থানা জেল। দ্বিতীয় অপরাধ বলে পল্টুকে হাকিম বারো বছরের দণ্ড দিলে। তার মধ্যে তিন বছর পল্টু কাটিয়েছিল আমাদের সাথে।

এই তিন বছর সে ছিল আমাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। বন্দিজীবনের নানা সুখ-দুঃখের সাথিরূপে নিরক্ষর পল্টু এর মধ্যে চিঠিলেখা আয়ত্ত করেছিলো। ইংরেজিতে নাম সই করতে শিখেছিল। পত্রিকা পড়ত স্বচ্ছন্দে। মুক্তির দিন পল্টু ছল ছল চোখে বিদায় নিয়েছিল। আর বলেছিল এবার থেকে সে সৎপথে থাকবে। চুরি করবে না।

পল্টু সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছে।

চার বছর পর এবার সে এখানে এসেছে।

খুলনা ডক-ইয়ার্ডের শ্রমিক হিসেবে। অপরাধ ধর্মঘট ও অপর শ্রমিকদের ধর্মঘট করার জন্য উসকানিপ্রদান।

চুন-সুরকির পলেস্তারার উপর লোহার দুরমিসটা তালে তালে পড়ছে উঠছে। পল্টুর বলিষ্ঠ পেশি সেই তালে ফুলছে-কমছে, ফুলছে। নজর তার কাজের দিকে। মুখে সেই প্রাণোচ্ছল হাসি, যে-হাসি একমাত্র পল্টুই হাসতে জানে। সে-হাসি বন্দি মানুষের মুখে বিরল।

BanglaBook.org

০২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

পরিতৃপ্ত

অক্টোবরের উজ্জ্বল সকাল। শীত পড়তে শুরু করেনি। কিন্তু শীতের আমেজ লেগেছে প্রকৃতির গায়ে, মানুষের দেহে। দুনম্বর খাতার ডান পার্শ্বে সবুজ দুর্বার ছোট্ট মাঠটুকু ঘিরে মরশুমি ফুলের চাষ হয়েছে। উজ্জ্বল সকালে শিশিরসিক্ত ফুলের আহ্বানে ঘুম ভাঙে। যে-কয়জন বন্ধু প্রভাতি ভ্রমণের স্বাস্থ্যগত উপকারিতা সম্পর্কে সজাগ তাঁরা ছাড়া অন্যরা এখনও শুয়ে রয়েছেন 'পালং চা'-এর অপেক্ষায়।

কয়েদখানায় সকাল, অপরাহ্ণ আর রাত্রি—২৪ ঘণ্টার এই তিনটি পৃথক পৃথক প্রহরের বিশিষ্ট স্বকীয় বৈচিত্র্য যেমন প্রগাঢ়ভাবে অনুভূত হয় এমনটি বোধহয় আর কোথাও হয় না। অবশ্য কথাটা বিনাশ্রম কয়েদি অথবা রাজবন্দিদের পক্ষেই প্রযোজ্য। কেননা সশ্রম দণ্ডভোগী সাধারণ কয়েদিদের যে একটানা খাটুনি তাতে প্রহর পরিবর্তনের বৈচিত্র্য লক্ষ করার কোনো অবকাশ থাকে না।

যতদূর মনে পড়ে বাইরে সূর্যোদয় দেখার সৌভাগ্য কখনও হয়নি, একমাত্র ছোটবেলার পিকনিকের সময়টা বাদ দিয়ে। কিন্তু এখানে রোজই ঘুম ভাঙে ভোরের পাখির আওয়াজে, কখনও কখনও জমাদারের হাঁক-ডাকে। রাত শেষ হবার আগেই জমাদার ঘর খুলে গুনতি নিয়ে যায়—তাতে ঘুম ভাঙে না। কেননা ওটা গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে সাত বছর পূর্বেই, কিন্তু অনতিদূরের বটবৃক্ষ থেকে যখন ভোরের পাখিরা গান ধরে তখন চোখ খুলে যায় স্বয়ংক্রিয় মেশিনের মতো। জানালার ফাঁক দিয়ে দিনের সূর্যের প্রথম রশ্মিটুকু দেখার জন্য মন যেন উদ্গ্রীব হয়ে থাকে। প্রভাতি পাখিদের সুপ্তি-ভাঙা গান আর হঠাৎ উড়ে যাওয়ার ঢংটি দেখার জন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন উন্মুখ হয়ে থাকে। কয়েদখানার নিষ্করুণ পরিবেশটাই হয়তো আমাদের মনের সাথে প্রকৃতির এই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ানুভূতির উৎস।

যে-পাখি কোনোদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কয়েদখানায় তাকে শুধু সুন্দরই মনে হয় না, মনে হয় জীবনে সুখ-দুঃখের সাথি।

BanglaBook.org

প্রকৃতির সাথে আত্মীয়তাবোধ একটি বিশেষ অনুভূতি, বিশেষ মানসিক গঠন বা অবস্থার প্রশ্ন। পরিবেশভেদে তার তারতম্য ঘটে। কথাটা মানবমনের সমস্ত অনুভূতির ক্ষেত্রেই সত্য। সঙ্গবোধ, সুখ-দুঃখের অনুভূতি এ-সমস্তই ব্যক্তির অবস্থান ও পরিবেশের উপর অনেকখানি নির্ভর করে। জেলজীবনের অভিশাপ অনেক মানুষকেই হৃদয়হীন যন্ত্রে পরিণত করে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কয়েদিজীবন মানুষকে করে তোলে স্পর্শকাতর, অনুভূতিপ্রবণ, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল।

আজিকার সকলের উজ্জ্বলতা পাখির গান, ফুলের সুরভি সবকিছুর মধ্যেই বেদনার ছায়া। ইদ্রিস মিয়ার কান্নায় কাল থেকে রাজবন্দি ওয়ার্ড ম্রিয়মাণ।

যশোহরের জোয়ান কৃষক ইদ্রিস মিয়া। খুনের অপরাধে যাবজ্জীবন কারা ভোগ করছে। কথা বলে কম। আপনমনে নির্দিষ্ট কাজগুলো সেরে শিউলিতলায় বিশ্রাম নেয়। অপরাপর ফালতুদের (attendants) থেকে নিজেকে দূরে রাখে সযত্নে। কারো সাথে ঝগড়া-বিবাদ নেই। বিশেষ খাতির কারো সাথে রাখে না। ঘনিষ্ঠতার ছোঁয়াচ পেলে নিজের কথা বলে। কসম খেয়ে বলে সে খুন করেনি। আসল খুনির সাজা হয়নি, বিধির বিপাকে তার সাজা হয়ে গিয়েছে। এক স্বল্পভাষী ইদ্রিস মিয়া কাল সকাল থেকে অবিরাম কেঁদে চলেছে। দেশ থেকে এক জ্ঞাতিভাই চিঠি দিয়েছে ইদ্রিস মিয়ার জোয়ান বউ অপর একজনকে নিকাহ্ করে অন্যত্র চলে গিয়েছে। খবরটি পেয়েই ইদ্রিস সশব্দ কান্নায় ভেঙে পড়ে।

সদাগম্ভীর স্বল্পভাষী ইদ্রিস মিয়া যে এমনভাবে কাঁদতে পারে তা কোনোদিন ভাবতে পারিনি। সবাই মিলে সারাদিন ধরেই তাকে প্রবোধ দিলাম। কিন্তু কান্না তার থামেনি। তার এক কথা, যে-স্ত্রীকে সে এত ভালোবাসে সেই স্ত্রী কেমন করে পরের ঘর করতে চলে গেল।

ইদ্রিস মাঝারি কৃষক। পাঁচ বিঘা জমির মালিক। ছেলেপুলে নেই। জেল হয়েছে বছর দেড়েক হল। তারও এক বছর আগে বিয়ে করেছিল। নির্ভাবনায় ইদ্রিস স্বপ্ন দেখেছিল জমির ফলন বাড়াবে। বাড়তি ফসল বাজারে বিক্রি করে নগদ টাকা জমাবে, সেই জমানো টাকা দিয়ে বাপের আমলের ছনের ঘরটি পালটিয়ে টিনের ঘর করবে। তারপর আরও কিছু টাকা জমলে জমি বাড়াবে। কিন্তু এমনি সময় তকদির বাধ সাধল। তার সুখের স্বপ্ন ভেঙে ধূলিসাৎ হল। যাবজ্জীবন দণ্ড নিয়ে জেলে এসেও ইদ্রিস সচ্ছল আর সুখীজীবনের স্বপ্ন দেখেছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে ভেবেছে চোদ্দ বছরই হোক আর ষোলো বছরই হোক সে আবার বেরিয়ে যাবে, আবার গতর খাটিয়ে জমিতে ফসল ফলাবে, ফসল বেচে টাকা জমাবে, নূতন জমি কিনবে। দোতালা টিনের ঘর উঠবে। সেই ঘর একটি কচি খোকার মিষ্টি হাসিতে উদ্ভাসিত হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু যাকে কেন্দ্র করে তার এত স্বপ্ন রচনা সে-ই তো চলে গিয়েছে পরের ঘরে। কাঁদতে কাঁদতে ইদ্রিস বলে—কয়েদ হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সে নগদ তিনশো টাকা বউ-এর হাতে তুলে

BanglaBook.org

দিয়েছিল আর বলেছিল ঘর তোলার জন্য এই আমার জমানো টাকা। আর রইল পাঁচ বিঘা জমি। তা দিয়ে চালিয়ে নিস বউ। তোর কোনো কষ্ট হবে না। দুবেলা মোটা ভাত খেয়ে দশ বছর কাটিয়ে দিতে পারবি। বাকি খোদা ভরসা। জেলে এসে দুবিঘা জমি ইদ্রিস বিক্রি করে দিয়েছে বউ-এর খরচ মেটানোর জন্য। কিন্তু এতেও মাগির মন উঠল না, বজ্জাত মাগি আর-একটা সোয়ামি নিছে। বিলাপ করতে করতে ইদ্রিস অবিরাম নালিশ জানায়। কাল সকাল থেকেই ইদ্রিস অবিরাম কাঁদছে আর বউ-এর উদ্দেশে অবিশ্রান্ত গালিবর্ষণ করে চলেছে। কোনো প্রবোধবাক্যেই কান্না তার থামেনি। গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে আমরা বললাম—তুমি বারো চোদ্দ বছর জেলে, অতদিন বউ-বেচারি যদি অপেক্ষা না করতে পারে তবে তাকে দোষ দিচ্ছ কেন? তুমি বেরিয়ে গিয়ে আবার নাহয় সংসার পাতবে।

আমাদের কথায় ইদ্রিস আরও ফেটে পড়ে। তার অভিমান, বউ কেন অন্য সোয়ামি নিল? তার ঘর ছিল, জমি ছিল। কোনোকিছুর তো অভাব ছিল না!

এমনও তো হতে পারে কোনো দুষ্ট লোক তাকে ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়েছে? তা হলে? ইদ্রিস একথা শুনে সমগ্র নারীকুলের বিরুদ্ধেই একরাশ গালিবর্ষণ করে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

ইদ্রিসের ফোঁপানো কান্নায় রাত্রে ঘুম ভেঙে চমকে উঠেছি বারবার। সকালের দিকে সে-কান্না আর শুনতে পাইনি।

চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুকটা দিয়ে গাত্রোত্থান করব ভাবছি এমন সময় ইদ্রিস এসে অপরাধীর মতো দাঁড়াল সামনে। কী বলতে চায় শোনার জন্য মুখ তুলে দেখি ইদ্রিসের লাল টকটকে আর ফোলা ফোলা চোখে এক গভীর প্রশান্তি। মুখের ভাঁজগুলো গভীরতর মনে হল। মনে হল এক রাত্রেই তার বয়স দশ বছর বেড়ে গিয়েছে।

আপনি ঠিকই বলেছেন ভাইসাব। বউটির বয়স আছে, খায়েশ আছে। সে কেন আমার তরে দুঃখ পাইবে...আমি খুশিই হইছি...আমি আর উতলা হব না...মাটির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলেই ইদ্রিস মিয়া চলে গেল তার নির্দিষ্ট কাজে হাত লাগাতে।

BanglaBook.org

২৮ অক্টোবর ১৯৫৯
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

পরিশিষ্ট ১

হাদিসের গল্প

একবার হযরত নবী করিম (দ.) সাহাবাদের সঙ্গে কোনো দূরবর্তী স্থানে গিয়েছিলেন : সঙ্গে খাবার জিনিস কিছু ছিল না। কাজেই সাহাবারা কিছু খাবার রাঁধার জোগাড় করতে লাগলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে কাজ ভাগ করে এক-একজন এক-এক কাজের ভার নিলেন। হযরত নিজে জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার ভার নিলেন। সাহাবিরা বিনীতিভাবে বললেন, "হযরত এ-কাজটি কি আমরা পারতাম না; আপনি কেন এর ভার নিলেন?" হযরত বললেন, "তোমরা পারতে ঠিকই, কিন্তু নিজে কোনো কাজ না করে আমি তোমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে চাই না। যে নিজেকে আপনার সঙ্গীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করে খোদা তাকে ভালোবাসেন না।" [সাম্য]

২

একদিন হযরত কতকগুলি লুণ্ঠিত দ্রব্য বিতরণ করছিলেন। চারিদিকে লোকেরা তাঁকে ঘিরে ধরেছিল। একজন লোক হযরতের শরীরের উপর দিয়ে এমনভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যে, তাঁর নড়াচড়ায় বিশেষ অসুবিধা হচ্ছিল। হযরতের কাছে একখানা ছড়ি ছিল, তিনি তার আগা দিয়ে লোকটাকে বসিয়ে দিলেন। কিন্তু আগা লেগে তার মুখে আঁচড় কেটে গেল। তখন হযরত ছড়িটি ঐ লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, "তুমি আমার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করো।" লোকটি বলল, "হে আল্লাহ্‌র রসুল, আমি আমার দাবি ত্যাগ করেছি। আমি আপনাকে মাফ করলাম।" [সাম্য]

৩

এক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে হযরত মদিনার পথে যাচ্ছিলেন। বহু পথ অতিক্রম করে সকলেই এক প্রান্তরে বিশ্রামের জন্য উপবিষ্ট হলেন। প্রান্তরে অনেক গাছপালা ছিল। হযরত এক গাছের শাখায় নিজের তরবারি ঝুলিয়ে গাছের ছায়ায় বিশ্রাম করতে বসলেন। অন্যান্য সঙ্গীও দূরে দূরে গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন। শরীর খুব ক্লান্ত হয়েছিল। কাজেই গাছের সুশীতল ছায়ায় বসতেই হযরত তন্দ্রাভিভূত হয়ে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ এক শব্দ শুনে জেগে চমকিত হয়ে দেখেন, এক

BanglaBook.org

দুর্দান্ত আরব তাঁর শিয়রে দাঁড়িয়ে। হযরতকে চোখ খুলতে দেখেই সে হযরতের তরবারিখানা গাছের ডাল থেকে পেড়ে নিল। তারপর বলল, "আজ কে তোমাকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করবে?" হযরত নির্ভীক অবিচলিতভাবে বললেন, "আল্লাহ্।" আরব একটু হেসে তরবারি আবার উঁচু করে বলল, "কে এখন তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে?" হযরত পুনরায় অবিচলিতভাবে একই উত্তর দিলেন, "আল্লাহ্।" হযরতের ভাবভঙ্গি, তাঁর নির্ভীকতা ও খোদানির্ভরতা দেখে আরব থতমত খেয়ে গেল। তার হাত থেকে তরবারি খসে পড়ল। হযরত তখন তরবারি নিজ হাতে নিয়ে বললেন, "এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে?" সে বলল, "হায়, আমাকে রক্ষা করার কেউই নাই।" হযরত তাকে কিছুই বললেন না। [মুসলিম]

৪

একদিন হযরত সাহাবাগণের সঙ্গে বসে আছেন, এমন সময় অন্য একজন লোক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা করল। হযরত বললেন, "ওকে ভিতরে নিয়ে এসো। যদিও লোকটি ভালো নয়।" লোকটি ভিতরে এল। হযরত তার সঙ্গে বিশেষ নম্রতার সঙ্গে আলাপ করলেন। লোকটি চলে গেলে হযরত আয়েশা জিজ্ঞাসা করলেন, "হযরত আপনিই বললেন যে লোকটি ভালো নয়, তবু আপনি তার সঙ্গে এরূপ সদয়ভাবে আলাপ করলেন কেন?" হযরত বললেন, "খোদাতালার চোখে সেই লোকই সবচেয়ে খারাপ যার ব্যবহারে লোকে তার নিকট থেকে দূরে সরে যায়।" [সুনীতি]

৫

একদিন একজন লোক হযরতকে জিজ্ঞাসা করল, "হযরত, গোলামের অপরাধ কতবার মাফ করতে হবে?" হযরত কিছুই বললেন না। লোকটি আবার ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করল। হযরত এবারও চুপ করে রইলেন। সে কিন্তু কিছুতেই ছাড়ল না, আবার জিজ্ঞাসা করল, "হযরত ক্রীতদাসের অপরাধ কতবার ক্ষমা করতে হবে?" হযরত এবার জবাব দিলেন, "দিনের মধ্যে সত্তর বার।" [সুনীতি]

৬

ছোরাফ নামক সাহাবি একবার এক বেদুইনের নিকট থেকে একটি উট ক্রয় করেছিল; কিন্তু তার মূল্য দিতে পারেনি। বেদুইন হযরতের নিকট সাহাবিকে ধরে নিয়ে গেল এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। হযরত সাহাবিকে উটের দাম পরিশোধ করতে বললেন। সে বলল, "আমার শক্তি নাই।" হযরত তখন বেদুইনকে বললেন, "একে বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে উটের দাম আদায় কর।" বেদুইন তা-ই করল। অন্য একজন সাহাবি ছোরাফকে মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে মুক্ত করলেন। [বিচার]

৭

হাব্বার বিন আসোয়াদ ইসলামের আর-এক বড় শত্রু। তার শত্রুতা শুধু হযরতের ও তাঁর অনুচরদের উপর সীমাবদ্ধ ছিল না। হযরতের পর হযরতের প্রাণপ্রিয় কন্যা হযরত জয়নাব যখন মদিনা গমনের জন্যে উটের পিঠে রওনা হন, তখন এই হাব্বারই তাঁর গমনে বাধা দিতে অগ্রসর হয়। জয়নাব তখন গর্ভবতী ছিলেন।

BanglaBook.org

হাব্বার যখন কিছুতেই তাঁকে নিরস্ত করতে পারল না, দেখল তিনি মদিনার পথে যাত্রা করছেন—তখন এই নরাধম নিষ্ঠুরভাবে হাতের বর্শা দিয়ে তাঁর তলপেটে আঘাত করে; তার বর্শা হযরত জয়নাবের অঙ্গে বিদ্ধ হয়, ফলে তিনি মাটিতে পড়ে যান ও সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গর্ভপাত হয়ে যায়। জীবনসংশয় অবস্থায় তাঁকে মদিনায় আনা হয় বটে, কিন্তু এই আঘাতের ফলেই তিনি কিছুকাল পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

মক্কাবিজয়ের পর হাব্বার একদিন হযরতের মজলিশে উপস্থিত হয়ে বলল, "হে রসুলুল্লাহ্, আমি আত্মরক্ষার জন্য পারস্যে পালিয়ে যাওয়ার সংকল্প করেছিলাম। কিন্তু যখন দেখলাম, আপনি সকলকেই ক্ষমা করে সদয়ভাবে গ্রহণ করছেন, তখন সংকল্প ত্যাগ করে আপনার কাছে হাজির হয়েছি। আমি জানি, আমি বড় অপরাধী, আপনি আমার সম্বন্ধে যা শুনেছেন, সবই সত্য। আজ আমি আপনার কাছে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপস্থিত হয়েছি।"

হযরত ইচ্ছা করলে জয়নাবের হত্যা-অপরাধে হাব্বারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে-দুঃখের কথার পুনরুল্লেখ করলেন না, শুধু বললেন, "খোদা তোমায় ক্ষমা করুন।" [ক্ষমা]

৮

একদিন হযরতের দুয়ারে এক অতিথি এসে রাত্রের জন্য আশ্রয় ও খাদ্য চাইলেন। লোকটি তখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি। কিন্তু হযরত পরোপকার ও অতিথিসেবার সময় জাতি ধর্ম বিচার করতেন না। তিনি তাঁকে খাবার দিলেন। খাওয়ার পর হযরত তাকে শোয়ার জন্য খুব ভালো বিছানা করে দিলেন। সকালে ফজরের নামাজ শেষ করে হযরত অতিথির কুশল জিজ্ঞাসা করতে তার শয়নঘরে গেলেন। দেখেন, অতিথি নেই, বিছানা মলে পরিপূর্ণ। কিন্তু অতিথির মুল্যবান তরবারিখানা পড়ে রয়েছে। বুঝলেন সেখানা ভুলে ফেলে গিয়েছে। উপস্থিত সাহাবিগণ অতিথির দুর্ব্যবহার দেখে অত্যন্ত রাগান্বিত হলেন এবং তাকে ধরে শাস্তি বিধান করার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। হযরত বললেন, "তা হতে পারে না। অতিথির পেটের পীড়ার জন্য আমিই হয়তো দায়ী, কেননা, আমারই বাড়ির খাবার খেয়ে তার এরূপ অসুখ হয়েছিল। তা ছাড়া রাত্রে তার সুখ-সুবিধার প্রতি আমার দৃষ্টি রাখা উচিত ছিল।" এই বলে তিনি নিজহাতে মলমূত্র পরিষ্কার করে যখন বিছানা ধুচ্ছেন তখন দেখতে পেলেন রাত্রের অতিথি তার তরবারির জন্য ফিরে এসেছে। বেচারি ভয়ে হযরতের নিকট যেতে পারছিল না। কী জানি, রাত্রের অপকর্মের জন্য হযরত যদি শাস্তি বিধান করেন। হযরত দূর থেকে তার ভাব দেখেই তার মনের অবস্থা বুঝতে পারলেন। এবং নিজেই তার নিকট গিয়ে বললেন, "ভাই, আমার বড়ই অন্যায় হয়েছে, রাত্রে আমি তোমার তত্ত্ব নিতে পারিনি। তুমি অসুস্থ হয়ে বড়ই কষ্ট পেয়েছ, সেজন্য আমি মাফ চাচ্ছি, আমার অপরাধ মার্জনা করো।" অতিথি হযরতের কথা শুনে তো অবাক। কোথায় সে শাস্তির ভয়ে হযরতের নিকট আসতে ভয় পাচ্ছিল আর কোথায় হযরত নিজেই কিনা তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছেন। তার মন গলে গেল। তখনই ইসলাম কবুল করল। [অতিথি সৎকার]

BanglaBook.org

৯

একদিন কয়েকজন সাহাবা হযরতের বিবিগণের নিকট তাঁর এবাদতের অবস্থা জানার জন্য সমবেত হলেন। তাঁদের ধারণা ছিল যে, হযরত প্রতিদিন এবাদত ছাড়া আর কিছুই করেন না। কিন্তু হযরতের কথা শুনে সকলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। কেউ-কেউ বললেন হযরতের কথা আলাদা, খোদাতালা তাঁর পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। সুতরাং তাঁর ভয়ের কারণ নাই। একজন বললেন, "আমিও সারারাত ধরেই বন্দেগি করব।" আর-একজন বললেন, "আমি তো জীবনে কোনোদিন আর রোজা ছাড়ছি না।" তৃতীয় একজন বললেন, "আমি কখনও জীবনে বিয়ে করব না।" হযরত তাঁদের কথাবার্তা শুনলেন। তাঁদের অভিমত শুনে বললেন, "দ্যাখো, খোদার কসম, খোদাকে আমার চেয়ে তোমরা বেশি ভয় কর না। তবু আমি রোজাও করি আবার রোজা ভঙ্গও করি। এবাদতও করি আবার রাত্রে ঘুমাইও। তা ছাড়া বিবাহও করেছি। যে আমার আদর্শমতো না চলে সে আমার উম্মত থেকে বহিস্কৃত হবে।" [সন্ন্যাসে বিরক্তি]

১০

হযরত প্রায়ই দোয়া করতেন, "খোদা, গরিব অবস্থাতেই আমাকে জীবিত রাখো আর গরিবের সাথেই আমার হাশর করো।" হযরত আয়েশা একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "হযরত, এরূপ কথা কেন বলছেন?" হযরত বললেন, "এরা ধনীদের আগে বেহেশতে যাবে।"

১১

হযরত বলতেন, "কাঠ কুড়িয়ে বাজারে বিক্রি করে তা থেকে তোমার জীবিকা অর্জন করো; ভিক্ষা করে জীবিকা অর্জনের চেয়ে সে অনেক ভালো।"

১২

একদিন একজন লোক হযরতের কাছে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, "হযরত আমার কাছে যদি একটিমাত্র দিনার থাকে তা হলে আমি কী করব?" হযরত বললেন, "তোমার নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করো।" সে বলল, "যদি আরও একটি থাকে।" হযরত বললেন, "তোমার পুত্র-কন্যাদের জন্য ব্যয় করো।" সে বলল, "যদি আরও একটি থাকে?" হযরত বললেন, "তোমার স্ত্রীর জন্য ব্যয় করো।" সে বলল, "মনে করুন, আমার আরও একটি দিনার আছে; তা হলে কী করব?" হযরত বললেন, "সেটি তোমার খাদেমের জন্য ব্যয় করো।" সে বলল, "যদি আরও একটি বেশি থাকে?" হযরত বললেন, "এখন তুমি যা ইচ্ছে করতে পার।"
[পরিবারের প্রতি কর্তব্য]

১৩

হযরত বলতেন, যার হাত থেকে প্রতিবেশীরা নিস্তার পায় না তার ইমান নেই। সে কোনোদিন বেহেস্তে প্রবেশ করতে পারবে না।

BanglaBook.org

আমার জেলজীবনের কথা

হেমন্তের অপরাহ্ণ। নির্মেঘ আকাশে অপূর্ব প্রশান্তি। হলদে রোদে কী এক মিষ্টি আমেজ।

এমন অপরাহ্ণে গারদের মধ্যে মন হাঁপিয়ে ওঠে।

কেরোসিনের কাঠের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বারান্দায় বসলাম। শেফালিতলায় জমা ফুলগুলো শুকিয়ে গিয়েছে। মরশুমি ফুলের নূতন চারাগুলো মাটির সাথে মিশে রয়েছে। কতগুলো দাঁড়কাক ড্রেনে নেমে প্রচণ্ড সোরগোল বাধিয়ে তুলেছে।

আমাদের পশ্চিমদিকে হাজতের তিনতলা দালান। হঠাৎ সেদিক থেকে চিৎকার ভেসে আসে। চোখ ফিরিয়ে দেখি কতগুলো লোক কিসের উপর বেশ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। যারা দাঁড়িয়ে আছে ঊর্ধ্বলোকে ঘুসি ছুড়ছে। গেট-পাহারা ছুটে এল। সিপাহি ছুটে এল। ডানে বাঁয়ে বেদম প্রহার চলল।

এক নিমিষে সমস্ত চিৎকার থেমে গেল। হাজতিরা যে যার জায়গায় গিয়ে ভিজে বিড়ালের মতো বসে পড়ল। যে-লোকটাকে কেন্দ্র করে এত হট্টগোল অবশেষে তাকে টেনে তোলা হল। দেখলাম তার জামাকাপড় গিয়েছে ছিঁড়ে। মুখটা রক্তাক্ত। কোমরে দোয়াল-আঁটা মেট সেই অবস্থাতেই তার উপর আর-এক চোট হাতসুখ করে নিল। বেচারা হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে মেটের পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

কারাগারের সাধারণ কয়েদিদের জীবনের বর্ণনা এক কথায় দিতে গেলে বলতে হয়—'ডাইল আইল, ফাইল।' 'ডাইল' খায়। ডাইলের সাথে আইল খায়। আর 'আইলের সাথে প্রহারটা প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক। ফাইলটা খাদ্যবস্তু নয়। কিন্তু কয়েদিজীবনের দুর্বিষহ অভিশাপ।

এই ডাইল-ফাইলের পাল্লায় পড়েছিলাম একবারই। ১৯৪৮ সালের মে মাসে ময়মনসিংহ জেলে।

BanglaBook.org

সেই আমার প্রথম কারাপ্রবেশ। কায়দাকানুন কিছুই জানি না। এটুকু শুনে রেখেছিলাম যে, জায়গাটা তেমন ভয়ংকর কিছু না। তবে রাজনৈতিক কয়েদিদের মর্যাদাটা নিজেরই আদায় করে নিতে হয়।

প্রথমেই গিয়ে পড়লাম ফাইলের পাল্লায়। জোড়া জোড়া করে পায়ের গোড়ালির উপর বসে পড়তে হবে। তারপর জমাদার বা সিপাহি এক দুই করে গুনে যাবে। ছাত্রসম্মেলন করতে এসে আমরা ৭ জন ছাত্র ধরা পড়েছিলাম। আমরা বললাম—সে কী? গুনতেই যদি হবে তো ওরকম হাঁটু গেড়ে বসতে হবে কেন? দাঁড়িয়ে আছি, গোনা-গুনতি যা করার করে নাও। আমাদের চোখা-চোখা কথা শুনে অথবা নেহায়েত ভদ্র চেহারাগুলো দেখে জমাদার আর বিশেষ উচ্চবাচ্চ করল না। গেইটে গুনতির পালা শেষ করে জেলের ভিতরে এসে ডাইলের পাল্লায় পড়লাম।

সময়টা ছিল সন্ধ্যা। ঘরের ভিতর ঢুকতে ঢুকতে রাত হয়ে গিয়েছে। লোহার থালে করে আমাদের ভাত দেওয়া হল। ভাতের একপাশে একপ্রকার না-তরল না-শক্ত কালো রঙের পদার্থ। স্পর্শ করার প্রবৃত্তি হল না। তবু কৌতূহলবশত আঙুল ঠেকিয়ে বুঝলুম ওটা ডাল। লোহার থালাগুলো হঠাৎ কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বলে ভুল হয়। একে তো ঘরে ঢুকেই বমি আসার উপক্রম। পেচ্ছাব, পায়খানা, গায়ের ঘাম, ময়লা কম্বল আর অনেকগুলো মানুষের ঠাসাঠাসি ও তপ্ত নিশ্বাস মিলিয়ে ঘরের মধ্যে যে-বিশেষ দুর্গন্ধটি তার বিশেষ কোনো নামকরণ অথবা বিবরণ সম্ভব নয়।

ঐ গুমোট দুর্গন্ধে লোহার থালাভর্তি ঠাণ্ডা ভাতগুলো সামনে নিয়ে সেদিন চোখে পানি এসেছিল। আর তখুনি মনে পড়েছিল মায়ের কথা। দেশের বাড়ি সোজা ময়মনসিংহ এসেছিলাম। আসার দিন পুকুর থেকে একটা বড় রুইমাছ তোলা হয়েছিল। সেই মাছের আস্ত মাথাটি আমায় মা বসে বসে খাইয়েছিলেন আর নানা উপদেশ দিচ্ছিলেন, আমার যেন সুমতি হয়।

অনাহারেই প্রথম দিনের ডাইলের ফাইল শেষ হল।

ক্লান্ত ছিলাম। দুর্গন্ধটাও কিছুক্ষণ বাদে গা-সওয়া হয়ে এসেছিল। কিন্তু ঘুমুতে পারনি গুনতির ঠেলায়। ৭ বন্দিতে মিলে সারারাত বসে বসে গল্প করেই কাটিয়ে দিলাম। ভোররাত্রের দিকে একটু চোখ বন্ধ হয়ে এল। কিন্তু দুড়ুম দাড়ুম শব্দে তক্ষুনি জেগে উঠলাম।

অসময়ে ঘুম ভাঙানোর কৈফিয়ত চেয়ে যে জবাব পেলুম তার মর্মার্থ উপলব্ধি করে প্রমাদ গনলুম, অর্থাৎ আবার ফাইল করতে হবে, গনতি দিতে হবে।

বললুম—রাত শেষ হতে তো অনেক দেরি। এখুনি আবার গনতি কেন? ওয়ার্ড পাহারা অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বুঝল আমরা একেবারেই বালক। করুণার হাসি হেসে বলল—এটাই নিয়ম। দেখলুম—অন্যান্যরা ফাইলের ভঙ্গিতে গোড়ালির উপর ভর করে বসে গিয়েছে।

BanglaBook.org

কেউ-কেউ এরই ফাঁকে ফাঁকে হাঁটুর মাঝে মাথা গুঁজে নিদ্রার আরাম উপভোগ করার চেষ্টা করছে। বুঝলুম, অনেক দুর্ভোগ আছে কপালে। সাত বন্দিতে মিলে চট করে ঠিক করলুম দুর্ভোগ যখন রয়েছেই তখন আর ঘুমটা মাটি করে কী লাভ? বেশ, মোলায়েম করে বললুম—"পাহারা ভাই, ওসব ফাইল-টাইল বুঝি না। আমরা ঘুমুচ্ছি, গিনতি ফিনতি যা করতে হয় তুমিই করো।" বলেই আমরা চোখ বুজলাম।

ঘণ্টা দেড়েক পরে প্রবল হৈচৈ-এর মধ্যে আবার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ রগড়ে দেখলুম, ফাইল শেষ হয়েছে।

বেলা সাড়ে আটটার সময় জমাদার হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল—চলুন চলুন ফেইন টেব্‌ল। জিজ্ঞেস করলুম—ওটা আবার কী? জমাদার বুঝল—নূতন আমদানি। তাই একটু মুচকি হেসে বললে—চলুন না, গেলেই তো দেখবেন।

নূতন আবিষ্কারকের বিস্ময় কৌতূহল আর সাহস নিয়ে আমরা ফেইন টেবিলে এসে পড়লুম। গন্তব্যস্থানে এসে একটু হতাশ হলুম। ব্যাপারটা একেবারেই মামুলি মনে হল।

চাদরে ঢাকা টেবিলটা সামনে নিয়ে একটি 'গোরা' সাহেব বসে আছে চেয়ারে। বুঝলুম তিনিই কারাধিপতি। তাঁর ডানে বাঁয়ে পেছনে বেল্ট-আঁটা খাকি পোশাকধারী উপকর্তার দল অ্যাটেনশান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পোশাকের ইস্ত্রি আর মুখের হাবভাব দেখেই বুঝে নেওয়া যায় এই উপকর্তাদের মধ্যে কার স্থান কোথায়?

টেবিলটার সামনে হাঁটু গেড়ে ফাইল করে বসে রয়েছে কয়েদির দল। কারো কারা-আইন ভঙ্গের দায়ে বিচার হবে, কারো-বা খাটুনি পাস হবে।

সাহেব সুপারিন্টেন্ডেন্ট বাঁদরের মতো ক্ষুদ্র চোখে পিটপিট করে আমাদের একবার দেখে নিল। বড় জমাদার বললে—জুতি খুলকে ফাইল লাগাও। আমরা বললুম, ওটি হচ্ছে না। একজন সিপাহি এল আমাদের জোর করে বসাতে। লেগে গেল ধস্তাধস্তি। জুতো আমরা কিছুতেই খুলব না। হাঁটু গেড়ে কিছুতেই বসব না। অবস্থা বেগতিক দেখে সাহেবটি আমাদের নিয়ে যেতে হুকুম দিল। কিন্তু ঘা পড়েছে ভিমরুলের চাকে। ধস্তাধস্তিতে আমাদের সপ্ত বন্ধুর একজনের জামা গিয়েছিল ছিঁড়ে।

সে হঠাৎ সাহেবকে লক্ষ্য করে শুরু করলে বক্তৃতা। মগের মল্লুক পেয়েছ নাকি বাপু? কাল না খাইয়ে রেখেছ। সকালে নাস্তা-পানিটুকু মেলেনি, তার উপর মারধোর করছ। বলি স্বাধীন দেশে এসব চলবে না। ইত্যাদি ইত্যাদি।

বক্তৃতার বিশেষ কোনো 'আছর' হল না। সাহেবটি তেমনি পিটপিট করে চেয়ে রইল।

সেদিনও উপবাস গেল।

পরদিন ভোরে উঠেই আমরা হৈচৈ চ্যাঁচামেচি লাগিয়ে দিলুম। জেলার সাহেবের টনক নড়লো। তিনি পরামর্শ দিলেন ডিভিশনের জন্য দরখাস্ত করতে।

BanglaBook.org

ডিভিশন না পেলে তিনি কিছুই করতে পারবেন না, জানিয়ে দিলেন। আমরা বললুম—আমরা কি দরখাস্ত করে জেলে এসেছি যে ডিভিশনের জন্য দরখাস্ত করব!

ডিভিশনের ইতি ঘটল।

সেদিনটাও উপোস যেত। কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের দুরবস্থার খবরটা কোনোক্রমে বোধ হয় বাইরে চলে গিয়েছে। বিকেলবেলায় হঠাৎ ভাত মাছের ঝোল, ডিমভাজা তার সাথে অন্তত দুদিন চলতে পারে সেই পরিমাণ চিড়া-মুড়ি, গুড়, কলা, টিনের দুধ, চা, চিনি এসে গেল। ধড়ে আমাদের প্রাণ ফিরে এল। অচিরেই ভাত মাছ সাবাড় হয়ে গেল। তারপর চা করে ডবল কাপ চা খেলুম। সন্ধের সাথে সাথেই ছেঁড়া কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। ভোজনে এমন পরিতৃপ্তি আর কোনোদিন পেয়েছি বলে মনে হয় না।

জেলখানায় ফাইল-ডাইল-গাইলের নির্যাতন আজও শেষ হয়নি। রাজবন্দি বা রাজনৈতিক কয়েদিদের উপর কারাধিপতিদের ব্যবহারটা বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তা কখনও ভালো কখনও খারাপ। কিন্তু সাধারণ কয়েদিদের উপর রূঢ়তম নিষ্ঠুরতা অনুষ্ঠিত হয়। তার বিশেষ কোনো পরিবর্তন এখনও নজরে পড়ে না।

কোনো বিশেষ উদার অফিসার ব্যক্তিগত চেষ্টায় এই পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। যে-ব্যবস্থা 'সরকার সেলামের' যুগ থেকে গড়ে উঠেছে নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে সেই ব্যবস্থা আর সে-দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ছাড়া নূতন কোনো উন্নততর ব্যবস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব নয়। তাই, তাই কয়েদখানা এখনও পর্যন্ত শোধনাগার হয়ে ওঠেনি। এখনও পর্যন্ত এগুলো নিপীড়ন আর সন্ত্রাসের অন্ধকার গুহা।

২৫ অক্টোবর ১৯৫৯
ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার

BanglaBook.org

পরিশিষ্ট ২

জীবনপঞ্জি

শহীদুল্লা কায়সার

১৯২৭ ১৬ ফেব্রুয়ারি ফেনী জেলার মজুপুর গ্রামে জন্ম।
পিতা : মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লা। মাতা : সৈয়দা সুফিয়া খাতুন।

১৯৪২ ষোলো বৎসর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ।

১৯৪৬ অর্থনীতিতে বি.এ.পাশ এবং এম. এ. ডিগ্রিলাভের উদ্দেশ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি।

১৯৪৭ পিতার সঙ্গে ঢাকায় আগমন।

১৯৪৮ এম. এ. পরীক্ষার প্রস্তুতিগ্রহণ কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী হওয়ায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হলে আত্মগোপন। শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি।

১৯৫২ ৩ জুন প্রথম কারাবরণ। চট্টগ্রাম জেলে 'নাম নেই' নাটক রচনা।

১৯৫৪ চট্টগ্রাম জেলে 'যাদু-ই-হালুয়া' নাটক রচনা।

১৯৫৫ মাসখানেকের জন্য মুক্তিলাভ এবং পুনরায় গ্রেফতার।

১৯৫৬ ৮ সেপ্টেম্বর কারাগার থেকে মুক্তিলাভ এবং সাপ্তাহিক ইত্তেফাক পত্রিকায় যোগদান। সাহিত্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক পত্রিকা প্রবাহের সম্পাদনার সাথে যুক্ত।

১৯৫৮ সহকারী সম্পাদকরূপে দৈনিক সংবাদের সম্পাদকীয় বিভাগে যোগদান। আইয়ুব খান কর্তৃক সামরিক আইন জারি হওয়ায় ১৪ অক্টোবর পুনরায় কারাবরণ।

১৯৫৯ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে *কৃষ্ণচূড়া মেঘ* উপন্যাস লেখা সমাপ্ত।
১৫ আগস্ট *দিগন্তে ফুলের আগুন* সমাপ্ত। প্রথমা স্ত্রীর সাথে বিবাহ বিচ্ছেদ।

১৯৬২ প্রবল ছাত্র-আন্দোলনের ফলে মুক্তিলাভ এবং পুনরায় দৈনিক সংবাদে যোগদান। ২৬ জানুয়ারি *কুসুমের কান্না* উপন্যাসের রচনা শুরু এবং ১৪ জুলাই রচনা সমাপ্ত। ১৫ ডিসেম্বর *সারেং বৌ* উপন্যাসের প্রকাশ।

১৯৬৩ *সারেং বৌ* উপন্যাসের জন্য আদমজী পুরস্কার লাভ। *রাজবন্দীর রোজনামচা* প্রকাশ।

১৯৬৫ পিতা মাওলানা মোহাম্মদ হাবিবুল্লার পরলোকগমন। সেপ্টেম্বরে সংশপ্তক উপন্যাসে প্রকাশ।

১৯৬৬ ১০ জানুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে তাসখন্দ সম্মেলনে যোগদান। *পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ* গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত।

১৯৬৭ অক্টোবর বিপ্লবের ৫০ বছর পূর্তিতে ম্যাক্সিম গোর্কির মাদার উপন্যাসের নাট্যরূপ, তাঁর একক প্রচেষ্টায় অভিনীত।

১৯৬৮ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও দেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিতে করাচিতে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ও বিধিনিষেধ উপেক্ষা করে স্লোগানদান।

১৯৬৯ ১৭ ফেব্রুয়ারি পান্না চৌধুরীর সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ। উপন্যাসে অবদানের জন্য বাংলা একাডেমী পুরস্কারলাভ।

১৯৭০ ১৪ জানুয়ারি কন্যা শমী কায়সারের জন্ম।

১৯৭১ *কবে পোহাবে বিভাবরী* উপন্যাসের রচনা।

১০ অক্টোবর পুত্র অমিতাভ কায়সারের জন্ম।

১৪ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর দোসরদের দ্বারা ধৃত হন এবং পরে তাঁর আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

১৯৮১ *শহীদুল্লা কায়সার* রচনাবীল ১ম খণ্ড : ১ম পর্ব, প্রথম প্রকাশ।
প্রকাশক : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। সম্পাদক: গোলাম সাকলায়েন।

১৯৮৪ *শহীদুল্লা কায়সার* রচনাবলী ১ম খণ্ড ২য় পর্ব, প্রথম প্রকাশ।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।

১৯৮৭ *শহীদুল্লা কায়সার* রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।

১৯৮৮ *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী* ৩য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।

১৯৮৯ *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী* ৪র্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

গ্রন্থপঞ্জি

উপন্যাস

সারেং বৌ প্রকাশকাল : ১৫ ডিসেম্বর ১৯৬২। পৃষ্ঠা ৮ + ১৪৭।
প্রচ্ছদ : কামরুল হাসান, প্রকাশক পূর্ববাণী লিমিটেড, ঢাকা।
রচনাকাল : ১ অক্টোবর ১৯৬১, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপন্যাসটি লেখা শেষ হয়।

সংশপ্তক প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ১৯৬৫। পৃষ্ঠা : ৫ + ৫৫৪।
প্রচ্ছদ : হাশেম খান, প্রকাশক : পূর্ববাণী লিমিটেড, ঢাকা।
রচনাকাল : ১৯৫৯-১৯৬২, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপন্যাসটি লেখা শেষ হয়।

কৃষ্ণচূড়া মেঘ, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
রচনাকাল ১৯৫৯, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপন্যাসটি লেখা শেষ হয়। তবে ১৯৭৪ সালের ১৭ অক্টোবর থেকে দৈনিক *বাংলার বাণীতে* এর ১৯টি পরিচ্ছেদের মধ্যে ১৩টি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলীর* তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

দিগন্তে ফুলের আগুন, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
রচনাকাল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ১৫ আগস্ট ১৯৬১ সালে এটি লেখা শুরু করেন। প্রথমে নাম ছিল *অরণ্য সবুজে আকাশ নীলে*। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলীর* দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

কুসুমের কান্না গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
রচনাকাল ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে ২৬.১.১৯৬২ থেকে ১৪.৬.১৯৬২-র মধ্যে রচিত। প্রথমে নাম ছিল *সমুদ্র ও তৃষ্ণা*। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলীর* তৃতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

চন্দ্রভানের কন্যা, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। অসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণ রচনার কাল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায়নি। তবে এর খণ্ডাংশ দৈনিক সংবাদের সাময়িকীতে ১৯৬৬ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। পরে বন্ধ হয়ে যায়। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলীর* প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

কবে পোহাবে বিভাবরী, অসমাপ্ত বা অসম্পূর্ণ রচনা। ২.৪.১৯৭১ প্রথম খণ্ড এবং ২০.৭.১৯৭১ দ্বিতীয় খণ্ড রচনা শুরু করেন। পাণ্ডুলিপি কবে শেষ হয়েছে জানা যায়নি। লেখক চার খণ্ডে উপন্যাসটি সমাপ্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলীর* চতুর্থ খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

কবিতা

চারিদিকে ফুলের মেলা। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত। *শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*র প্রথম খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

ছোটগল্প

অনিরুদ্ধা গল্পসংকলন। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
চট্টগ্রাম ও ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ১৯৫৪ থেকে ১৯৬৯ সালে গল্পগুলো রচিত।

একই ছবির দুই পিঠ, গল্পসংকলন। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
*শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত। গল্পসংকলনটির নাম প্রথম গল্পের নামানুসারে, রচনাবলীর সম্পাদক গোলাম সাকলায়েন। গল্পগুলো ১৯৫২ থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে রচিত।

নাটক-নাটিকা

যাদু-ই-হালুয়া, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
রচনাকাল : চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ১৫.১০.১৯৫৪ তারিখে রচিত।
*শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

নাম নেই, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
রচনাকাল : চট্টগ্রাম কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় ২৭.১০.১৯৫২ তারিখে রচিত।
*শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

দিনলিপি

রাজবন্দির রোজনাচা। প্রকাশকাল : ১৯৬২। পৃষ্ঠা : ৮ + ১৪৮।
প্রকাশক : পূর্ববাণী লিমিটেড, ঢাকা।
রচনাকাল : ৩ জুন ১৯৫২ থেকে ১৯৫৬।

ভ্রমণকাহিনী

পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ।
প্রকাশকাল : ১৯৬৬। পৃষ্ঠা : ৮ + ৭৫
প্রকাশক : স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা।
রচনাকাল : ১৯৬৬।

সংবাদপত্রের কলাম

পরিক্রমা, প্রবন্ধাবলী। গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত।
রচনাকাল : ১৯৬২ সালের আগস্ট থেকে ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।
*শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী*র দ্বিতীয় খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত।

রচনাবলী

শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী ১ম খণ্ড : ১ম পর্ব। প্রথম প্রকাশ ১৯৮১।
প্রকাশক : আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।
পৃষ্ঠা ১০ + ৪১৪

রচনাসূচি
সম্পাদক-লিখিত শহীদুল্লা কায়সার জীবনকথা ও সাহিত্য প্রসঙ্গ।
কবিতা চারিদিকে ফুলের মেলা।
উপন্যাস : সারেং বৌ, চন্দ্রভানের কন্যা।
গল্প : আষাঢ়ে গল্প, অনমিতা।

শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী ১ম খণ্ড : ২য় পর্ব, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৪।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।
রচনাসূচি
গল্প ও কাহিনি অনিরুদ্ধা, বহুরূপী, মহম্মদ দীনের গল্প, জোবেদ আলীর গল্প, পরিতৃপ্ত, গেরাম আলীর কথা, পল্টু, আমার জেলজীবনের কথা।
দিনলিপি : রাজবন্দীর রোজনামচা
ভ্রমণকাহিনি : পেশোয়ার থেকে তাসখন্দ,
শহীদুল্লা কায়সারের সমগ্র রচনা-পরিচয় ও তথ্যপঞ্জি।

শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী ২য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৭।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।
পৃষ্ঠা ১৬ + ৫৬৩।
রচনাসূচি :
উপন্যাস : সংশপ্তক, দিগন্তে ফুলের আগুন।
গল্প ও কাহিনি একই ছবির দুই পিঠ, নেতা, অপমৃত্যু, যক্ষপুরী, রূপান্তর, মৃত্যু-এক, মৃত্যু-দুই, নিলুফার বেগম ও একটি চিঠি, মুন্না।
নাটক ও নাটিকা : যাদু-ই-হালুয়া, নাম নেই।
পত্রগুচ্ছ : শহীদুল্লা কায়সারের চিঠি জোহরা বেগমকে।
তথ্য ও গ্রন্থপঞ্জি।

শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী ৩য় খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৮।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।
পৃষ্ঠা : ৮ + ৬৩৬।
রচনাসূচি :
উপন্যাস : কৃষ্ণচূড়া মেঘ, কুসুমের কান্না।
গল্প : তিমির বলয়, হাদিসের গল্প, অনুগল্প।
প্রবন্ধ : ৬৬টি প্রবন্ধ।
পুস্তক সমালোচনা, পত্রগুচ্ছ, গ্রন্থপরিচয়।

শহীদুল্লা কায়সার রচনাবলী ৪র্থ খণ্ড, প্রথম প্রকাশ : ১৯৮৯।
প্রকাশক : বাংলা একাডেমী, ঢাকা। সম্পাদক : গোলাম সাকলায়েন।
পৃষ্ঠা ৮ + ৫২০।
রচনাসূচি : কবে পোহাবে বিভাররী
প্রবন্ধ রাজনৈতিক পরিক্রমা
ডায়েরী, তথ্যপঞ্জি ও গ্রন্থপরিচয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG